ভারত-সংস্কৃতি

মহেন্দ্র-জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ

সম্পাদক :

অধ্যাপক শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার, এম-এ

মহেন্দ্রজয়ন্তী সমিতির পক্ষে

শ্রীচাঁদমোহন চক্রবর্ত্তী, বি-এল্ কর্ত্তৃক

৬৭।এ প্রতাপাদিত্য রোড্

কলিকাতা—২৬ হইতে প্রকাশিত

মূল্য—৫৲ টাকা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার

এম-এ, পি-এচ্-ডি

মহোদয়ের করকমলে

নিবেদন

১৩৫৭ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দার্শনিক-প্রবর ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার মহোদয়ের পঞ্চষষ্টি-পূর্তি হইবে। তাঁহার পঞ্চষষ্টিতম জন্মদিবসের স্মারক হিসাবে মহেন্দ্র-জয়ন্তী সমিতির পক্ষ হইতে "ভারত-সংস্কৃতি" নামে একটি রচনা-সংকলন প্রকাশ করা হইল। মহেন্দ্রনাথ গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ নানাভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার বিভিন্ন দিক সমৃদ্ধ করিয়াছেন এবং এখনও দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রস্থানের অধ্যাপনা করিয়া ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজের জীবনের যোগসূত্রটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। ভারতীয় সাধকদের পুণ্য জীবন-কাহিনী ও তাঁহাদের চিন্তাধারার পরিচয় দিবার জন্য তিনি একাধিকবার বিদেশ হইতে আমন্ত্রণ পাইয়াছেন। মহেন্দ্রনাথের সকল ভাষণ ও লেখনের মধ্যেই ভারতীয় দর্শনের মৌলিক সত্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার রচিত "উপনিষদের আলো," "তন্ত্রের আলো," *System of Vedantic Thought and Culture* (Calcutta University 1925), *Comparative Studies in Vedanta* (Oxford University Press, 1927) *Mysticism in the Bhagavat Gita* (Longmans, Green, 1929), *Hindu Mysticism* (Kegan Paul, 1934), *Eastern Lights* (Calcutta, 1935) প্রভৃতি পুস্তক বিদ্বৎসমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার যথার্থ পরিচয় লাভের জন্য এই পুস্তকগুলির মূল্য অপরিসীম। সাম্প্রতিক ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে মহেন্দ্রনাথ অন্যতম স্রষ্টা এবং আমাদের চিন্তাজগৎ সংগঠনে তাঁহার দান অবিস্মরণীয়।

আমাদের সাম্প্রতিক দর্শনের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে ভারতীয় দর্শনের মহান্ ঐতিহ্যের সহিত ইহা অতি শিথিল যোগসূত্রে সংলগ্ন রহিয়াছে মাত্র, চিন্তাজগতে ইহা প্রকৃত মৌলিকতার স্বাক্ষর অর্পণ করিতে পারে নাই। এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির মধ্যে যেমন বেগ ও বিস্ময় আছে, দর্শনের ক্ষেত্রে তেমন চমকপ্রদ ঘটনাসংস্থান নাই। কারণ বিজ্ঞানের দৃষ্টি বাহিরের জগতে; দর্শনের দৃষ্টি আন্তরলোকে। বিজ্ঞানের সাফল্য নির্ভর করে বহুল পরিমাণে তথ্য সংগ্রহের উপর; দর্শনের লক্ষ্য হইল সত্যানুসন্ধান। ভারতীয় দার্শনিকদের জীবনে তথ্যসংগ্রহের প্রতি আগ্রহ অনেকক্ষেত্রেই গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছে; তাঁহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য আত্মপরিচয় লাভ করিবার জন্য শাশ্বত সত্যের অনুধ্যান ও সেই সত্যানুযায়ী জীবন-চর্য্যা। সুতরাং 'প্রগতি' বলিতে সাধারণভাবে যাহা বুঝি ভারতীয় দর্শনে তাহার অভাব সুস্পষ্ট; কারণ, ভারতীয় সাধনা হইতেছে অবেন্থ, শান্ত, নিরঞ্জন চৈতন্যস্বরূপ আত্মার সাধনা। তাই প্রাচীন ভারত প্রগতি বলিতে বুঝিয়াছে মানুষের অন্তর্লোকের ক্রমবর্দ্ধমান পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠন, ধ্যানের আলোকে চৈতন্যজগতের নব নব উদ্ভাসন। মহেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে এই আত্মানুভূতির আদর্শটিকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন এবং সাম্প্রতিক চিন্তার ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্বকীয়তার সূচনা ঘটাইয়াছেন।

মহেন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে "ভারত-সংস্কৃতি" গ্রন্থের জন্য বাংলার বিশিষ্ট লেখকদের নিকট প্রবন্ধ আহ্বান করা হয়। যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের প্রবন্ধ যথাসময়ে আমাদের

হাতে আসিয়া পৌঁছায় নাই। যে প্রবন্ধগুলি সময় মত পাওয়া গিয়াছে তাহাই এই গ্রন্থে সংকলিত হইল। এই প্রবন্ধ-লেখকদের প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই প্রসঙ্গে মহেন্দ্র-জয়ন্তী সমিতির উদ্বোধক ও অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ডক্টর মতিলাল দাশ এম. এ., বি. এল., পি. এইচ. ডি., মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহের ফলেই এই স্মারকগ্রন্থের প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথমার্দ্ধ তিনি নিজেই সংকলন ও সম্পাদন করিয়াছেন। কার্য্যোপলক্ষে তিনি অন্যত্র চলিয়া যাওয়াতে শেষার্দ্ধ প্রকাশনের ভার আমার উপর পড়িয়াছে। জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস এম-এ, মহাশয় ও 'প্রবর্ত্তক'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধারমণ চৌধুরী মহাশয়ের প্রতি আমাদের ঋণ অপরিসীম। স্বাধীন ভারতের সন্তানগণ যদি ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার প্রতি পুনরায় অনুরক্ত হইয়া জাতীয় ভাবধারা সংরক্ষণে সচেষ্ট হন তবেই আমাদের শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও যে ভুলভ্রান্তি রহিয়া গেল তাহা পাঠকবর্গ নিজগুণে ক্ষমা করিবেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ
কলিকাতা,
২৫শে বৈশাখ, ১৩৫৭

শ্রীঅমিয়কুমার মজুমদার

সূচী

ভারত-সংস্কৃতি

বেদের কাল

আমরা বলি বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য। ইহার দার্শনিক তথ্য এই প্রবন্ধে বিচার করিতেছি না। যদিও স্বীকার করা হয়, বেদ রচিত নয়, দৃষ্ট, তথাপি সে দর্শনের কাল থাকিবে। এই কালের পটভূমিতে যদি আমরা সভ্যতাকে না সাজাইতে পারি, তাহা হইলে ইতিবৃত্ত রচনা করা যায় না।

ঋগ্বেদের কাল-নির্ণয় তাই সভ্যতার পরিমাপে একান্ত প্রয়োজনীয়। এই বিষয়ে পণ্ডিতদের বিতর্ক অগাধ। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত মোক্ষমূলর 'প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে তিনি বেদের কাল নির্ণয়ে যত্নবান্ হন।

তিনি যাহা বলেন, তাহা সবই অনুমান মাত্র; অথচ তাহার ভিত্তিহীন অনুমানকে বহুজনেই বেদ-বাক্যের মত অভ্রান্ত মনে করেন, ইহা অতিশয় পরিতাপের বিষয়। তাহার বক্তব্য, সমস্ত বৈদিক সাহিত্য প্রাক্‌বুদ্ধ, অতএব তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত। বেদ-রচনায় চারিটি পর্য্যায় আছে—এক ছন্দঃ যুগ, যখন বিক্ষিপ্তভাবে মন্ত্র রচনা হইত; তার পর মন্ত্রযুগ, যখন বিক্ষিপ্ত কবিতাগুলি সংহিতায় পরিণত হয়; তারপর ব্রাহ্মণ, তারপর সূত্র। প্রত্যেক পর্য্যায়ে দুইশত বৎসর ধরিয়া তিনি বেদ-রচনার সময়কে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দী এবং খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে সিদ্ধান্ত করেন।

Winternitz এ সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা তুলিতেছি :—

Maxmüller's hypothetical and really purely arbitrary

determination of the Vedic epochs, received more and more the dignity and the character of a scientifically proved fact, without any new arguments or actual proofs having been added.

মোক্ষমূলরের সিদ্ধান্ত কাল্পনিক। কিন্তু তাঁহার মত পণ্ডিতের এই আন্দাজী কথাই পরবর্ত্তীদের মন অকারণে ভুলাইয়াছে।

বেদের কাল নির্ণয়ে আমাদের পৌরাণিক যে ইতিবৃত্ত আছে, তাহা পরে আলোচনা করিব। প্রথমে বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ Orion নামক গ্রন্থে নক্ষত্রের গতিবিধি আলোচনা করিয়া যে জ্যোতিষিক প্রমাণ দিয়াছেন, তাহাই আলোচনা করিব।

বৈদিক যাজ্ঞিকেরা বর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিতেন। এইজন্য তাহাদিগকে জ্যোতিষ জানিতে হইত। জ্যোতিষ বেদাঙ্গ। হোগ সাহেব বলিয়াছেন যে, বর্ষব্যাপী সত্র বর্ষেরই অনুকৃতি। ইহার দুই ভাগ ছিল—এবং দুই ভাগের মাঝে বিষুবন্ পড়িত। ঋতুকালে যজ্ঞ করেন বলিয়াই ঋত্বিক্।

সূর্য্যোদয় হইতে পরদিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাতেই সবন হইত বলিয়া ইহাকে সাবন দিন বলিত। ত্রিশ সাবন দিনে এক মাস এবং ৩৬০ দিনে বর্ষ হইত। এইরূপ পাঁচ বৎসরে এক লঘু লৌকিক যুগ হইত। বৈদিক যুগের পরে পঞ্চম বৎসরে একমাস বেশী যোগ করিয়া সাবন বৎসর এবং সৌর বৎসরের সামঞ্জস্য করা হইত।

কিন্তু চান্দ্র মাস ধরিয়া যে চান্দ্র বর্ষ, তাহার ৩৬০ তিথিতে ৩৫৪ দিন হইত। চান্দ্র বৎসর এবং সাবন বৎসরের সামঞ্জস্য করিবার জন্য বর্ষযাগের পূর্ব্বে দ্বাদশাহ পালন করিতে হইত।

বৈদিক ঋষিরা নক্ষত্র দেখিয়া সূর্য্যের গতি স্থির করিতেন। এইজন্য তাহাদের সৌর বর্ষ আসলে নাক্ষত্র বর্ষ হইত।

যজ্ঞই প্রজাপতি। প্রজাপতিই সংবৎসর। যজ্ঞারম্ভ দিনই বর্ষারম্ভ। নাক্ষত্রবর্ষ ও সৌরবর্ষের বিভিন্নতার জন্য দ্বিসহস্র বা উহার নিকটবর্ত্তী সময়ে বর্ষারম্ভের কাল বদলাইবার প্রয়োজন, তাহা না হইলে ঋতু ঠিক থাকে না। এবং এই পরিবর্ত্তন দুই তিন বার করা হইয়াছে।

বাল গঙ্গাধর তাঁহার গবেষণায় স্থির করিয়াছেন যে, ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন যুগকে তিনটি যুগে—(১) অদিতি যুগ (২) মৃগশিরা যুগ (৩) কৃত্তিকাযুগে—বিভক্ত করা যায়।

অদিতি যুগ ৬০০০ খৃষ্টপূর্ব্ব হইতে ৪০০০ খৃষ্টপূর্ব্ব পর্য্যন্ত। এই সময়ে সূক্ত রচিত হয় নাই। তখন অতি প্রাচীন বিবিদ মন্ত্রে উপাসনা চলিত।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে, যজ্ঞ অদিতি প্রায়ণ এবং অদিতি উদয়ন হইয়া আরম্ভ হইবে। পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অদিতি। অদিতি হইতে সূর্য্যের যাত্রা আরম্ভ, তাই সূর্য্য আদিত্য। শারদ বিষুবদ্দিনের নিকট কোনও উজ্জ্বল তারকা না থাকায় অভিজিৎ নক্ষত্রকে নক্ষত্রমণ্ডলী-মধ্যে গণনা করা হইত। ইহা শারদ বিষুবদ্দিনের আগমন সূচনা করিত এবং বিষুবনের চারি দিন পূর্ব্বের দিবসকে অভিজিৎ দিবস বলা হইত। অদিতি যুগে বাসন্ত বিষুব পুনর্ব্বসুতে সংক্রমিত হইত।

মৃগশিরা যুগই ভারতীয় সভ্যতার বিজয়-গৌরবের যুগ। খৃষ্টপূর্ব্ব ৪০০০ বৎসর হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই কাল। এই কাল নির্ণয়ের দত্তিগুলি সামান্তভাবে তিলক ও অন্যান্য সূত্র হইতে আলোচনা করিতেছি :—

কৃষ্ণ ও শুক্ল যজুর্ব্বেদ এবং তাহাদের ব্রাহ্মণে—তৈত্তিরীয় এবং শতপথ ব্রাহ্মণে—সেকালের ঋতু সম্বন্ধে এই বর্ণনা আছে।

বসন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিন ঋতু দেবযান। শরৎ, হেমন্ত ও শিশির এই তিন ঋতু পিতৃযান। যখন সূর্য্য উত্তর দিকে আবর্ত্তন করে, তখন দেবগণের নিকট অবস্থিতি করে; যখন দক্ষিণ দিকে আবর্ত্তন করে, তখন পিতৃগণের নিকট অবস্থিত হয়। উত্তর আবর্ত্তন দক্ষিণতম গতিপথ হইতে না বিষুব হইতে, তাহা লইয়া তর্ক হইতে পারে।

কিন্তু সত্রের মধ্য দিন বিষুবন্ অর্থাৎ সমান দিন এবং সমান রাত্রি হইত এবং তাহা বৎসরকে সমান দুই ভাগে ভাগ করিত। বসন্ত ঋতুর প্রথম ছিল। অগ্রায়ণেষ্টি যাহা অর্দ্ধবাৎসরিক, তাহা বসন্ত ও শারদ হইত। ইহা হইতে নিশ্চিত যে, সূর্য্যের বিষুব হইতে উত্তর আবর্ত্তনে যে ছয়মাস, তাহাই শুভ উত্তরায়ণ এবং বিষুব হইতে দক্ষিণ আবর্ত্তনের ছয়মাস অশুভ দক্ষিণায়ণ। উত্তরায়ণে সমস্ত দেবকার্য্য করিতে হইত এবং দক্ষিণায়ণে পিতৃকার্য্য করিতে হইত।

শতপথ ব্রাহ্মণের মূল এই :—(২।১।৩) বসন্তো গ্রীষ্মো বর্ষা। তে দেবা ঋতবঃ শারদ্বেমন্তঃ শিশিরস্তে পিতরো। য এবাপূর্যতেঽর্ধমাসঃ স দেব। যোঽপক্ষীয়তে স পিতরোঽহরেব দেবাঃ রাত্রিঃ পিতরঃ পুনরহ্নঃ পূর্ব্বাহ্নো দেবা অপরাহ্নঃ পিতরঃ। স যত্র উদগাবর্ত্তে, দেবেষু তর্হি ভবতিদেবাংস্তর্হ্যভিগোপায়ত্যথ যত্র দক্ষিণাবর্ত্ততে পিতৃষু তর্হিভবতি পিতৃংস্তর্হ্যভিগোপায়তি।

তিলকের কথা :—In the early Vedic days, the year began, when the sun was in the vernal equinox and as the sun then passed from south to the north of the equator, it was also the commencement of his northern passage. In other words, Uttarayana (if such a word was then used) Vasanta, the year and the satras all commenced

together at the vernal equinox. The autumnal, which came after the rains, was the central day of the year and the latter half of the year was named the Pitriyana or what we would now call the Dakshinayana. It is difficult to definitely ascertain the time when the commencement of the year was changed from the vernal equinox to the winter solstice. But the change must have been introduced long before the vernal equinox was in the Kritikas and when the change was made, Uttarayana must have gradually come to denote the first half of the new year i. e. the period from the winter to summer solstice, especially as the word was capable of being understood in the sense of "turning towards the north from the southernmost point".

প্রাচীন আর্য্যদিগের কাল-গণনা luni-solar ছিল, অর্থাৎ তাহা চান্দ্র ও সৌর বর্ষের মিলনে স্থাপিত ছিল। কিন্তু এই বর্ষ Tropical ছিল না, Sidereal ছিল। কালে যখন তাহারা বাসন্ত বিষুবদিনে বর্ষা আরম্ভ না করিয়া শীতায়নে বর্ষ আরম্ভ করিল, তখনও তাহারা প্রাচীন গণনা-পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিল না।

প্রাচীন কালে ঋষিরা সূর্য্য কোন্ পরিচিত নক্ষত্রের নিকট আছে তাহাই বর্ণনা করিতেন। তাঁহারা সূক্ষ্ম গণনায় সূর্য্য রাশিচক্রের কোন্ কলায় বা অংশে আছে তাহা বলিতেন না। ইহাতে কাল-গণনায় পাঁচ ডিগ্রির ভুল হইতে পারে—তাহাতে গণনার ভুল ৩৬০ বৎসর পর্য্যন্ত এদিক ওদিক হইতে পারে।

বরাহমিহিরের সময়ে রেবতী নক্ষত্রে বাসন্ত বিষুব হইত। বরাহমিহিরের সেই গণনা আজিও চলিতেছে। বরাহমিহিরের সময় হইতে অয়ন চলনে বিষুব এখন রেবতীর শেষে আর যায় না, কিন্তু আমরা আর পরিবর্ত্তন করি নাই। বরাহমিহির লিখিয়াছেন :—

আশ্লেষার্ধাদাসীত্তদা নিবৃত্তিঃ কিলোষ্ণকিরণস্য।
যুক্তময়নং তদাসীৎ সাম্প্রতময়নং পুনর্বসুতঃ॥

পূর্ব্বে অশ্লেষার মধ্য হইতে গ্রীষ্ম অয়ন আরম্ভ হইত, তাহা ঠিক ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে পুনর্ব্বসু হইতে অয়ন আরম্ভ হইতেছে। বরাহমিহির প্রত্যক্ষ পরীক্ষার উপর জোর দিয়াছেন।

বরাহমিহিরের পূর্ব্বে যে অন্যরূপ ছিল, তাহা গর্গ ও পরাশরের বচন বেদাঙ্গ জ্যোতিষ এবং মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বে ভীষ্মের স্বেচ্ছা-মৃত্যুর সময় মাঘ মাস, অমরকোষ এবং সুশ্রুত প্রভৃতি হইতে জানিতে পারি।

গর্গের বচন :—

যদা মাঘস্য শুক্লস্য প্রতিপদ্যুত্তরায়ণম্।
সহোদয়ং শ্রবিষ্টাভিঃ সোমার্কৌ প্রতিপদ্যতঃ॥

যখন মাঘের শুক্ল প্রতিপদ হইতে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত, তখন শ্রবিষ্টা নক্ষত্রে চন্দ্র ও সূর্য্য একত্র হইত।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষ শীতায়ন, গ্রীষ্মায়ন, বাসন্ত ও শারদ বিষুব সম্বন্ধে এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন :—

(ক) শীতায়ন শ্রবিষ্টার প্রথমাংশে হইত।

(খ) বাসন্ত বিষুব ভরণীর ১০ অংশে হইত।

(গ) গ্রীষ্মায়ন অশ্লেষার মধ্যে হইত।

(ঘ) শারদ বিষুব বিশাখার ৩°২০′ অংশে হইত।

ইহা হইতে বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কাল খৃষ্টপূর্ব একাদশ কিংবা দ্বাদশ শতাব্দীতে স্থির হয়।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।৫।২।৭) আছে :—

দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণি। কৃত্তিকা প্রথমং বিশাখে উত্তমং। তানি দেবনক্ষত্রাণি অনুরাধা প্রথমং অপভরণীরুত্তমং। তানি যমনক্ষত্রাণি। যানি দেবনক্ষত্রাণি তানি দক্ষিণেন পরিযন্তি। যানি যমনক্ষত্রানি তান্যুত্তরণে।

কৃত্তিকা নক্ষত্রের আদি। ইহা দেবনক্ষত্রের আদি—ইহা হইতে সিদ্ধান্ত যে কৃত্তিকায় বাসন্ত বিষুব হইত।

তৈত্তিরীয়ের এই কথা তৈত্তিরীয় সংহিতার নিম্ন বচন হইতে সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

সংবৎসরায় দীক্ষিষ্যমানাকাষ্টকায়ং দীক্ষেরন্নেষা বৈ সংবৎসরস্য পত্নী। যদেকাষ্টকৈতস্যাং বা এষ এতাং রাত্রিং বসতি সাক্ষাদেব সংবৎসরমারভ্য দীক্ষন্ত আর্ত্তং বা এতে সংবৎসরস্যাভি দীক্ষন্তে। য একাষ্টকায়াং দীক্ষন্তেঽন্তনামানাবৃতু ভবতো ব্যস্তং বা এতে সংবৎসরস্যাভি দীক্ষন্তে য একাষ্টকায়াং দীক্ষন্তেঽন্তনামানাবৃতু ভবতঃ ফল্গুনীপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্মুখং বা এতৎ সংবৎসরস্য, যৎফল্গুনীপূর্ণমাসো মুখত এব সংবৎসরমারভ্য দীক্ষন্তে তস্যৈকৈব নির্য্যা যৎসাম্মেঘ্যে বিষুবানৎ সম্পদ্যন্তে চিত্রাপূর্ণমাসে দীক্ষেরন্মুখং বা এতৎ সংবৎসরস্য যচ্চিত্রাপূর্ণমাসো মুখত এব সংবৎসরমারভ্য দীক্ষন্তে তস্য না কা চন নির্য্যা ভবতি চতুরহে পুরস্তাৎ পৌর্ণমাস্যৈ দীক্ষেরন্তেষামেকাষ্টকায়াং ক্রয়ঃ সম্পদ্যতে। তেনৈকাষ্টকাং ন ছম্বট্কুর্বন্তি তেষাম্ পূর্ব্বপক্ষে সুত্যা সম্পদ্যতে পূর্ব্বপক্ষং মাসা অভি সংপদ্যন্তে তে পূর্ব্বপক্ষ উত্তিষ্ঠন্তে তানুত্তিষ্টত ওষধয়ো বনস্পতয়োঽনূত্তিষ্ঠন্তি তান্ কল্যানী কীর্ত্তিরনূত্তিষ্টত্যরাৎসুরি মে যজমান ইতি তদনু সর্ব্বে রাধ্যাঃ।” ৭।৪।৮

সংবৎসর সত্রকাম যজমান্ মাঘের কৃষ্ণাষ্টমীতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে একাষ্টকা সংবৎসরের পত্নী। এবং এই রাত্রে সংবৎসর তাহার সহিত বাস করে। অতএব তাহারা একাষ্টকায় সংবৎসর আরম্ভ করিয়া যজ্ঞ করে।

যাহারা একাষ্টকায় যজ্ঞ করে, তাহারা সংবৎসরের আর্ত্ত ভাগকে অভিমুখ করিয়া দীক্ষা লয়। ইহা সেই ঋতু, যাহা সকলের শেষে যাহারা একাষ্টকায় যজ্ঞ করে, তাহারা সংবৎসরের বিপর্য্যাস অভিলক্ষ্য করিয়া দীক্ষা লয়, কারণ ইহা ঋতুর অন্ত।

অতএব ফাল্গুনী পূর্ণমাসে দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ফাল্গুনী পূর্ণমাস বৎসরের মুখ। ইহার একটি মাত্র দোষ যে, সংবৎসরের মধ্যবর্ত্তী প্রধান দিন বিষুব বর্ষাকালে পড়ে। অতএব তাহারা চিত্রা পূর্ণমাসে দীক্ষা লইবে। চিত্রা পূর্ণমাস বৎসরের মুখ। এই মুখ হইতে সংবৎসর আরম্ভ করিয়া তাহারা যাগ করে। ইহাতে কোনই দোষ হয় না। তাহারা পূর্ণিমার চারি দিন পূর্ব্বে দীক্ষিত হইবে। তাহাদের সোমক্রয় দিন একাষ্টকায় পড়ে। অতএব একাষ্টকা অনর্থক হয় না। তাহাদের সোমাভিষব স্থত্যা শুক্লপক্ষেই পড়ে। তাহাদের মাসিক ক্রিয়া মাসের পূর্ব্বভাগে পড়ে। তাহারা পূর্ব্ব পক্ষেই যজ্ঞ শেষ করে। তাহাদের সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-জাত ওষধি ও বনস্পতি জাত হয়। এবং তাহা হইতে কল্যাণী কীর্ত্তি উৎপাদিত হয়। এবং সকলের সৌভাগ্যোদয় হয়।

মাঘের কৃষ্ণাষ্টমী একাষ্টকা। ইহাতে দীক্ষাবিধান সম্বন্ধে তিনটি আপত্তি—এক ইহা আর্ত্তকাল অর্থাৎ শীত ঋতু, দ্বিতীয়তঃ ইহা ঋতুর শেষ, তৃতীয়তঃ ইহাতে শীতায়নের পরে বৎসরের বিপর্য্যয় হয়।

এইজন্য প্রথমে ফাল্গুনী পূর্ণমাসে যাগ বিধান করা হইল। ফাল্গুনী পূর্ণিমা বৎসরের মুখ, কিন্তু তাহাতে বিষুব দিন বর্ষাতে পড়ে।

অতএব চিত্রাপূর্ণিমায় যজ্ঞ আরম্ভ করিবে। ইহার চেয়ে ভাল হয়, যদি মাঘী পূর্ণিমার চারিদিন পূর্ব্বে যজ্ঞ আরম্ভ করা হয়।

মাঘী শুক্ল একাদশীই যজ্ঞ আরম্ভে প্রশস্ত, ইহাই মীমাংসা। সায়ন, শবরস্বামী, কুমারিল প্রভৃতি সমস্তই মীমাংসকই এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই বচন হইতে জানা যায় যে, তৈত্তিরীয় সংহিতার যুগে বাসন্ত বিষুব হইত। তাহার চারিটি কারণ তিলক বলেন :—

Firstly, the lists of the Nakshatras and their Presiding deities given in the Taittiriya Samhita and Brahmana are beginning with the Krittikas.

Secondly, an express statement in the Taittiriya Brahman that the Krittikas are the month of the Nakshatras ; thirdly, a statement that the Krittikas are the first of the Deva nakshatras, that is the Nakshatras in the northern hemisphere above the vernal equinox, and fourthly the passage which expessly states that the winter solstice fell in the month of Magha.

কিন্তু তৈত্তিরীয়ের এই শ্লোকে ফাল্গুন পূর্ণমাস এবং চিত্রা পূর্ণমাসকে সংবৎসরের মুখ বলা হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণ বলেন—এষা হ সংবৎসরস্য প্রথমারাত্রির্যৎ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী। ৬।২

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ বলেন—এষা বৈ প্রথমা রাত্রিঃ সংবৎসরস্য যদুত্তরে ফল্গুনী। মুখত এব সংবৎসরস্যাগ্নিমাধায় বলীয়ান্ ভবতি। ১।২।৮

শাংখ্যায়ন বলেন—মুখং বা এতৎ সংবৎসরস্য যৎ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী।

গোপথ ব্রাহ্মণ বলেন—মুখমুত্তরেফল্গুনৌ পুচ্ছং পূর্ব্বে। তত্তথা-প্রবৃত্তস্যান্তৌ সমেতৌ স্যাতাং। এবমেতৎসংবৎসরস্যান্তৌ সমেতৌ ভবতঃ। ১।১৯

এই সব উদাহরণ হইতে ইহা নিশ্চিত যে ফাল্গুনী পূর্ণিমা এবং চৈত্রী পূর্ণিমায় এক সময়ে বৎসর আরম্ভ ইতি।

তিলক নানা কারণ দেখাইয়া বলেন যে, ফাল্গুনী পূর্ণিমা এবং চৈত্র পূর্ণিমায় যখন বৎসর আরম্ভ হইত, তখন শীতকালীন অয়নও ঐ ঐ দিনে সংঘটিত হইত। শীতায়ন যদি ফাল্গুনী পূর্ণিমায় হয়, তবে বাসন্ত বিষুব মৃগশিরায় সংক্রমিত হইতে হইবে। মৃগশিরার প্রতিশব্দ অগ্রহায়ণী। অগ্রহায়ণী কথার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বৎসরের প্রথম। অতএব কৃত্তিকাকে যেমন নক্ষত্রের মুখ বলা হইয়াছে—এক সময়ে মৃগশিরা বা অগ্রহায়ণী নক্ষত্রের মুখ ছিল।

শীতায়নে ফাল্গুনী পূর্ণিমা দ্বারা এই গণনা হইলে, গ্রীষ্মায়ন উত্তর ভাদ্রপদের পূর্ণিমায় সংঘটিত হইবে। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষকে আজিও প্রেতপক্ষ বা পিতৃযান বলা হয়। ইহা হইতে পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়।

মৃগশিরা লইয়া গ্রীক, পার্সি এবং বৈদিক ঋষিদের মধ্যে যে সব কাহিনী রচিত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলেও মৃগশিরায় যে বাসন্ত বিষুব হইত, তাহা নির্দ্ধারিত হয়।

ঋগ্বেদের ১।১৬১।১৩ সূক্তে এই শ্লোক আছে :—

সুষুপ্বাংস ঋভবস্তদপৃচ্ছতা গোহ্য ক ইদং নো অবুবুধৎ।
শ্বানং বস্তো বোধয়িতারমব্রবীৎ সংবৎসর ইদমদ্যাব্যখ্যত ॥

ঋভু বা ঋতু দেবতাধিপতিরা আদিত্যকে প্রশ্ন করিলেন—আমরা ত ঘুমাইয়া আছি, কে আমাদিগকে জাগাইবে? আদিত্য উত্তর দিলেন—সংবৎসরের শেষে শ্বা নক্ষত্র তোমাদিগকে জাগাইবে।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে বৃষাকপি সূক্তে পাই :—

ধন্ব চ যৎ কৃন্তত্রং চ কতি স্বিত্তা বি যোজনা।

নেদীয়সো বৃষাকপেঽস্তমেহি গৃহাঁ উপবিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥১০।৮৬।২০

পুনরেহি বৃষাকপে সুবিতা কল্পয়াবহৈ।

য এষঃ স্বপ্ননংশনোঽস্তমেষি পথা পুর্ণাবিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥১০।৮৬।২১

যদুদঞ্চো বৃষাকপে গৃহমিন্দ্রাজগন্তন।

কস্ত পুল্বঘো মৃগঃ কমগঞ্জনয়োপনো বিশ্বস্মাদিন্দ্র উত্তরঃ ॥২২

এই তিনটি ঋকের অর্থ তিলকের মতে :—হে বৃষকপি! তুমি দক্ষিণে যাও—যেখানে ব্যোমের বিস্তার অজ্ঞাত—যাহা কতিপয় যোজনব্যাপী ; সেই দক্ষিণ গৃহ হইতে আমাদিগের গৃহে আসিও—উত্তরই ইন্দ্রের আলয়।

হে বৃষকপি, তুমি নিদ্রাহারী, তুমি পুনরায় আমাদের গৃহে আসিও। তুমি আসিলে আমরা কল্যাণকর যজ্ঞ করিব। ইন্দ্রের আবাস উত্তরে।

হে বৃষকপি, যখন তুমি উর্দ্ধে উত্থিত হইয়া আমাদের আলয়ে আসিবে তখন জনপ্রিয় মৃগ কোথায় থাকিবে।

অর্থাৎ সূর্য্য মৃগশিরায় সংক্রমিত হইলে তাহা অদৃশ্য হয়। সূর্য্যের এই সংক্রমণ নিরক্ষবৃত্তের উত্তরাংশ ইন্দ্রালয়ে গমন-সময়ে হয়।

এই সমস্ত হইতে ইহা ঠিক করা যায় যে, ঋগ্বেদের রচনা কালে বাসন্ত বিষুব মৃগশিরাপুঞ্জে সংক্রমিত ছিল।

তৃতীয় যুগ কৃত্তিকা যুগ—২৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪০০ খৃষ্টাব্দ প [illegible]।

চতুর্থ যুগ ভরণীযুগ—১৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে বরাহমিহিরের কাল পর্য্যন্ত। বরাহমিহিরের সময় অশ্বিনীতে বিষুব স্থির হয়, তাহার আর পরিবর্ত্তন হয় নাই।

তিলকের মতে ৬০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ হইতে ২৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত বেদ রচিত হইয়াছে।

এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ইহার নানা পর্য্যায়ের রচনা রচিত ও সংকলিত হইয়াছে।

পুরাণ-প্রবেশ একখানি চমৎকার গ্রন্থ। ইহাতে শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে আলোচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, পুরাণ গালগল্প নহে, ইহা ভারতের ইতিহাস।

বিষ্ণুপুরাণে পাই :—

সংবৎসরাদয়ঃ পঞ্চচর্তুমাস বিকল্পিতাঃ।
নিশ্চয় সর্ব্বকালস্য যুগমিত্যভিধীয়তে॥

শ্রীধর স্বামী ইহার ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন :—

দর্শাদর্শশ্চান্দ্রঃ ত্রিংশদ্দিবসস্তু সাবনো মাসঃ। সৌরোঽর্ক রাশিঃ নাক্ষত্রশ্চেন্দুমণ্ডলতঃ ইত্যেবং লক্ষণাশ্চান্দ্রসাবনসৌরনাক্ষত্রৈশ্চ চতুর্বিধৈর্মাসৈর্বিবিধতয়া কল্পিতাঃ পঞ্চসাবংসরাদয়ঃ একং যুগম্। সাবনঞ্চাপি সৌরঞ্চ চান্দ্রং নাক্ষত্রমেব চ। চত্বার্য্যেতানি নামানি বৈর্যুগং প্রবিভজ্যতে। ইতি বৃদ্ধগর্গোঽক্তঃ। সর্ব্বকালস্য মাসমাসাদের্নিশ্চয়ঃ নির্ণয়হেতুঃ। তথাহি যদা শুক্লে প্রতিপদে একস্মিন্ নক্ষত্রে চন্দ্রেন সহ স্থিতে সূর্য্য সংক্রান্তির্ভবতি তদা চতুর্বিধা মাসা যুগপৎ প্রবর্ত্তন্তে। তথাচ সৌরমাসে নববর্ষে ষট্ দিনানি বর্দ্ধন্তে, হ্রসন্তি চন্দ্রমাসেন ষট্ দিনানি, এবং চন্দ্রার্কয়ো ব্যবধানতারতম্যাৎ পঞ্চবর্ষাত্মকে যুগে সৌরাঃ ষষ্ঠির্মাসাঃ সাবনা একষষ্ঠিঃ চান্দ্রা দ্বিষষ্ঠিঃ নাক্ষত্রা সপ্তষষ্ঠিঃ। তন্মধ্যে চ মলমাসদ্বয়ং ভবতীত্যেবং সর্ব্বকালনিশ্চয়ো ভবতি। ততশ্চ ষষ্ঠে বর্ষে তথৈব চন্দ্রার্কয়োর্যোগাদ্ যুগমিত্যভিধায়ত ইত্যর্থঃ।

* মাস চারি প্রকার—সাবন, সৌর, চান্দ্র ও নাক্ষত্র। অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চান্দ্র মাস, ত্রিশ দিনকে সাবন মাস বলে—সূর্য্যের এক রাশি হইতে অন্য রাশি গমন কালকে সৌরমাস বলে, এবং চন্দ্রের

২৭ নক্ষত্র ভোগ-কালকে নাক্ষত্র মাস বলে। একদিনে শুক্ল প্রতিপদে চন্দ্র ও সূর্য্যের সমান নক্ষত্র ও সংক্রান্তি হইলে চারি মাসই যুগপৎ প্রবর্ত্তিত হয়। এক বৎসরে সৌর মাসের ছয় দিন বাড়ে, চান্দ্র মাসের ছয় দিন কমে—এই তারতম্য পাঁচবৎসর শেষে শেষ হইয়া পুনরায় চারি প্রকার মাস একসাথে আবর্ত্তিত হয়। এই cyclio পুনরাবৃত্তিকে যুগ বলে। এক যুগে ৬০ সৌর মাস, ৬১ সাবন মাস, চান্দ্র ৬২ মাস এবং নাক্ষত্র ৬৭ মাস পূর্ণ হয়। চান্দ্র দুই মাসকে মলমাস করিয়া সৌর ও চান্দ্র মাসের মিলন ঘটানো হয়।

ইহাই নৈসর্গিক লঘুযুগ এবং চারিপ্রকার মাস-মানে ইহার নির্ণয়। এইভাবে আরম্ভ হইলে চান্দ্র ও সৌরবৎসর ৩৫৫ বৎসরে পুনরায় এক হইবে—ইহাকেই যুগ হওয়া বলে। ৭১ যুগে এই কাল। ইহাকেই মনুকাল বলা হয়। সহস্র যুগকে পুরাণে এক কল্প বলা হইয়াছে এবং এক কল্পে চতুর্দ্দশ মনু। কল্পকাল কল্পিত যুগ—ইহার পরিমাণ ৫০০০ বৎসর। চতুর্দ্দশ মনুকালে ৪৯৭০ বৎসর হয়—বাকি ত্রিশ বৎসরের মিলের জন্য দুই দুই বৎসরের পনর সন্ধি কল্পনা করা হইয়াছে। সসন্ধি মনু গণনায় কল্পকাল ও মনুকালের সামঞ্জস্য হইল।

কল্পকালকে ৩০ ভাগ করিয়া এক পৈত্রযুগ পাওয়া যায়। মাস এই কালের একক—৬০০০০ মাসে কল্প—২০০০ মাসের ৩০ পৈত্রযুগে কল্প, আর ১২০০০ মাসের পাঁচ দৈবযুগে কল্প। ইহাও দিন, মাস ও বৎসরের অনুপাত লইয়া মানুষ-মান, পিতৃমান ও দৈবমানে নির্ণয় হইয়াছিল।

কল্পারম্ভের এক স্থির বিন্দু প্রয়োজন। স্বায়ম্ভুব মনু সেই স্থির বিন্দু। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে এই কাল গণনা করা হইয়াছে। পুরাণে ইক্ষ্বাকুবংশ বৈবস্বত মনু হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই বংশের বৃহদ্বল

ভারতযুদ্ধে কুরুক্ষেত্রে নিহত হন। স্বায়ম্ভুব মনু হইতে বৈবস্বতের কালান্তর ২১৪৪—৬ মনু ও ৭ সন্ধি—(৩৫৫×৬+৭×২)। বৈবস্বত হইতে বৃহদ্বল অধস্তন ৯৬ পুরুষ। গড়ে ২৫ বৎসর ধরিলে কল্পারম্ভ হইতে ভারতযুদ্ধ ৪৫৪৪ বৎসর হয়। ভারতযুদ্ধ হইতে নন্দাভিষেক কাল বিষ্ণুপুরাণের মতে ১০১৫ বৎসর। ইহাতে পাই ৫৫৫৯ বৎসর। নন্দাভিষেক ৪০১ খৃঃ পূঃ অব্দে হইয়াছিল, বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা ইহাই স্থির করিয়াছেন। ইহা হইতে স্বায়ম্ভুব মনুকাল ৫৯৬০ খৃষ্টপূর্ব্ব পাওয়া যায়। বসু মহাশয় এই মনুকালকে ৫৯৫৮ খৃঃ পূঃ স্থির করিয়াছেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রোহিতাশ্বের কথা আছে। এই আখ্যান নানা পুরাণে অনুসৃত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র ও রোহিত খৃষ্টপূর্ব্ব ৩১৬৯ কালের লোক।

বেদে সুদাস রাজার কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ইহা ছাড়া তুর্ব্বসু, ত্রসদস্যু, যদু, বৃহদ্রথ, পুরু, সুশ্রবা, তুর্য্যবান, কুৎস, আয়ু, নর্য্য প্রভৃতি নৃপতিগণের উল্লেখ আছে।

গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের সারণী ও নির্দ্দেশ অনুসারে আয়ু খৃঃ পূঃ ৩৭৫৮ কালের লোক, পুরু ৩৭০২ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দের। যযাতির অন্যান্য পুত্র তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু, অনু, যদু প্রভৃতিও এই অব্দের সমসাময়িক। পুরুকুৎস ও ত্রসদস্যু ইহাদের অধস্তন।

এই সব উল্লেখ হইতে ইহা স্থির যে, ঋগ্বেদের রচনাকাল ৪০০০ হইতে ৩৫০০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দ। এই প্রমাণের সঙ্গে Orion-এর জ্যোতিষিক প্রমাণ স্থূলভাবে মিলিতেছে।

বেদের কাল সম্বন্ধে Winternitz যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এখন তুলিতেছি :—

"Unfortunately, it is a fact which it is truly painful

to have to admit, that the opinions of the best scholars differ not to the extent of centuries, but to the extent of thousands of years, with regard to the age of the Rgveda. Some lay down the year 1000 B. C. as the earliest limit for the Rgvedic hymns, while others consider them to have originated between 3000 and 2500 B. C. In view of the very great divergence in the opinions of specialists, it is not enough even in a book intended for the general reader, merely to give some approximate date, for even the general reader must have an idea of the circumstances supporting the various opinions on the greater or lesser antiquity of the Veda.

This is the more necessary as the question of the period of the oldest Indian literature coincides with the question of the beginning of the Indo-Aryan civilization, a question which is of the utmost importance to every historian, archaeologist, and philologist. If, indeed, it is at all possible to determine the periods of the development of Indo-Aryan culture, and going still further back, those of Indo-European culture, it can only be done hand in hand with investigation as to the period of the earliest movements of Aryan culture in India.

On first becoming acquainted with Indian literature, people were inclined to ascribe tremendous antiquity to all Indian literary works. Did not Friedrich Schlegel expect from India nothing less than "enlightenment upon the history of the primitive work, so dark until now ?" As late as in 1852, A. Weber wrote in his "History of Indian Literature" : "The lite ture of India passes generally for the most ancient literature of which we

possess written records and justly so" and it was only in 1876 in his second edition, that he added : "In so far as this claim may not now be disputed by the Egyptian monumental records and papyrus rolls or even by the Assyrian literature which has but recently been brought to light". The reasons for which according to Weber, "we are fully justified in regarding the literature of India as the most ancient literature of which written records on an extensive scale have been handed down to us" are in part geographical, in part pertain to the history of religion. In the older parts of the Rgveda, the Indian Nation appear to us to be settled in the Punjab. The gradual spread eastwards across Hindustan towards the Ganges can be traced in the later portions of Vedic literature. The great Epics then further show us the spread of Brahmanism towards the south. Centuries must have elapsed before such an enormous stretch of land, inhabited by wild and vigorous tribes could become brahmanized. Many centuries too must have been required for the religious development from the simple nature worship of the Rgvedic hymns, up to the theosophical-philosophical speculations of the Upanishadas and again to such phases of mythology and cult as Megasthenes, about 300 B. C., found prevalent in India. Weber did not attempt a more exact determination of the Vedic period; in fact he expressly declars any such attempt to be entirely futile."

ইহার পর মোক্ষমূলর বেদের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এই বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

তাহার পর জেকবি নক্ষত্রের গতি গণনায় বেদের কাল নির্ণয়ে যত্নবান্ হন। পক্ষপাতসম্পন্ন য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা জেকবির এই

গণনা মোক্ষমূলরের অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া বিরোধিতা করিতে আরম্ভ করেন।

The idea of drawing conclusions on the chronology of the earliest Indian literature with the assistance of astronomical data is no new one.

A. Ludwig already undertook an attempt of this nature on the basis of the eclipses of the Sun. The priests of ancient India, who had to determine the times of sacrifice, were like the pontifices in ancient Rome, at the same time almanac makers. They had to observe the firmanent, in order to regulate and predetermine the times of sacrifice. Hence we find numerous astronomical and calendar date in the Brahmans and Sutras. In these, the so-called Naksatras or lunar mansions play a particularly prominent part. The ancient Indians had observed that the moon requires about 27 days and nights for its sidereal orbit and stays in a different constellation every night of the sidereal month. These stars or constellations which all lie not far distant from the ecliptic, were combined into a kind of zodiac, a succession of 27 Nakshatras embracing the sphere and this lunar zodiac was employed for the purpose of estimating the position of the moon at a particular time. Thus there are many passages in Vedic literature in which it is said that a sacrificial act is to take place under such and such a Naksatra i. e. when the moon stands in conjunction with this Naksatra. There are still more numerous passages in which the Naksatras are brought into definite relationship with the full and the new moon. And already in the earlier literature, there

often appear only twelve of the 27 Naksatras connected with the full moon, from which may be traced the names of the months derived from the twelve Naksatras. These month-names were originally used for lunar months, but were later extended also to the twelve divisions of the solar year. But, as already in Vedic times, attempts have been made to bring the solar and lunar year into accord by some means or another, the question arises whether, out of the combination of certain full-moon Naksatras with the seasons of the year and the commencement of the year, conclusion may not be drawn as to the period in which the respective calendar date originate. Such conclusions, which led to surprising results, were attempted in the year 1893, simultaneously and independently of each other, by H. Jacobi in Bonn and the Indian scholar, Bal Gangadhar Tilak in Bombay. Both scholars, by different ways, arrived at the opinion that at the period of the Brahmans, the Pleiades (Krittikas) which at the time formed the starting point of the Naksatra series coincided with the vernal equinox, but that in the Vedic texts there are also to be found traces of an older calendar, in which the vernal equinox fell in Orion (Mrigasiras). From the calculation of the volume of the precession, however, it appears that about 2500 B. C. the vernal equinox lay in the Pleiades and about 4500 B. C. in Orion. But while Tilak goes so far as 6000 B. C., Jacobi contents himself with placing the beginnings of the period of civilization, as the mature, perhaps even late production of which the songs of Rgveda have come down to us, at about 4500 B. C. This period of civilization

stretches according to him, roughly from 4500 B. C. to 2500 B. C. and he is inclined to ascribe the collection of hymns which has come down to us, to the second half of this period.

জেকবির এই জ্যোতিষিক সিদ্ধান্তের অন্য দক্তি ছিল। বিবাহকালে ঋগ্বেদী বর নব পরিণীতা বধূকে ধ্রুবনক্ষত্র দেখাইয়া নিম্ন মন্ত্র পড়েন, "ধ্রুবেত্যস্য প্রজাপতির্ঋষিঃ পূষা দেবতা অনুষ্টুপ্‌ছন্দো ধ্রুবদর্শনে বিনিয়োগঃ —ওঁ ধ্রুবা দ্যৌর্ধ্রুবা পৃথিবীঃ ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে। ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ ধ্রুবো রাজা বিশামযং। ওঁ ধ্রুবস্তে রাজা বরুণো ধ্রুবং দেবো বৃহস্পতিঃ। ধ্রুবন্ত ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রং ধারয়তাং ধ্রুবম্।" কিন্তু বস্তুতঃ ধ্রুবদর্শনে বিনিয়োগ মন্ত্রার্থ হইতে আসে না। ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী কালে ইহার আরম্ভ হয় এবং সেই প্রথানুসারে ঋগ্বেদীরা এই মন্ত্র উচ্চারণ করেন।

গৃহ্যসূত্রে ধ্রুবদর্শনের কথা আছে। জেকবি বলেন ২৭৮০ খ্রীষ্ট-পূর্ব্বাব্দে Alpha Draconis ধ্রুবতারা ছিল—অতএব ঋগ্বেদ খৃষ্টের তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে রচিত।

জেকবি ও তিলকের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিরুদ্ধে উইনটারনিট্জ বলেন যে, ভারতীয়েরা চন্দ্রের সহিত নক্ষত্রের গতিবিধি নির্ণয় করিতেন, তাহারা অয়নচলন জানিতেন না।

শতপথ ব্রাহ্মণে কৃত্তিকা সম্বন্ধে যে বচন আছে, তাহার অর্থ ঠিক পূর্ব্বদিকে কৃত্তিকা উদিত হইত তাহা নহে। ইহার অর্থ কৃত্তিকাকে প্রতিরাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্য পূর্ব্ব আকাশে দেখা যাইত—ইহা একাদশ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে হইত।

বৎসরের আরম্ভ সম্বন্ধে নানা কথা বলা হইয়াছে। কখনও তাহা গ্রীষ্মে, কখনও বর্ষায়, কখনও শীতে তাহার আরম্ভ। ঋতু কোথাও

পাঁচটি, কোথাও ছয়টি। ইহা হইতে কিছু সঠিক নির্দ্ধারণ করা যায় না।

অরুন্ধতী দর্শন লইয়াও মতবিরোধ হয়।

উইনটারনিট্জ জেকবি ও তিলকের মত গ্রহণ না করিয়া বলেন যে, মোক্ষমূলরের সিদ্ধান্ত বর্ত্তমান পর্য্যন্ত লব্ধ ঐতিহাসিক ঘটনার সহিত খাপ খায় না। তিনি বুলারের মত লইয়া বলেন যে—তাম্রশাসন ও শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে দাক্ষিণাত্যে আর্য্যসভ্যতা প্রবেশ করে। দাক্ষিণাত্যে বৌধায়ন ও আপস্তম্ব প্রভৃতি বৈদিক শাখার উৎপত্তি হইতে মনে হয়, আর্য্যেরা খুব সম্ভব সপ্তম কি অষ্টম খৃষ্টপূর্ব্ব শতকে দাক্ষিণাত্যে যান। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ প্রভৃতি রচনাতে বহুশত বৎসর লাগিয়াছিল—অতএব মোক্ষমূলরের সিদ্ধান্ত যে তাহারা খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চদশ শতকে লিখিত হইয়াছিল, তাহা টিকে না।

এশিয়া মাইনরের বোঘাজকোই সহরে যে মৃৎশাসন পাওয়া যায়, তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্দ্দশ শতকের। ইহাতে মিটানিদের দেবতার নামের মধ্যে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও নাসত্যের নাম পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, বৈদিক সভ্যতা অন্ততঃ খৃষ্টের দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বের।

কিন্তু স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই করা যায় না—তবে বেদসাহিত্য খৃষ্টের আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টের পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বের মধ্যে সঙ্কলিত, এই অনুমান অনেকটা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

উইনটারনিট্জ নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারেন নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ভারতীয় পৌরাণিক কালের ভিত্তিতে যে প্রমাণ, তাহা তিনি আলোচনা করেন নাই।

আমাদের পাণ্ডিত্য অধিক নহে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে এই গভীর বিতর্কমূলক সমস্যার সমাধানও সম্ভবপর নয়। তবে সাধারণভাবে বলিতে পারি যে, বেদের কাল নির্ণয়ে অধিকতর আলোচনা প্রয়োজন।

(বেদকে অতি পুরাতন করিবার ঝোঁকও যেমন ঠিক নয়, অতি আধুনিক করিবার আয়াসও তেমনই ঠিক নয়। বৌদ্ধ ও জৈনসাহিত্য ও বৈদিক সাহিত্যে একাধারে যাহার অসীম অধিকার আছে, এমন সব পণ্ডিতেরা যদি ভারতীয় পৌরাণিক নৃপতি-মণ্ডলীর বংশাবলীর সঙ্গে তুলনা করিয়া বৈদিক কাল নির্ণয়ে যত্নবান হন, তাহা হইলে হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আমরা নিশ্চিততর কিছু জানিতে পারিব।)

বৈদিক সাহিত্য প্রাক্-বুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্তন। কুরুক্ষেত্রের কাল সম্বন্ধে নানা মতান্তর আছে। মহাভারতের নানা নির্দ্দেশ হইতে মহাভারতের কাল যদি নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে আমরা বৈদিক সাহিত্যের কাল অনেকটা ঠিকভাবে ধরিতে পারিব। এ বিষয়ে পশ্চিমের পণ্ডিতেরা অনেক গবেষণা করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের দেশে সমগ্রভাবে সেরূপ গবেষণা হয় নাই।

ভারতীয় নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব পঠিতব্য বিষয় হইয়াছে। এইসব বিভাগের ছাত্র ও অধ্যাপকগণ যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ-ভাবে এবং সমবেত চেষ্টায় ভারতের 'পুরাণী প্রজ্ঞার' কালানুসন্ধানে রত হন, তাহা হইলে দেশের গভীর উপকার করিবেন।

আমরা ব্যক্তিগতভাবে তিলক ও পৌরাণিক আলোচনার ফল মানিয়া মনে করি, ঋগ্বেদের রচনাকাল অন্ততঃ খৃষ্টের ৪০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের।

অবশ্য যে সুসংবদ্ধ সংহিতা আমরা পাইতেছি—তাহা চারি হাজার বৎসরের নয়। তাহা দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের সঙ্কলন এবং খুব সম্ভব দুই হাজার বৎসরের পুরাতন।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কাল ভাবনা করিতেন—সে কাল-ভাবনা আমরা হারাইয়াছি। কালের ও ইতিহাসের সুগভীর পরিবর্ত্তনের মধ্যেও যে পুরাতন সাহিত্যের এতখানি বাঁচিয়া আছে, তাহার জন্য আমরা তপস্বী ও পুরাতন সংস্কৃতিভক্ত ব্রাহ্মণ ও শাস্ত্রাধ্যাপকগণের নিকট ঋণী।

বেদমাতা সরস্বতী আবার তাহার দীপ্তোজ্জ্বল প্রভায় উদ্ভাসিত হউন। প্রাচীনের সহিত আমাদের সংযোগ দৃঢ় হউক। আমরা অতীতের কল্যাণময়ী বাণীর সহায়তায় নবতর পথে যেন যাত্রা করিতে সক্ষম হই।

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ।
শ্রদ্ধাং ভগস্য মূর্ধনি বচসা বেদয়ামসি॥
প্রিয়ং শ্রদ্ধে দদতঃ প্রিয়ং শ্রদ্ধে দিদাসতঃ।
প্রিয়ং ভোজেষু যজ্বস্বিদং ম উদিতং কৃধি॥
যথা দেবা অসুরেষু শ্রদ্ধামুগ্রেষু চক্রিরে।
এবং ভোজেষু যজ্বস্বস্মাকমুদিতং কৃধি॥

শ্রদ্ধাতেই অগ্নি জ্বলে। শ্রদ্ধাতেই হবি দান করা হয়। আমরা স্তোত্রে শ্রদ্ধারই কীর্ত্তন করি—শ্রদ্ধা সৌভাগ্যের শীর্ষদেশে রহে। হে শ্রদ্ধা, যে দান করে তাহাকে তুমি প্রিয় দাও, যে দিতে চাহে তাহাকে প্রিয় কর। হব্যদাতা যজমানের প্রিয় বিধান কর—আমাদের বাক্যকে সমৃদ্ধ কর। দেবতারা অসুরগণের মধ্যেও শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছিলেন—আমাদের এই মন্ত্রবাণী তেমনই দানশীল যজমানের কল্যাণে উজ্জীবিত কর।

এই শ্রদ্ধা আমাদের মধ্যে ফিরুক। আমরা শ্রদ্ধায় ঋষিগণের নিকট প্রার্থনা করি—হে মহাভাগ—'তুমি সত্য প্রকাশ কর'।

বেদের কথা

বেদকে শ্রুতি বলে। ইহা মানুষী রচনা নহে—ইহা অপৌরুষেয়। বেদের রচয়িতা ঋষি আছেন অথচ বেদকে অপৌরুষেয় বলি কেন? তাহার অর্থ বেদ সাধারণ জ্ঞানে লভ্য নয়; এই আত্মবিদ্যা, এই জ্ঞান, বোধির দ্বারা প্রাপ্য—সত্যদ্রষ্টা যারা, তাহারাই ইহা জানিতে পারেন, তাহারাই ইহা শুনিতে পারেন। নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার অধিকারী ঋষিদের জ্ঞানদীপ্ত চিত্তে বেদ প্রতিভাসিত হইয়াছিল, তাই বেদ শ্রুতি।

আমাদের ধর্ম্ম বেদমূলক। তাই বেদ না জানিলে আমাদের ধর্ম্ম জানা যায় না। প্রত্যেক হিন্দুর তাই বেদ অধ্যয়ন একান্ত প্রয়োজন। বেদবাহ্য স্মৃতি গ্রাহ্য নয়, বেদবাহ্য আচার পালনীয় নয়। স্বাধীনতার অরুণোদয়ের সাথে আমাদের জ্ঞানোদয় হোক, আমরা যেন আমাদের পিতৃধন বেদ-বিদ্যার অনুসরণ করি।

বেদ চারিখানি—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ব্ববেদ। যজুর্ব্বেদ আবার দুইখানি—শুক্ল এবং কৃষ্ণ। এই পাঁচখানি পুস্তকে আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির রত্নভাণ্ডার লুক্কায়িত আছে। উৎসুক ও কৌতূহলী প্রত্যেকেরই তাই ইহাদিগকে জানার চেষ্টা করা উচিত।

স্বাধীন ভারতবর্ষে আজ পুণ্যভূমি ভারতজননীর বন্দনা করি। অথর্ব্ব-বেদে মাতৃভূমির স্তুতি আছে। ঋষি বলিতেছেন :—

বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা
হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।

বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নি
মিন্দ্র ঋষভা দ্রবিনে নো দধাতু॥

ঋষিরা এই সুন্দরী পৃথিবীতে মরিতে চাহেন নাই। তাহারা মানুষের মাঝে মানুষের মত বাঁচিতে চাহিয়াছেন। বশিষ্ঠ এই জননী বসুন্ধরার ধনসম্পদকে সহস্র-ধারায় দোহন করিতে চাহিয়াছেন। ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—কৌশল শিখিবার জন্য, যে কৌশলে এই পৃথিবীরূপা গাভীকে দোহন করা যায়। ঋষিরা আনন্দস্বরূপ ভগবানকে জানিয়া নির্ভয় হইতে চাহিয়াছিলেন। তাহারা বরাভয়ের জন্য আরাধনা করিয়াছিলেন—চারিদিকে মধুধারার বর্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন।

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ন সন্ত্বোষধীঃ॥
মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা॥
মধুমান্নো বনস্পতি র্মধুমাঁ অস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

বাতাসে জাগে মধুধারা, নদীস্রোতে বহে মধুধারা। ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যে ওষধী-নিচয়, তাহা মধুময় হউক।

মধুময়ী হউক রাত্রি, মধুভরা হউক উষসী। পৃথিবীর প্রতি ধূলিকণা মধুময় হউক। আমাদের প্রতিপালক দ্যুলোক প্রতিনিয়ত পুষ্টির জন্য মধুবর্ষণ করুক। রসময় হউক বনভবনের বনস্পতি—আকাশের সবিতৃ-দেব মধুর কিরণ ঢালুন। চারিদিক আমাদের জন্য মধুতে ভরিয়া উঠুক।

বেদের সর্ব্বত্র এই প্রাণের আবেগ। আমাদের পিতৃপিতামহ একশত শরৎ বাঁচিবার মত বাঁচিতে চাহিয়াছিলেন—চোখ কান খুলিয়া, পৃথিবীর যেখানে যাহা কিছু আছে, তাহা সম্ভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন।

এই ত্যাগময় সম্ভোগের বাণী ভারতবর্ষের সাধনার কথা। পলায়ন নহে, পরাজয় নহে, ক্লৈব্য নহে, অবসাদ নহে—তাহারা চাহিয়াছিলেন রসপূর্ণ, আনন্দভাস্বর, সত্যসুন্দর অমৃতময় জীবন। তাহাদের কামনা ছিল স্বস্তির, শান্তির ও অভয়ের।

অভয়ং ন করত্যন্তরিক্ষমভয়ং দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তাদুত্তরাদধরাদভয়ং নো অস্তু॥

অথর্ব্ব ১৯।১৫।৫

অন্তরীক্ষ দিক অভয়, দ্যৌ পৃথিবী উভয়েই দান করুন ভয়হীন শান্তি। আমরা যেন সম্মুখে পিছনে, উপরে নীচে, সব দিকেই বরাভয় লাভ করি।

অভয়ং মিত্রাদভয়মমিত্রাদভয়ং জ্ঞাতাদভয়ং পুরো যঃ।
অভয়ং নক্তমভয়ং দিবা নঃ সর্ব্বা আশা মম মিত্রং ভবন্তু॥

অথর্ব্ব ১৯।১৭।৬

মিত্র হইতে আসুক অভয়, আসুক অমিত্র হইতে। জ্ঞাত যাহা তাহারা যেন ভয় না দেয়, সম্মুখে যাহারা পড়ে, তাহারাও যেন ভয় না দেয়। দিবা ও রাত্রি অভয় দান করুক। দশ দিক্ মিত্র হইয়া অভয় বিতরণ করুক।

কিন্তু এই অভয় কর্ম্মহীন উদাসীনতায় গ্রহণ করিবার বস্তু নয়। যে কর্ম্ম মানুষকে পৃথিবীর নানা কর্ম্মক্ষেত্রে নানা পরিবেশে পাঠায়, সে সকল দুঃখ-দুর্গম কষ্টকঠোর যাত্রাপথেই মানুষ কর্ম্মের মাঝেই প্রতিষ্ঠা, শান্তি ও শ্রী লাভ করিবে। যে পথে চলে, সেই পায় কল্যাণ, যে শ্রমে শ্রান্ত, তারই গলায় বিজয়মাল্য দেয় শ্রী। বিভূতি তাহারই, যে বীর, যে যুদ্ধ করে।

আমাদের ধর্ম্ম মানুষকে নির্ব্বীর্য্য অলস করে নাই। মানুষ হইবে শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা, জগতের শক্তিরহস্য জানিয়া তাহাকে কাজে

খাটাইয়া মানুষ পুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিবে ; তাহারা মঙ্গল ভাবিবে, মঙ্গল চাহিবে এবং মঙ্গলের অনুষ্ঠান করিবে। তাহারা কল্যাণমার্গে চলিবে—যোগ্যতা দ্বারা জ্যোতি লাভ করিবে, সত্যবেত্তা হইয়া সত্যপথে চলিবে। কল্যাণময় যে ঋত জগৎ-সংসার বিধৃত করিয়া রহিয়াছেন, তাহারা সেই ঋতের পালক হইবে। ঋতবর্দ্ধন তাহারা সুপথে বিচরণ করিয়া, তপস্যার জ্যোতিতে জীবনকে জ্যোতির্ম্ময় করিবে। মাতৃভূমি আমাদের বিশ্বম্ভরা, সর্ব্বরত্নের খনি, সকল সত্যের, জ্ঞানের, কর্ম্মের প্রতিষ্ঠান, জগৎ-প্রাণীর বাসভূমি। এই মাতৃভূমি পরমাত্মার আশীর্ব্বাদ-পূতা, বৈশ্বানর এখানে বিশ্বনরের কল্যাণে চিরপ্রদীপ্ত। এই পুণ্যা জননী আমাদিগকে কল্যাণে, ধনে ও সমৃদ্ধিতে উন্নত করুন।

আমাদের এই পুণ্যদেশে আমাদের জীবন স্বার্থের কলুষে কলুষিত হবে না, আমরা সকলেই ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিব। সকলের জন্য উৎসৃজিত যে কর্ম্মময় জীবন, তাহাই প্রশংসনীয়, তাহাই কাম্য। আসুন সেই যজ্ঞ-জীবনের জন্য প্রার্থনা করি। পৃথিবীতে আজ এত হাহাকার, এত ব্যথা, এত দুঃখ তাহার কারণ মানুষ আজ যজ্ঞ করে না, যজ্ঞাশিষ্ট যে অমৃত, তাহা ভোজন করে না। তাহারা কেবল চায়—ভিক্ষুকের মত চির অতৃপ্ত বাসনা নিয়া কেবল চায়। চাইলেই পাওয়া যায় না, দিলেই পাওয়া যায়। সেই দেওয়া ও নেওয়ার রহস্যদ্বার যজ্ঞ।

ঋষির কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া আমরা গাহিব :—

আয়ুর্যজ্ঞেন কল্পতাং
প্রাণো যজ্ঞেন কল্পতাং
চক্ষুর্যজ্ঞেন কল্পতাম্।
শ্রোত্রং যজ্ঞেন কল্পতাং
পৃষ্ঠং যজ্ঞেন কল্পতাম্।

যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাং
প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম
স্বর্দেব অগন্মামৃতা অভূম ॥

আমাদের জীবন যজ্ঞের জন্য নিবেদিত হউক। প্রাণ যজ্ঞের জন্য উৎসৃজিত হউক, আমাদের চোখ, কাণ, পিঠ যজ্ঞের জন্য সামর্থ্যলাভ করুক। জীবন এক বৃহৎ যজ্ঞ। সেই যজ্ঞের প্রতিষ্ঠা হউক। আমরা হব পরমাত্মার পরমপ্রিয় সন্তান। হে দেবগণ, স্বর্গলোক হইতে তোমরা এস—আমরা অমৃতত্ব লাভ করিব।

এই দৃপ্ত ত্যাগের বাণী হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা। গীতাতে পার্থসারথি এই বেদ-সার ত্যাগমন্ত্রের প্রচার করিয়াছেন।

তিনি তারস্বরে মানুষকে কর্ম্মময় ত্যাগময় নিষ্কাম জীবন যাপন করিতে বলিয়াছেন। অনেকে ভুল করেন যে, নিষ্কাম যাহারা, তাহারা জীবনে বড় কিছু করিতে পারে না। ইহা একান্ত ভ্রান্ত ধারণা। যে নির্ব্বাসনা লাভ করিয়াছে, তাহার কর্ম্ম বিচিত্র-গতি এবং নির্ব্বাধ। তাহার সমস্ত কর্ম্মই ভাগবত কর্ম্ম। তাই সে সকলের চেয়ে অধিক কর্ম্ম করে।

স্বাধীন ভারতে আজ নব নব পরিকল্পনা চাই। মানুষের এই ধরণীর জীবনকে এমন ভাবে পূর্ণ করিতে হইবে, যাহাতে সে চারিদিকে সুন্দরকে দেখিতে পায়, যেন সে সর্ব্বত্র আনন্দকে অনুভব করিতে পারে। শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদকে ভুল বুঝিয়া আমরা দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছি। দিনগত পাপ ক্ষয় করিয়া কোনও প্রকারে জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিলেই আমরা বাঁচি, কিন্তু এই পরাজয়ের মতবাদ আমাদের ধর্ম্ম নহে।

বেদ-ধর্ম্ম বীর্য্যের ধর্ম্ম, পৌরুষের মন্ত্র, শক্তির আরাধনা, সত্যের তপস্যা, এবং অমৃতের উপাসনা। কবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন :—

বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়,
অসংখ্যবন্ধন মাঝে, মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার,
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানা বর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্ত্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে॥
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার
যে কিছু আনন্দ আছে, দৃশ্যে, গন্ধে, গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া,
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।

কবি যে জীবনবাদ প্রচার করিয়াছেন, তাহাকে আধুনিক মনে হয়। কিন্তু একান্ত বিস্ময়ের কথা এই যে, আমাদের প্রাচীনা বিদ্যা, আমাদের পুরাণী প্রজ্ঞা এই আনন্দমুখর জীবনবৃত্তের জয়গান করিয়াছেন। বেদের যত্র তত্র, এই উজ্জ্বল, এই কর্ম্মমুখর জীবনের জয়গান দেখা যায়। গোতম রাহুগণ গাহিতেছেন :—

ভদ্রং কর্ণেভি শৃণুয়াম দেবা
ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভি র্যজত্রাঃ।

স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভি
র্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ ॥

হে দেবগণ ! আমরা কর্ণে শুনিব কল্যাণময়ী বাণী, হে যজনীয়গণ আমরা চক্ষু দিয়া দেখিব সুভদ্র কল্যাণময় দৃশ্য। অচঞ্চল দৃঢ় বলিষ্ঠ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়া আমরা পরমাত্মার পূজা করিব—আমরা জগদ্ধিতের জন্যই জীবন যাপন করিব।

তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্য্যমসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি।
বলমসি বলং ময়ি ধেহি।
ওজোঽস্যোজোময়ি ধেহি।
মন্যুরসি মন্যুং ময়ি ধেহি।
সহোসি সহো ময়ি ধেহি।

হে পরাৎপর পরমাত্মা ! তুমি তেজস্বী, তোমার সেই অপরিমেয় তেজ আমাদের দাও, তুমি বীর্য্যবান্, তোমার সেই বীর্য্য আমাদের ভিতর স্থাপন কর, তুমি বলবান, আমাদিগকে বলী কর। তুমি ওজস্বী, তোমার ওজস্বিতায় আমাদিগকে প্রবুদ্ধ কর, তুমি অধর্ম্মের দণ্ডদাতা, অন্যায়-কারীর শাস্তা, তোমার সেই অপরাজেয় দণ্ডশক্তি আমাদের মাঝে স্থাপন কর। তুমি চিরসহিষ্ণু—তোমার সেই ধৃত-বীর্য্য সহিষ্ণুতা আমাদিগের অন্তরে উদ্দীপ্ত কর।

বেদ সকলের ও সর্ব্বমানুষের ধন। যাহারা সেই বেদবিদ্যাকে গোপন করিয়াছিলেন, তাহারা মানুষের সমূহ ক্ষতি করিয়াছেন। আজ জগৎ-সভায় আমরা আমাদের এই ঐশ্বর্য্যময় ভাণ্ডার নিয়া অতৃপ্ত জগৎ-বাসীকে অমৃত বিলাইব। সকলকে ডাকিয়া বলিব—এক হও, এক হও।

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবাভাগং যথাপূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী
সমানং মনঃ সহচিত্তমেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ
সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥
সমানী ব আকূতি সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি॥

বৈশ্বানর উপাসক হে বিশ্ববাসী মনুষ্যগণ, তোমরা একসাথে চল, একসাথে কথা বল, তোমাদের মন এক হউক।

দেবতারা যেমন পূর্ব্বে একত্র হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তোমরাও তেমনই ঐক্যমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্ম কর।

তোমাদের মন্ত্র এক হউক, তোমাদের সমিতি সকলের মিলন-ভূমি হউক, তোমাদের মন এক হউক, চিত্ত সম্মিলিত হউক। তোমাদের সকলকে বিধাতা একই মন্ত্রে সংযোগ করিয়াছেন। তোমাদের সকলের জন্য অন্ন ও উপভোগ একই প্রকারের দিয়াছেন। তোমাদের সকলের আকাঙ্ক্ষা এক হউক, তোমাদের হৃদয় পরস্পর মিলুক—তোমাদের মন যুক্ত হউক। এইভাবে তোমাদের সকলের শক্তিবৃদ্ধি হউক।

এই আহ্বান বিশ্বজনীন আহ্বান। নতচিত্তে ভাবি যে, ছয়হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে বিশ্বমৈত্রীর স্বপ্ন দেখা হইয়াছিল, আজ তাহা কল্পনায় দিয়াছে নূতন রূপ, আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইবার আশা ও আকাঙ্ক্ষা রাখে। বিশ্বরাষ্ট্র এবং বিশ্বজনীন ঐক্যের আধ্যাত্মিক পটভূমি কেবল ভারতবর্ষই দিতে পারিবে। অর্থনীতি এবং রাজনীতির উপর বিশ্বাত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না—তাহার জন্য চাই দার্শনিক

রঙ্গমঞ্চ। ভারতবর্ষ বিশ্বরাষ্ট্রের এই দার্শনিক প্রতিবেশ রচনা করিতে পারিয়াছিল এবং সে প্রতিবেশের উপরই আমাদের বিশ্বভ্রাতৃত্বের পরিকল্পনা দাঁড় করাইতে হইবে।

আমেরিকার শ্রমিক প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তরে তাহার বাঞ্ছিত রাষ্ট্রের কথায় ষ্টালিন বলিয়াছেন :

"It is a society in which there will be no private ownership of the instruments and means of production, but social collective ownership ; there will be no class or state but workers in industry and agriculture managing their economic affairs as a free association of working people ; national economy organized according to plan, will be based on the highest technique in both industry and agriculture, there will bo no antithesis between country and town, between industry and agriculture ; products will be distributed according to the principle of the old French communists : 'from each according to his abilities, to each according to his needs' ; science and art will enjoy conditions conducive to their highest development ; the individual, freed from bread and butter cares and of the necessity of cringing to the 'powers that be' will really become free."

কমিউনিষ্টদের এই আদর্শ বেদ অন্যভাবে সফল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক মানুষকে অমৃতের সন্তান বলিয়া নির্দ্দেশ দিয়া বেদ মানুষের সর্ব্বোচ ঐক্য এবং অভিন্নতা প্রচার করিয়াছেন। ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, এই মন্ত্র প্রচার করিয়া ধনিক-সমাজের ঘৃণ্য লোলুপতার শেষ করিয়াছিলেন।

পৃথিবী আজ নানাদিকে জ্ঞানবিজ্ঞানে সমৃদ্ধ। মানুষের প্রতিভা আজ

অপরাজেয় স্পর্দ্ধায় প্রকৃতিকে জয় করিতেছে। আজ মানুষের প্রতিভা যদি মানুষকে শ্রেয়ের পথ না দেখায়, তবে ধ্বংসের পথ অনিবার্য্য। পৃথিবীতে কল্যাণ, শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠার বিরাট কর্ম্মে বেদ আমাদের পরম সহায় হইবে।

বেদ মানুষকে ক্ষণিকের বাহিরে যে শাশ্বত শক্তি ও সত্য তাহাকে অনুধাবন করিতে বলিতেছে। আমাদের নিত্যপাঠ্য গায়ত্রী-মন্ত্র ক্ষুদ্রের সহিত বৃহতের এই নিত্য সংযোগের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

পরমাত্মার বরণীয় ভর্গকে আমরা ধ্যান করি—তার তেজ পাপ-বিনাশক এবং বরণীয় সেই তেজের উপাসনা করি। তিনিই আমাদের ধীশক্তিকে পরিচালিত করেন। এই চিন্তা করিলে আমরা উপলব্ধি করিব যে, আমাদের দুঃখের বা ভয়ের কোনও কারণ নাই। আমরা প্রত্যেকেই সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ। চিরজ্যোতির্ম্ময়ের আমরা অংশ। সেই আনন্দঘন পুরুষের সাক্ষাৎ-লাভই জীবনের কাম্য। তাই প্রতিদিন প্রার্থনা করিব :—

বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতাণি পরাসুব।
যদ্ভদ্রন্তন্ন আসুব ॥

হে জগৎপ্রসবিতা পিতা, তুমি জীবনে যাহা আনে দুঃখ এবং ক্লেশ, তাহা দূর কর, যাহা ভদ্র, যাহা কল্যাণ, তাহাই দান কর।

বেদ আমাদের সংস্কৃতির ধাত্রী। সেই বেদমাতার নিকট বিশ্বকল্যাণ প্রার্থনা করি। দেশে বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি জাগ্রত হউক। সমস্ত মানুষের জন্য স্বস্তি ও শান্তি, শ্রী ও আনন্দ, মুক্তি এবং অপবর্গ প্রার্থনা করি।

যে দেবানাং যজ্ঞিয়া যজ্ঞিয়ানাং মনোর্যজত্রা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
তে নো রাসন্তামুরুগায়মদ্য যূয়ং পাত স্বস্তিভিঃ সদা নঃ॥

ঋগ্বেদ ৭।৩৫।১৫

যজ্ঞজীবনের পথে যে দেবগণের সন্ধান পাই, সেই দেবগণের পূজ্য, মৃত্যুভয়রহিত সত্যবেত্তা যাঁরা, তাঁরা আজ আমাদের সত্য পথের নির্দ্দেশ করুন। তাঁরা সর্ব্বদা স্বস্তি দিয়া আমাদিগকে সুপথে পরিচালিত করুন।

অথর্ব্ববেদের মন্ত্রমালা

জীবনে আজ এসেছে তীব্র সংগ্রাম বোধ।

আর্থিক অভ্যুদয়ের মায়া-মরীচিকা মানুষকে দিগ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে। মানুষ তার শাশ্বত মহিমাকে ভুলতে বসেছে, তার চারিত্রিক ভদ্রতা, তার নৈতিক শ্রী, তার অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা, তার অমৃতের ক্ষুধা সকলই আজ বিনষ্টির পথে।

এই মহতী বিনষ্টির যুগে আমাদের প্রাচীন ভাবধারা আমাদিগকে বাঁচাতে পারে। অথর্ব্ববেদের মন্ত্রমালার মাঝে যে দিব্যজীবনের আকৃতি আছে, যে অধ্যাত্ম পরিবেশ আছে, আজ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তার আলোচনা করব।

অথর্ব্ববেদ জনসাধারণের বেদ। যজ্ঞপন্থীর আড়ম্বরময় শ্রৌতযজ্ঞের বিরাট ও বিপুল আয়োজনের ভাবনা এখানে নয়, এখানে সাধারণ মানুষ

কেমন করে তার সাধারণ জীবনকে অসাধারণ বিভূতিতে দীপ্ত করতে পারে, সেই বিনিয়োগের কথাই ঋষিরা বলেছেন; জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তার প্রাত্যহিক যে জীবম ধূলিধূসর, ভয়ব্যাকুল এবং সংশয়ত্রস্ত, তাহাকে এক অমৃতত্বের বিভায় আলোকিত করবার পন্থা দিয়েছেন। জীবনকে ছন্দোময় ও সুষমাময় করবার এই আয়োজনকে অনেকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করেন নি—অনেকে অথর্ব্বমন্ত্রমালাকে শান্তি ও পৌষ্টিক কর্ম্ম এবং অভিচার-মন্ত্ররূপে দেখেন, তাই এর অন্তর্নিহিত মাধুর্য্য অনুভব করেন না।

অথর্ব্বমন্ত্রমালায় কোনও বিনিয়োগ নাই—সূত্র এবং কল্প গ্রন্থে এই মন্ত্রমালার প্রয়োগ নিয়ে চুলচেরা বিচার হয়েছে। সেই প্রয়োগের পটভূমিকায় মন্ত্রগুলিকে বুঝতে গেলে আমরা এই দিব্যমন্ত্র সংগ্রহের যথার্থ সম্মান দিতে পারব না। এইজন্য মন্ত্রগুলিকে একমাত্র তার কাব্যার্থ এবং ব্যঞ্জনার মাঝে অনুভব করবার চেষ্টা করব।

অথর্ব্ববেদী জীবন-বাদী।

পার্থিব জীবনকে পাপময় ভেবে তাকে তিনি অবজ্ঞা করেন না; মর্ত্ত্যের মর অঙ্গনেই মানুষের অমৃত লীলায়ন এ কথা শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন।

তাই ঋষি গান করেন :—

শ্রমেণ তপসা সৃষ্টা ব্রহ্মণা বিত্তর্তে শ্রিতা।
সত্যেনাবৃতা শ্রিয়া প্রাবৃতা যশসা পরীবৃতা॥
স্বধয়া পরিহিতা শ্রদ্ধয়া পর্যূঢ়া দীক্ষয়া গুপ্তা
যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতা লোকো নিধনম্॥

যে অমৃত-বিদ্যা মানুষের জীবনকে প্রদীপ্ত করে, পরিতৃপ্ত করে এবং প্রসন্ন করে, সে বিদ্যা অনায়াস-লভ্য নয়, তার জন্য চাই অবিশ্রান্ত যত্ন, চাই অবিরাম তপস্যা। শ্রম ও তপস্যায় সেই ব্রহ্মবাণী সৃষ্ট হয়। ভক্তি

এবং জ্ঞানে তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সুগভীর সত্য ঋতে আশ্রিত, সত্য তাহার আবরণ, সত্য তাহার বিজয়শ্রী, কল্যাণে তাহা প্রাবৃত এবং যশে তাহা পরিবৃত।

মানুষের মাঝে রয়েছে পরিপূর্ণতার স্বধা—তার মাঝে আছে অমৃতের অব্যক্ত শক্তি, নিজের আচরণে ও কর্ম্মে সেই আত্মবৈশিষ্ট্যকে মানুষ যেন ফুটিয়ে তোলে, চাই সুগভীর আত্মবিশ্বাস, দৃঢ় শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা মানুষের অন্তরে দিক আশা। মানুষ অমৃতের সন্তান—অমৃতত্ব তার নিজস্ব প্রকৃতি। জীবনে সেই অমৃতকে সে প্রকাশ করুক। এই যে তার অমৃতের জীবনবাণী, দীক্ষা তাকে প্রতিষ্ঠিত করে, যজ্ঞ তাকে ধারণ করে—এই ত্রিলোক তার নিবাসভূমি।

অথর্ব্ববাদী সাধারণ মানুষের মনে এই স্বধার প্রতি শ্রদ্ধা আনতে উৎসুক। মানুষকে তার পাশব প্রকৃতি থেকে দিব্য স্বভাবে উত্তরণের জন্য ঋষি ডাক দিয়েছেন। সে আহ্বান যে শুনবে, সে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকতে পারে না—তাকে করতে হবে অশেষ তপস্যা। শ্রম ও প্রযত্নে তার জীবনে আসবে অভ্যুদয়—সেই পরম জ্ঞান বেদজ্ঞানেই মানুষের চিত্তে করে উদয়ন।

এই অলৌকিক বিদ্যা পরম সত্যে চির প্রতিষ্ঠিত—সমস্ত শ্রী সমস্ত প্রতিষ্ঠা, সমস্ত বৈভব এই মহীয়সী বিদ্যায় লাভ হয়।

এই বিদ্যার যে মূল, তাকে ব্রহ্মরূপে ঋষি অভিনন্দন করেন। সেই পরব্রহ্মকে বন্দনা করে ঋষি জীবন-বৃত্ত নিয়মিত করেন।

মহদ্যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে তপসি ক্রান্তং সলিলস্য পৃষ্ঠে।
তস্মিঞ্ছ্রয়ন্তে য উ কে চ দেবা বৃক্ষস্য স্কন্ধঃ পরিত ইব শাখাঃ॥

সেই দিব্য পুরুষ মহতো মহীয়ান্, চির তপস্যায় সমাসীন। বিস্তৃতা পৃথিবীর মাঝে, সলিলের পৃষ্ঠে তিনি বিরাজমান। কারণার্ণবশায়ী সেই

পরম দেবতাকে আর সব দেবতারা আশ্রয় করেন, যেমন ভাবে বনস্পতির শাখাসকল বৃক্ষের স্কন্ধে লগ্ন থাকে।

এই ব্রহ্মানুভূতিই মানুষের জীবনের চরম ও পরম। তাই মানুষ বিশ্বাসে ও আশায়, আনন্দে ও শ্রদ্ধায় তাকে নমস্কার করবে :—

যো ভূতং চ ভব্যং চ সর্ব্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্ব্যর্য্যস্য চ কেবলং তস্মৈ জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মনে নমঃ॥

সেই পরমেষ্ঠী পরমপিতাকে নমস্কার।

যিনি ভূত—যাহা কিছু বিকশিত হয়েছে, তাহা তাহারই লীলায়ন, যাহা কিছু ব্যক্ত হবে, তাহা সবই তার দিব্য বিভূতি। এই বিশ্বজগতের যিনি পরিনিয়ন্তা, যার দৈবীপ্রভায় সমস্ত জগৎ প্রভান্বিত, সেই জ্যেষ্ঠ পরব্রহ্মকে পূজা করি।

পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচতি পূর্ণং পূর্ণেন সিচ্যতে।
উতো তদস্য বিদ্যাম যতস্তৎ পরিষিচ্যতে।

তিনি যে পরম পরিপূর্ণতা।

পূর্ণতার কারণ-সলিল হতে তিনি পূর্ণকেই প্রকাশ করেন, পূর্ণতা দিয়ে তিনি পূর্ণকেই অভিসিঞ্চন করেন। এই যে তার বিচিত্র লীলাভিসার, যে লীলায় তিনি পূর্ণতা দিয়ে জগৎকে সেচন করছেন, সে তাঁরই মহিমময় ক্রীড়া-নিবাস।

অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভূ রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনো নঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোরাত্মানম্ ধীরমজরং যুবানম্।

সেই অজর অমর আত্মা চিরযুবা, সেই চিরযৌবনময় ব্রহ্মাকে যে জানে সে হয় অকাম, কামনার দাবদাহ তাকে আর ত্যক্ত করে না, সে হয় ধীর দৃঢ়ব্রত—অধ্যবসায়ে ইষ্টলাভ সে করে, মৃত্যুর নাগপাশ ছেদন ক'রে

সে অমৃতত্ব লাভ করে, সে স্বয়ম্ভু হয়, পরম রসের রসায়নে সে পায় পরমানন্দ—কিছুই তার অপ্রাপ্য থাকে না, তাকে জানলে মৃত্যুর ভয় আর থাকে না।

অথর্ব্ববেদ মানুষের জীবনে এই দিব্য ব্রাহ্মী বিভূতি আনতে চেয়েছে, কিন্তু বহু লোকেই অথর্ব্বণের এই অনুজ্ঞা বিস্মৃত হয়ে কেবল তার মন্ত্র ও অভিচারের উপর জোর দিয়ে এই ব্রহ্মবেদের প্রতি অবিচার করেছেন। ঋষি চেয়েছেন মানুষের সমস্ত কর্ম্মকে, সমস্ত চেষ্টাকে, সমস্ত সাধনাকে ঋতময় করে তুলতে, ব্রহ্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় নিষ্ঠায় সমস্তকে সমুজ্জ্বল করতে। সেই পটভূমিকাকে সর্ব্বদা দৃষ্টিপথে না রাখলে, অথর্ব্বমন্ত্র-মালার যথার্থ অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

ব্রাহ্মীস্থিতিকে নির্ভর আশ্রয় করে গৃহীর জীবন চলে—জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তার সমস্ত আচরণ এবং সমস্ত প্রচেষ্টাকে এক দিব্য শক্তিতে রূপান্তরিত করবার সাধনায় গৃহী ব্যাকুল। সেই আকুতির আবেগে তার জীবনের প্রতি চরণক্ষেপকে সে এক অমোঘ বীর্য্যে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়, এবং এই আকাঙ্ক্ষার ফলে সে তার জীবনযাত্রার প্রতি পর্ব্বকে ছন্দোময় করতে চায়।

চলার পথে প্রথম চাই সৌষম্য। যদৃচ্ছায় অনিয়মে যদি সংসার চলে, তবে ধর্ম্ম-সাধনা অসম্ভব। তাই গৃহী পুষ্টি ও প্রগতির জন্য চান সুসঙ্গতি ও ঐক্য, তার কণ্ঠে জাগে মন্ত্র :—

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যো অন্যমভি হর্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা॥ ১
অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ।
জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শন্তিবাম্॥ ২
মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা।

সম্যঞ্চ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া ॥ ৩
যেনা দেবা ন বিযন্তি নো চ বিদ্বিষতে মিথঃ।
তৎ কৃণ্মো ব্রহ্ম বো গৃহে সংজ্ঞানং পুরুষেভ্যঃ ॥ ৪
জ্যায়স্বন্তশ্চিত্তিনো মা বি যৌষ্ট সংরাধয়ন্তঃ সধুরাশ্চরন্তঃ।
অন্যো অন্যস্মৈ বল্গু বদন্ত এত সধ্রীচীনান্ বঃ সংমনসস্কৃণোমি ॥ ৫
সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি।
সম্যঞ্চোগ্নিং সপর্যতরা নাভিমিবাভিতঃ ॥ ৬
সধ্রীচীনান্ বঃ সংমনসস্কৃণোম্যেকশ্নুষ্টীন্ত্সংবননেন সর্বান্।
দেবা ইবামৃতং রক্ষমাণাঃ স্বায়ংপ্রাতঃ সৌমনসে বো অস্তু ॥ ৭

বিবাদের মেঘচ্ছায়া যখন ঘনায়, তখন পুরোহিত আসেন, বিরোধের শেষ ক'রে, প্রীতি ও ঐক্যের মাধুর্য্যে অভিষিক্ত করতে গাহেন মন্ত্রমালা। তোমাদের হৃদয় হোক সমানচিত্তবৃত্তিযুক্ত, ভালবাসার সত্য-বীর্য্যে তোমাদের জীবনে আসুক ছন্দলীলা, সহৃদয়তা এবং সৌমনস্যের জন্য আমি প্রার্থনা করি—বৎসকে যেমন জাতমাত্র গাভী সমাদর করে, তোমারাও তেমনই পরস্পরকে একাগ্র প্রেমের স্ফুরণে কামনা কর—প্রীতির আনন্দে পরস্পরকে আবৃত কর।

পিতা ও পুত্রের মাঝে রহুক অপ্রতিহত আনুগত্য, পুত্র হোক পিতার অনুব্রত। জননীর মনের সাথে মিলুক সন্তানের মন। আনুগত্যের উদার বন্ধনে বদ্ধ হোক জনক ও জাত; জায়া ও পতির জীবনে নিত্য রহুক মিলনের মোহ। পত্নী পতিকে বলুন মধুমতী ভাষা, সুখময় ও মধুময় আলাপে দুজনের প্রাণে প্রাণে জাগুক রসোল্লাস।

ভ্রাতায় ভ্রাতায় অপ্রিয় আচরণ যেন না হয়, ভগিনী ও ভগিনীতে যেন দ্বেষ না রয়, ভ্রাতা ও ভগিনীর যাত্রাপথ হোক একমুখী। সমান গতি, সমান ব্রত তাদের পরস্পরকে মিলনের অচ্ছেদ্য গ্রন্থিতে বন্ধন

করুক। ভদ্র ও কল্যাণময়ী বাণী তাদের আলাপকে ছন্দিত ও নন্দিত করুক।

আমি বলব সেই মিলনমুখর মন্ত্র ; যে বাণী শুনে দেবতারা হবেন প্রীত, সংসারে বিদ্বেষ এবং বিরোধ হবে অপহিত, সেই মন্ত্রে গৃহের নরনারীকে করব আপ্যায়িত। জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের মাঝে রহুক সমন্বয়, একে করুক অপরের অনুসরণ। এক হোক তাদের চিত্ত, এক হোক আরাধনা। তাদের এক হবে কর্ত্তব্য-ভার। তাদের আসবে না কোথাও বিয়োগ-ব্যথা—কোথাও বিযুক্তির বিষবাস্প। পরস্পর পরস্পরকে বলুক শোভন ও প্রিয় বাক্য। আমি তোমাদের মাঝে এনে দেব সৌমনস্য—তোমাদের হবে পরম সম্প্রীতি।

এক হোক তোমাদের পানশালা, এক হোক পরস্পরানুরাগে সংবদ্ধ ভোজনোৎসব। তোমাদের আমি বাঁধব একই মিলনরাখীতে—একই স্নেহপাশে তোমাদের করব আকৃষ্ট। একই রথচক্রের নাভিকেন্দ্রের চারিপাশে যেমন শলাকা থাকে যুক্ত, তেমনই একই আদর্শের অনুসরণে তোমরা হবে ঐক্যে ও স্নেহে সমুদ্বোধিত।

দেবতারা যেমন রক্ষা করেন অমৃতকে, তোমরাও তেমনই সায়ংকালে এবং প্রাতে সমানমনা হয়ে প্রেমকে পরিপালন কর। একই যজ্ঞে হও যাজ্ঞিক, একই ব্রতে ব্রতী, তোমাদের মাঝে আমি আনব পরম মধুর ঐক্য। তোমাদের অন্নপান এক হোক। মধুময় এই সম্মেলনের মন্ত্র তোমাদের সর্ব্ব-কল্যাণকারক হোক—তোমরা অমৃত-চৈতন্যে উদ্ভাসিত হও।

জীবনে যে জড় প্রকৃতির ব্যাপক লীলা, মানুষকে দুঃখাভিনয়ের দুর্ব্বহ ভারে পীড়িত করে, সেই জড় জীবন ছেড়ে আথর্ব্বণ গৃহীকে ডাকেন দেবত্বের স্বাধিকারে। অমৃতের পুত্রের অনুভবে আনতে চান অগ্নিদীপ্তি,

পরাচেতনার পরম সম্পৎ। আনন্দের নির্ঝর-ধারায় জীবনকে প্লাবিত করবার যোগপন্থা তিনি দেখিয়ে দিয়ে জীবনযাত্রাকে করতে চান প্রমাদহীন ও পরাজয়হীন।

তাই চলে আবৃত্তি:—

জিতমস্মাকমুদ্ভিন্নস্মাকমভ্যষ্টাং বিশ্বাঃ পৃতনাঃ অরাতীঃ॥ ১
তদগ্নিরাহ তদু সোম আহ পূষা মা সুকৃতে লোকে॥ ২
অগন্মস্বঃ স্বরগন্ম সং-সূর্য্যস্য জ্যোতিষাগন্ম॥ ৩
যস্তোভূয়ায় বসুমান্ যজ্ঞো বসু বংশিষীয় বসুমান্ ভূয়াসং বসু
মযি ধেহি॥ ৪

বিজয় বৈজয়ন্তী আমাদের।

আমাদের জয়পতাকা উড়বে দিকে দিকে—আমরা বিজয়ী বীরের দল।

উদ্বোধন আমাদের, অভ্যুদয় আমাদের! আমাদের জন্যই পরমা স্থিতি আনন্দচকিত ভূমি।

বিশ্বের যত অরাতি সবই যেন দলন করি।

বিদ্বেষ এবং দ্রোহ যেন পরাজয় লাভ করে।

এই কথা বলেছেন অগ্নি—যার দিব্য জ্যোতি জীবনকে করে ভাস্বর। এই কথা বলেছেন সোম—যার আনন্দের প্রবাহ বিচিত্র ও মুক্তচ্ছন্দ। দেব পূষা সুকৃতলোকে আমার অবস্থান নিরূপিত করুন।

আমরা পেয়েছি স্বর্গলোকের স্বরূপ জ্যোতি—পেয়েছি পরাসংবিতের পরমা দ্যুতি। যার তেজের দিব্য রাগিণীতে দ্যুলোক অনুপ্রাণিত, সেই আদিত্যের পরম জ্যোতিস্বরূপকে আমরা জেনেছি—আমরা পেয়েছি সেই আলোর অমৃত-ভাণ্ডার।

যে পরা কাষ্ঠার জন্য, যে পরাগতির প্রয়াসে, যে দিব্য প্রৈতির প্রেরণায় মানুষের যাত্রা, তাহা সফল হোক। যজ্ঞ বসুমান্। যে জীবন উৎসৃজিত, সেই জীবনে আসে সচ্চিদানন্দের বিভূতি-বিলাস। সংসার-অভিযান-ক্লান্ত আমরা চাই সেই পরমানন্দের পরিস্ফুরণ, দুঃখের অরণি মন্থন ক'রে আমরা জ্বালাতে চাই সেই ক্রতুময় বহ্নি-শিখা, যা এনে দেবে পুরুষোত্তমের পরমধন।

জীবনের তপস্যায় আসুক আনন্দ-সমুদ্রের গোপন গুহায় নিহিত পরমা শ্রী। বসুমান হয়ে আমরা উল্লসিত হই।

কিন্তু কেবল প্রেম ও আনন্দের কথা বলে পাঠককে দিগ্‌ভ্রান্ত করব না। অথর্ব্ববেদ, মানুষের জীবনে যে নীচতা আছে, তাকে অস্বীকার করেন নি। তিনি মানুষের সেই পাশবতাকে শুধু উচ্চতার পথে মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন। তার হিংসাকে গর্ব্বনির্ভর না করে দেবনির্ভর করে হিংসাকে প্রেমে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করেছেন। অবিবেকের খেলাকে আথর্ব্বণ বিবেকের ছন্দে ছন্দিত করতে চেয়েছেন—লালসাকে লোলুপতর প্রবৃত্তির দিকে না টেনে, তার মাঝে এক বৃহতের প্রেরণা জুড়ে দিয়েছেন। অনতিক্রমণীয় মানবতাকে দিব্য ভাগবতী শক্তির দ্যোতনায় দ্যোতিত করতে চেয়েছেন। এই ভাবটিকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বুঝতে চেষ্টা করেন নি। এইজন্য তারা অথর্ব্ববেদের মহিমা ও স্বরূপকে সত্যভাবে উপলব্ধি করেন নি।

পণ্ডিতবর বেবর লিখেছেন :—

"In the Rik, there breathes a lively natural feeling, a warm love for nature ; while in the Atharvan, there prevails, on the contrary, only an anxious dread of her evil spirits and their magical powers. In the Rik, we find the people

in a state of free activity and independence; in the Atharvan, we see it bound in the fetters of hierarchy and superstition". বেবরের মনীষা ও প্রতিভার যথাযোগ্য সম্মান করেও বলব, এই মতবাদ যথার্থ নহে। অথর্ব্ববেদকে যথামতি পড়লে আমরা তার প্রজ্ঞান, চিন্ময় ব্যঞ্জনা এবং অখণ্ড ব্রহ্মরসে লীলায়িত জীবনবৃত্তের অন্তর্নিহিত মাধুর্য্য উপলব্ধি করতে পারব।

উদাহরণ-স্বরূপ দ্বিতীয় কাণ্ডের সপ্তবিংশ সূক্তের উল্লেখ করছি :—

নেচ্ছত্রুঃ প্রাশং জয়াতি সহমানাভিভূরসি।
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে॥ ১
সুপর্ণাস্ত্বান্ববিন্দৎ সূকরস্ত্বাখনন্নসা।
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে॥ ২
ইন্দ্রো হ চক্রে ত্বা বাহাবসুরেভ্যস্তরীতবে।
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে॥ ৩
পাটামিন্দ্রো ব্যাশ্নাদসুরেভ্যস্তরীতবে
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে॥ ৪
তয়াহং শত্রূন্ত্ সাক্ষ ইন্দ্রঃ সালাবৃকাঁ ইব
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে॥ ৫
রুদ্র জলাষভেষজ নীলশিখণ্ড কর্ম্মকৃৎ
প্রাশং প্রতিপ্রাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে॥ ৬
তস্য প্রাশং ত্বং জহি যো ন ইন্দ্রাভিদাসতি।
অধি নো ব্রূহি শক্তিভিঃ প্রাশি মামুত্তরং কৃধি॥ ৭

বৈদিক যুগে তর্কযুদ্ধ প্রচলিত ছিল।

বক্তা প্রতিবাদীর পরাজয় চান, তাই তিনি দৈববলের আশ্রয় নিতেছেন।

পাটা নামক ওষধির মূল মন্ত্রপূত করে খেয়ে অপরাজিত দেশ হতে তিনি সভাস্থানে প্রবেশ করতেন। অন্যান্য সূত্রকার অন্য ব্যবস্থা দিয়েছেন। কেহ বলেছেন, এই মন্ত্রে পাটামূল সপ্ত-পত্র-বিরচিত মালায় রেখে মস্তকে ধারণ করতে হবে—কেহ বলেছেন একে মণিবন্ধনে প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু সে প্রয়োগের মন্ত্রার্থ কি অনুধাবন করা যাক :—

হে ওষধি, প্রতিবাদী যেন তোমার প্রভাবে আমাকে পরাজয় না করে, তোমার শত্রুদমন-শক্তি অজেয়, তুমি বীর্য্যযুক্তা পরাভবকারিণী, তোমার বলে আমার যেন পরাজয় না হয়।

প্রতিবাদীর প্রশ্নকে তুমি হনন কর, তাকে অসঙ্গত প্রলাপী কর।

সুপর্ণ বৈনতেয় তোমায় বিষহরণের জন্য লাভ করেছিলেন, আদিবরাহ তোমায় নাসিকা দিয়া খনন করেছিলেন, তুমি শত্রুর বাক্য বিনাশ কর, তার সংলাপকে নীরস কর।

ত্রিলোকপতি ইন্দ্র অসুরতরণের জন্য তোমায় দক্ষিণবাহুতে ধারণ করেছিলেম। আমিও তোমায় বিজয়-লাভের জন্য ধারণ করছি। হে ওষধি, তুমি প্রতিবাদীর প্রশ্নকে খর্ব্ব কর, তার ভাষণকে শুষ্ক ও রসরহিত কর।

ইন্দ্র অসুর-হননের জন্য পাটা ভক্ষণ করেছিলেন, আমিও ভক্ষণ করছি। হে ওষধি, শত্রুর, বিবাদীর বাক্যজাল ছিন্ন কর, তার আলাপে অসঙ্গতি আন।

ইন্দ্র যেমন বৃক জয় করেছিলেন, তেমনই তোমার বলে আমি শত্রু দমন করব। হে ওষধি, প্রতিবাদীর প্রশ্ন পিষ্ট কর, তার আলাপকে অরস কর।

হে রুদ্র, জীবনের সমস্ত দুঃখ তুমি দূর কর, তুমি শিব পরম কারণ, তুমি তারকব্রহ্ম, তোমায় স্মরণমাত্রই উদক ভেষজে পরিণত হয়। হে

চিরতরুণ নীলজটাজালযুক্ত রুদ্র, তুমি মহান কর্ম্মকৃৎ। যাহা কিছু বৃহৎ তাহা তোমারই সাধনা। তুমি শত্রুজয়ে দাও অসীম শক্তি—প্রতিবাদী প্রতিহত হোক—তার কণ্ঠ শুষ্ক ও নীরস হোক।

হে ইন্দ্র, যুক্তিজালে যে আমাদের তিরস্কার করে, তর্কজালে যে আচ্ছন্ন করে, তাদের প্রশ্নসকল তুমি খণ্ডন কর। তোমার অজেয় সামর্থ্য দিয়ে আমাদের অপরাজেয় কর—আমায় দাও লোকোত্তর প্রতিভা—তর্কযুদ্ধে আমায় কর বিজয়ী—আমায় কর শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ।

আথর্ব্বণ নব জীবন-যজ্ঞের ঋত্বিক।

মানুষের মধ্যে র'য়েছে দুর্দ্দম জয়-লালসা। শত্রুনিধনের আকাঙ্ক্ষা তার সনাতন। সেই নিত্য বিরোধকে ঋষি স্বীকার করে নিয়েছেন—নিয়ে মানুষের স্বভাবকে বদলাতে চেয়েছেন—পরাজয় করবার যে বাসনাবহ্নি তাকে রূপায়িত করেছে নির্ভরতার নিবিড় আশ্রয়। অসুন্দর মানুষকে এমন ভাবেই সুন্দর করবার জন্য ঋষির ব্যাকুলতা।

কমিউনিজম আজ মানুষের জীবনে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য আনতে চায়—তার জন্য উহা চায় ধনবণ্টনের সাম্য। কিন্তু বাইরে যতই সামঞ্জস্য আনি, মানুষে মানুষে যে ভেদ, অর্থনৈতিক সাম্য দিয়ে উহা যতই লোপ করি না কেন, তাতে শাশ্বত সফলতা আসবে না। তার জন্য চাই পরিপূর্ণতার আত্মবোধ। প্রেমদৃপ্ত প্রতিভার মাধুর্য্যে জীবনকে করতে হবে দৃপ্ত, কঠোর ব্রতচারী হয়ে করতে হবে ত্যাগের সাধনা। প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় অন্যায় ও অসঙ্গতি আছে, কিন্তু কেবলমাত্র সামাজিক ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনে জীবনে সৌন্দর্য্যের উদ্বোধন হবে না। ভাগবত-বিশ্বাসের দীপ্ত হোমাগ্নির শিখা যদি না বিচ্ছুরিত হয়, যদি না ভাগবত আত্মীয়তার বোধ মানুষে মানুষে আনে সাম্যবোধ, তবে কেবল ধনসাম্যে জগৎ সুন্দর ও

মধুর হবে না। লোভ ও মোহের যে আচ্ছন্ন পরিবেশ, তাকে পরিবর্ত্তিত করতে চাই নব দৃগ্‌ভঙ্গী।

জীবনে তেজোদৃপ্ত যৌবনশ্রী ফুটাবার জন্য আথর্ব্বণ ব্যগ্র। তার সেই আকৃতি শুনি নানান মন্ত্রে নানান ছন্দে। তারই একটা তুলছি :—

নববর্ষের মাঝে চিরনবীন শক্তির প্রার্থনা ক'রে ঋষি প্রার্থনা করেছেন :—

প্রথমা হ ব্যুবাস সা ধেনুরভবদ্ যমে।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম॥ ১
যাং দেবাঃ প্রতিনন্দতি রাত্রিং ধেনুমুপায়তীং।
সংবৎসরস্য যা পত্নী স নো অস্তু সুমঙ্গলী॥ ২
সংবৎসরস্য প্রতিমাং যাং ত্বা রাত্র্যুপাস্মহে।
সা ন আয়ুষ্মতীং প্রজাং রায়স্পোষেণ সংসৃজ॥ ৩
ইয়মেব সা যা প্রথমা ব্যৌচ্ছদাস্বিতরাসু চরতি প্রবিষ্টা।
মহান্তো অস্যাং মহিমানো অন্তর্ব্বধুর্জ্জিগায় নবগজ্জনিত্রী॥ ৪
বানস্পত্যা গ্রাবাণো ঘোষমক্রত হবিষ্কৃণ্বন্তঃ পরিবৎসরীণম্।
একাষ্টকে সুপ্রজসঃ সুবীরা বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীনাম্॥ ৫
ইড়ায়াস্পদং ঘৃতবৎ সরীসৃপং জাতবেদঃ প্রতি হব্যা গৃভায়।
যে গ্রাম্যাঃ পশবো বিশ্বরূপাস্তেষাং সপ্তানাং ময়ি রন্তিরস্তু॥ ৬
আ মা পুষ্টে চ পোষে চ রাত্রি দেবানাং সুমতৌ স্যাম।
পূর্ণা দর্ব্বে পরা পত সুপূর্ণা পুনরা পত।
সর্ব্বান্ যজ্ঞাস্ত্‌ সংভুঞ্জতীষভূর্জ্জং ন আ ভর॥ ৭
আয়মগন্ত্‌ সংবৎসরঃ প্রতিরেকাষ্টকে তব।
সা ন আয়ুষ্মতীং প্রজাং রয়িস্পোষেণ সংসৃজ॥ ৮
ঋতূন্ যজ ঋতুপতীমার্ত্তাবাম্নত হায়নান্।

সমাঃ সংবৎসরান্ মাসান্ ভূতস্য পতয়ে যজে॥ ৯
ঋতুভ্যষ্টার্ত্তবেভ্যো মাদ্ভ্যঃ সংবৎসরেভ্যঃ।
ধাত্রে বিধাত্রে সমৃধে ভূতস্য পতয়ে যজে॥ ১০
ইড়য়া জুহ্বতো বয়ং দেবান ঘৃতবতা যজে।
গৃহানলুভ্যতো বয়ং সং বিশেমোপ গোমতঃ॥ ১১
একাষ্টকা তপসা তপ্যমানা জজান গর্ভং মহিমানমিন্দ্রম্।
তেন দেবা ব্যনহন্ত শত্রূন্ হন্তা দস্যুনামভবচ্ছীতিপতিঃ॥ ১২
ইন্দ্রপুত্রে সোমপুত্রে দুহিতাসি প্রজাপতেঃ।
কামানস্মাকম্ পূরয় প্রতি গৃহ্ণাহি নো হবি॥

এই দীর্ঘ কবিতায় নব বৎসরের উদয়নকে নবীন ছন্দে ঋষি অভিনন্দন করছেন কত শতাব্দী পূর্ব্বে—না জানি কোন্ পুণ্য বৎসরের আবির্ভাবের প্রাক্ যামিনীতে।

সৃষ্টির আদিতে ছিল না দিবা, ছিল না রাত্রি।

সেই অন্তহীন কালের অনন্ত যাত্রাপথে এই প্রথমা উষসী—পিতৃলোকাধিপতি যমরাজের সে প্রিয়পাত্রী। একাষ্টকা দিনের সে অক্ষয়ফলসাধনাপূত সুরভি ধেনু। সে আমাদের নিকট পয়স্বতী হয়ে বৎসরের পর বৎসর অভিমত ফল প্রদান করুক।

জীবনের যে অমৃত অভীপ্সা, তাহা উত্তরোত্তর সার্থকতায় স্নিগ্ধ ও তর্পিত হোক। একাষ্টকার পূর্ব্বরাত্রিকে দেবতারা অভিনন্দিত করেন। হবির্ভোগের আনন্দে ব্যগ্র হয়ে ওঠেন আলোকের প্লাবনে জ্যোতির্ম্ময়ী পরমা রাত্রি—সম্বৎসরের প্রিয়া পত্নীস্বরূপা। হে অন্তর্গূঢ় রহস্যময়ী, তুমি আমাদের সুমঙ্গলী সুকল্যাণী হও।

হে সংবৎসরের প্রতিমা রজনী! তোমায় আমরা অর্চনা করি। তুমি আমাদের জীবনে এনে দাও অমৃত-সংযোগ—পরিপুষ্টির নিত্যবর্দ্ধমান

উৎসাহে আমাদিগকে উজ্জীবিত কর, আমাদিগকে আয়ুষ্মতী প্রজা দাও।

এই ত তিনি, যিনি প্রথমে এসেছিলেন অরুণোদয়ের জ্যোতির্চ্ছটায় ভাস্বর হয়ে, সকলের মাঝখানে তার পরম. প্রতিষ্ঠা, ইহার মহিমা অনন্তপার—জ্যোতির নিঃসীমলোকে ইহার গৌরবরেখা। পুনঃ পুন জায়মানা এই চিরতরুণী বধূর দিকে সূর্য্যের চির অতৃপ্ত অভিসার—ইনি মানুষের জন্য আনেন চির অভ্যুদয়, চির উৎকর্ষ।

চারিদিকে চলে উৎসবের কলকোলাহল।

সোমরস প্রস্তুতির বিরাট আয়োজনে শিলনোড়ার উদূখলমুষলাদির বিরাট শব্দ, হে একাষ্টকা, তোমার করুণায় আমরা হব সুসন্তানের জনক—বীর্য্য হবে আমাদের অপরাজেয়; আমরা হব ধনপতি, মর্ত্ত্য এবং অমর্ত্ত্য সম্পদে সম্পন্ন।

আমাদের পূজাভূমি ঘৃতসিক্ত—চারিদিকে বেয়ে পড়ছে ঘৃতধারা সর্পিল রেখায়, হে জাতবেদা অগ্নি, আমাদের হবিগ্রহণে আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

তোমার কৃপায় আমাদের আসুক সমৃদ্ধি—পালিত যত গ্রাম্য পশু সব আমাদের প্রতি প্রীত হয়ে কল্যাণ বিধান করুক।

হে রাত্রি, তুমি এস পুষ্টির তরে. এস আমার পরিপোষণে, ধনে পুত্রে সমৃদ্ধির চরম শিখরে নিতি দেবতাগণের সুমতি আমাদের প্রতি বর্ষিত হোক।

হে হোমসাধনভূতা দর্ব্বী! তুমি পূর্ণ হয়ে আগমন কর, সুপূর্ণ হয়ে পুনরায় গমন কর। সকল যজ্ঞকে তুমি পরিপালনে প্রীত করে' আমাদের জন্য নিয়ে এস পরমান্ন, নিয়ে এস দেববীর্য্য—আহরণ কর অন্ন এবং ওজস্বিতা।

হে একাষ্টকা, তোমার পতি সংবৎসর চলে এসেছে।

নববর্ষ আনুক আয়ুদীপ্ত সন্ততি ও প্রজ্ঞা, আমাদের গৃহকে করুক ধনধান্যে সমৃদ্ধ, অন্তরকে করুক পরম চৈতন্যে উদ্বোধিত।

ঋতুর অর্চ্চনা কর। পূজা কর ঋতুপতির, উপাসনা কর ঋতুর যত অঙ্গকে, যজনা কর বৎসরকে।

ভূতপতি যিনি, সর্ব্বলোক-মহেশ্বর তার চরণেই নিবেদন করি মাস, ষণ্মাস এবং বৎসর। পূজার অঞ্জলিতে সমৃদ্ধ হোক সমস্ত কালের যাত্রাপথ।

হে ধাতা, হে বিধাতা, হে শ্রীপতি, হে লোক-মহেশ্বর, তোমার চরণে উৎসর্গ করি বসন্তাদি ঋতু, বৈশাখাদি মাস এবং সংবৎসর।

তোমায় দেই ইড়া, তোমায় দেব আজ্যভাগ। হে হৃদয়-দেবতা, আমরা যেন সম্পূর্ণ হয়ে জ্ঞানের আলোয় আমাদের ক্ষুদ্র গৃহকে আলোকিত করি, আমার যেন গোমান্ হয়ে ঋদ্ধ হই।

মাঘী কৃষ্ণাষ্টমী! পুণ্যতিথি তুমি, তোমার তপস্যার প্রদীপ্ত তেজে ইন্দ্রের জন্ম হয়েছে। মহিমাময় শতক্রতু ইন্দ্র দেবশত্রুগণকে হনন করেছেন, দস্যুগণকে পরাজয় করেছেন—শেষে তিনি শচীপতি হয়েছিলেন। সেই কর্ম্মকৃৎ কর্ম্মপতি দেবতার অনুধ্যান করি।

হে একাষ্টকা রাত্রি, চন্দ্রমার দ্যুঃতি তোমারই কক্ষে বিচ্ছুরিত হয়, তাইত সোমের তুমি মাতা। তুমি ইন্দ্র-জননী, প্রজাপতির তুমি দুহিতা। তুমি আমাদের আরাধনা গ্রহণ কর—আমাদের সমস্ত কামনা পূর্ণ কর।

অথর্ব্ববেদের ৭৬০টি সূক্ত নানা বৈচিত্র্যে সুশোভিত, নানা রসে রসময়, নানাভাবে পরিপূর্ণ। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। ধ্বনি-শিল্পের যাদুতে সমস্ত সূক্তগুলি অপূর্ব্ব, আঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যে, ভাবের সরসতায়, দৃষ্টিভঙ্গীর নূতনত্বে, এই সুন্দর সূক্তগুলিকে বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পৎ বলিতে হয়।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইহার অভিব্যঞ্জনা হৃদয়ঙ্গম করিলে, ইহাদিগকে আমরা দিব্য জীবনের ছন্দে ছন্দিত কাব্য বলিয়া অভিনন্দন করিব।

কেবল মারণ উচাটন বশীকরণ মন্ত্র বলিয়া গণ্য করিলে, আমরা একান্তভাবে রসানুভবের এবং সৌন্দর্য্যবোধের সুখস্বর্গ হইতে অন্ধতমিস্রায় পতিত হইব।

আর একটি মাত্র মন্ত্র তুলিব :—

বেনস্তৎ পশ্যৎ পরমং গুহা যদ্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকরূপম্।
ইদং পৃশ্নিরদুহজ্জায়মানাঃ স্বর্বিদো অভ্যনূষত ব্রাঃ ॥১
প্র তদ্ বোচেদ্ অমৃতস্য বিদ্বান্ গন্ধর্ব্বো ধাম পরমং গুহা যৎ।
ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য যস্তানি বেদ স পিতুষ্পিতা সৎ ॥২
স নঃ পিতা জনিতা স উত বন্ধুর্ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধ এক এব তং সং প্রশ্নং ভুবনা যন্তি সর্ব্বা ॥৩
পরি দ্যাবাপৃথিবী সদ্য আয়মুপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য।
বাচমিব বক্তরি ভুবনেষ্ঠা ধাস্যুরেষ নম্বেহষো অগ্নিঃ ॥৪
পরি বিশ্বা ভুবনান্যায়মৃতস্য তন্তুং বিততং দৃশে কম্।
যত্র দেবা অমৃতমানশানাঃ সমানে যোনাবধ্যৈ রয়ন্ত ॥৫

আকাশে আদিত্য রশ্মিমালায় ভাস্বর হয়ে সেই পরম রহস্যের গুহা দর্শন করেন, যেখানে জগতের সমস্ত বৈচিত্র্য নিঃশেষ হয়ে যায় একরূপে, যেখানে বিশ্ব একেরই নৃত্য ছন্দ বলে অনুভূত হয়।

সেই অব্যাকৃত পরম ব্রহ্মের অব্যক্ত তত্ত্ব হতে ভূতভৌতিক প্রপঞ্চজাত এই বিশ্ব দোহন করে আনেন আদিত্য, স্বর্বিদ জ্ঞানী যারা, তারা তাই আদিত্যকে সংবর্দ্ধনা করেন। বেদবাণী যার কণ্ঠে, সেই গন্ধর্ব্ব আদিত্য অমৃত ব্রহ্মকে জেনে আমাদের জানান পুনরাবৃত্তি-রহিত সেই পরম ধামকে—সেই পরম ধামের তিন ভাগই রয়েছে রহস্যের আড়ালে

লুকিয়ে। এই অধ্যাত্ম বিদ্যা যিনি জানেন তিনি আমাদের পিতার পিতা। নিষ্কল ব্রহ্মজ্ঞান যার, তিনি সর্ব্বপূজ্য।

তিনিই পিতা, তিনিই জনিতা, তিনিই পরম বন্ধু; বিশ্ব-ভুবনের সকল ধামকে তিনি জানেন। ইন্দ্র, শিব, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ সেই পরমাত্মারই নামধা; সেই একেরই বিভূতি দেবগণ; যারা এই পরম তত্ত্ব জানেন, তারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন।

ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের সাথে সাথে দ্যাবাপৃথিবীর সকল জ্ঞান পেয়েছি, ঋতের প্রথমজ পুত্রকে জেনেছি—জেনেছি আমি আর সেই ব্রহ্ম অভিন্ন। এই পরব্রহ্ম বৈশ্বানর অগ্নি—বাক্য যেমন বক্তায় থাকে, তেমনই তিনি ভুবনের মাঝে আছেন—শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে তিনি প্রতি পুরুষে থাকেন প্রচ্ছন্ন—পরে প্রকাশ হয়ে ভুবনে আর পোষকরূপে বর্ত্তমান থাকেন।

ঋত ব্রহ্মের তন্তুবৎ ব্যস্ত স্বরূপ দেখবার জন্য বিশ্বলোককে প্রাপ্ত হয়েছি, অমৃতভোজী দেবতারা যেখানে নিরতিশয় আনন্দে অবস্থান করেন, সেই যোনিস্বরূপ পরম ব্রহ্মের উপলব্ধির জন্য আমি চির-যাত্রী।

অথর্ব্ববেদ মানুষের হৃদয়ে জাগাতে চেয়েছে তার স্বাধিকারের স্বপ্ন, তার চেতনায় ফুটাতে চেয়েছে লোকোত্তর বীর্য্য, তার কৃতিকে করতে চেয়েছে দিব্য ক্রতুর জ্যোতিতে দীপ্ত। দ্যুলোক হতে পার্থিব জীবনে আনতে চেয়েছে অমৃতের স্পন্দন।

মানুষকে অবিদ্যার মোহজাল ছিন্ন করে চলতে হবে আশায় ও উৎসাহে। ক্লৈব্য তার নয়, জাড্য তার নয়, সে যে অমৃতের সন্তান। তার কাছে আসে নিত্য আহ্বান, কোন অজানিত শক্তি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, ঘরে বসে থাকা তার চলবে না—তাকে চলতে হবে—'শুধু চলা শুধু চলা—দিক হতে দিগন্তরে

নব নব বাণীর সন্ধানে।'

আর সেই প্রৈতির মাঝেই জাগবে তার জাগরণের নিত্যনব-সম্ভাবনাময় আনন্দ-দ্যুতি।

এই ব্রহ্ম-জীবনের পিতৃযান আমাদের ডাকছে—এই তপস্যার ঝলকে ঝলকিত দেবগণের পথ আমাদের ডাকছে। ছায়াতলে ঢাকা জীবনের যবনিকাকে তুলতে হবে আজ—সুরু করতে হবে আনন্দলীলানাট্য।

এ যে যাত্রা—চিরযাত্রা—পর্ব্বে পর্ব্বে নেমে আসে বিপুলতর জ্যোতি, ফুটে ওঠে মধুরতর ছন্দ। সেই ঋতলোকের অভিযাত্রীর দল চলবে অভিযানে—তাদের পথের অন্তরায় যত খসবে—যত বাধা শেষ হবে।

তাদের পাথেয় জ্ঞানের প্রভায় ভাস্বর এই বিত্তাভাণ্ডার অথর্ব্ববেদ। এই অথর্ব্বের আলোশিখায় তাদের জীবনে আসবে অখণ্ডসত্তার সত্য-জ্যোতি—তাদের জন্য হিরণ্যপাণি সবিতা বয়ে আনছেন শান্তি, নিবৃত্তি ও অমৃত।

বেদ ও অবেস্তা

মুণ্ডকোপনিষদে নিম্নের মন্ত্র দুইটি আছে :—

ওঁ ব্রহ্ম দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাম
অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ ॥ ১
অথর্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাহ্
থর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাম্।
স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ
ভারদ্বাজোহঙ্গিরসে পরাবরাম্ ॥

ইহাতে গুরুপরম্পরা পাই ব্রহ্মা, অথর্ব্বা, অঙ্গির, সত্যবহ, অঙ্গিরস। অথর্ব্ববেদের নাম সায়ণ ভূমিকায় এবং অন্যত্র অথর্ব্বাঙ্গিরস এবং ভৃগ্বঙ্গিরস দেওয়া আছে। ইহা হইতে অনুমান হয়, অথর্ব্ববেদের দুইটি ভাগ ছিল—একটি অথর্ব্বার রচিত, অন্যটি অঙ্গিরসের রচিত। ভৃগু অথর্ব্বার নামান্তর বলিয়াই ধরিতে হইবে।

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় তাহার গাথার আলোচনায় অবেস্তাকে এই লুপ্ত ভৃগুবিদ্যা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন, অবেস্তা কথাটি বেদের অন্যতম নাম উপস্থা এবং অবেস্তা ভার্গব উপস্থা। তাহার এই মত সমীচীন বলিয়াই মনে হয়।

পৌরাণিক গল্প হইতে আমরা জানি, কাব্য উশনস শুক্র বা ভৃগু দৈত্যগুরু এবং বৃহস্পতি দেবগুরু। বৃহস্পতি অঙ্গিরস বংশীয়।

দেবাসুর সংঘর্ষের সময়ে দেবতারা বৃহস্পতিকে গুরু বরণ করিলেন এবং অসুরেরা শুক্রকে গুরু করিলেন। মহাভারতের আদি পর্ব্বে পাই :—

সুরানাং অসুরানাং চ সমজায়ত বৈ মিথঃ
ঐশ্বর্য্যং প্রতিসংঘর্ষং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥
জিগীষয়া ততো দেবাঃ বব্রিরে অঙ্গিরসং মুনিম্।
পৌরহিত্যেন যাজ্যার্থে কাব্যং তু উশনসঃ পরে ॥ ৭৬-৫-৬

এই বিবাদ যতই বাড়িতে লাগিল, ততই নানাদিকে বিভিন্নতা সৃষ্টি হইল ; এমন কি পৃথক্‌বিধ মন্ত্রে অর্চ্চনা আরম্ভ হইল।

ভৃগুভিঃ চাঙ্গিরোভিশ্চ হুতং মন্ত্রৈঃ পৃথগ্বিধম্। বনপর্ব্ব ২২৩-১৪

আমাদের ইরাণীয় পিতামহগণ যে পৃথক মন্ত্রে উপাসনা করিতেন, সেই মন্ত্রসকল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তবে অবেস্তার গাথার মধ্যে তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

অবেস্তার একুশটি ভাগ ছিল। তাহার অনেক ভাগই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই ভাগকে নস্ক বলা হইত। এখন যে অবেস্তা প্রচলিত তাহাতে ভেন্দিদাদ, বিশপরেদ, যশ্ন, খোরদ অবেস্তা এই চারিখানি পুস্তক আছে। জেন্দ ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য বিচার করিলে, উভয়কে একই আদি ভাষার শাখা বলিয়া মনে হইবে। বেদ ও অবেস্তার তুলনামূলক সমালোচনা করিলে মনে হইবে যে, একই ভাব-ধারায় পরিপুষ্ট একই জাতির মধ্যে বিরোধের ফলে এই বিভাগ সৃষ্টি হইয়াছে।

কাজেই বেদ বুঝিতে হইলে অবেস্তা পাঠ আবশ্যক এবং অবেস্তা বুঝিতে হইলে বেদ পাঠ আবশ্যক। ইহা কেবল আমার কথা নহে। অবেস্তা-বিদ্যায় পারদর্শী মিলস্ মহাশয়ের কথা তুলিতেছি :—

"Questions indeed arise and must for ever remain unsettled as to how far the different literatures were divided as to time; but no one with any capacity whatsoever to read the evidence can well fail to recognise the identities, as they so unmistakably reveal themselves before our eyes. Veda is Avesta in many a fundamental trait, and Avesta is Veda. Each however has its strongly marked idiosyncracies as a subdivision of the whole. The Veda possesses enormously the greater bulk, and in the richness of its very numerous sections and subsections, it surpasses Avesta amid a thousand forms of beauty and exactness, while the Iranians lead the Indians and in fact all ancient folk beside them in the elevation of their moral and religious tone."

আর্য্য ও ইরাণীয় সভ্যতার কীর্ত্তিস্তম্ভ বেদ ও অবেস্তা তাই যুগপৎ হিন্দু ও পারসিকগণের আদরণীয়। পারসিকগণ তাহাদিগের পরম দেবতার নাম দিয়াছেন অহুর মজদা। অহুর কথাটি অসুর কথার অপভ্রংশ। মজদাকে অনেকে সংস্কৃত মেধা কথার অপভ্রংশ মনে করেন। তাহাদের মতে অহুর মজদার অর্থ মেধাবী অসুর।

ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলে এই মন্ত্রটি আছে—

যে হরী মেধয়োক্‌থা মদন্তঃ।
ইন্দ্রায় চক্রুঃ সযুজায় অশ্বঃ। ৩৩-১০

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইহা হইতে হরিমেধা নামটি উদ্ধার করিয়া তাহাই অহুর মজদার নাম বলিতে চাহেন। ইহা মূলের অর্থানুযায়ী নহে। কাজেই অহুর মজদা অসুর মেধা এই রূপান্তর স্বীকার করা চলে না।

কলিরাম কশ্যপ বলেন, মহদ্ কথা হইতে মজ্দা হইয়াছে। তাহার মত যুক্তিপূর্ণ এবং আমারও মনে হয় অহুর মজদা অসুর মহৎ কথাটির পরিণতি।

বেদে এই মহৎ অসুরের স্তুতি আছে।

ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলে অত্রি ঋষির একটী মন্ত্র আছে :—

তমু ষ্টুহি বঃ স্বিষু সুধন্বা যো বিশ্বস্য ক্ষয়তি ভেষজস্য।

যক্ষ্বামহে সৌমনসায় রুদ্রং নমোভির্দেবমসুরং দুবস্য ॥ ৪২-১১

সুধন্বা শিব যিনি তাঁহার স্তব কর, যিনি সর্ব্বভেষজের অধিপতি, সেই রুদ্রদেবের মহাপ্রসাদ যাচ্ঞা করিয়া তাহার যজন কর, সেই অসুর-দেবকে নমস্কার। এখানে রুদ্রকে অসুর বলা হইয়াছে। এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রে বরুণকে অসুর নামে স্তব করা হইয়াছে।

যজুর্ব্বেদের ২৭ অধ্যায়ে পাই :—

তনূনপাদসুরো বিশ্ববেদা দেবো দেবেষু দেবঃ।

পথো অনেক্তু মধ্বা ঘৃতেন। ২৭—১২

অগ্নি, যিনি তনূনপাৎ, যিনি অসুর, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, যিনি দীপ্তিমান দেবদেব, তিনি মধুযুক্ত ঘৃতের দ্বারা যজ্ঞকে সংবর্দ্ধিত করুন।

অথর্ব্ববেদে আছে—

অয়ং দেবানামসুরো বিরাজতি। ১-১০-১

এই অসুর দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

মন্ত্র ব্রাহ্মণে "অহুর" কথাটিরও ব্যবহার দেখা যায়।

পৌরাণিক যুগে দেবাসুরের দ্বন্দ্বে অসুর বলিতে আমরা দৈত্য বুঝি, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে অসুর বলিতে প্রাণবান ও ধনবান দেবতাদিগকে বুঝাইত।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে "মহৎ" কথাটি নাম হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। বামদেব্য ঋষি বলিতেছেন :—

মহত্তনাম গুহ্যং পুরুস্পৃগ্যোন ভূতং জনয়ো যেন ভব্যম্।

প্রত্নং জাতং জ্যোতির্যদস্য প্রিয়ং প্রিয়াঃ সমবিশন্ত পঞ্চ ॥ ১০-৫৫-২

সেই গুহ্য ও সর্ব্বাতিশায়ী নাম, যাহার বলে তুমি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সকল সৃষ্টি করিতেছ, তোমরা প্রিয় পঞ্চ জাতি তোমার প্রিয় পূর্ব্বজাত জ্যোতির্মণ্ডলে সমাবিষ্ট হইয়াছে। এখানে পরমদেবতার গুহ্য নামকে "মহৎ" বলা হইল।

তৃতীয় মণ্ডলে পাই :—

মহত্তদ্বঃ কবয়শ্চারু নাম যদ্ধ দেবা ভবথ বিশ্ব ইন্দ্রে।

সখ ঋভুভিঃ পুরুহূত প্রিয়েভিরিমাং ধিয়ং সাতয়ে তক্ষতা নঃ॥ ৩-৫৪-১৭

হে বিশ্বদেবগণ, হে জ্ঞানী কবিগণ, তোমাদের চারু নাম মহৎ, তোমরা সকলে ইন্দ্রের মাঝে বর্ত্তমান, হে সখাগণ ঋভুগণসহ তোমাদিগকে আমরা বহুবার অভিনন্দন করি, আমাদিগের কল্যাণের জন্য এই বাণীকে তোমার প্রবৃদ্ধ কর।

নিরুক্তকার যাস্কও ব্রহ্মের নামান্তর-রূপে "মহৎ এবং মহঃ" পদ দুইটি অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

ইহা হইতে নিঃসন্দেহ হইতে পারি যে, মহৎ অসুর এই নাম হইতে পরিবর্ত্তিত ভাষায় অহুর মজদা নাম অবেস্তায় গৃহীত হইয়াছে।

পিতামহ জরথুস্ত্রের সহিত আমাদিগের বৈদিক পিতামহগণের তফাৎ এই যে, জরথুস্ত্র নানা দেবগণের অসুরত্বের মাঝে যে একের প্রকাশ, যে একে সদ্বিপ্রগণ বহুনামে অভিহিত করেন, সেই অদ্বিতীয় ও এককে বরণ করিয়াছেন, আর বৈদিক আর্য্যেরা একের নানা বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়াছেন।

জরথুস্ত্র তাহার ধর্ম্মমত অমেষ স্পেন্তার ব্যূহের চারিদিকে স্থাপিত করিয়াছেন। এই সপ্তব্যূহের সহিত বৈদিক ধর্ম্মমতের অনেক সাদৃশ্য আছে।

অথর্ব্ববেদের প্রথম মন্ত্রটি এই :—

ওঁ যে ত্রিষপ্তা পরিযন্তি বিশ্বরূপাণি বিভ্রতঃ
বাচস্পতির্বলাং তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে ॥ ১
পুনরেহি বাচস্পতি দেবেন মনসা সহ
বসোস্পতে নিরময় মষ্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতং ॥ ২

এখানে ত্রিসপ্ত দেবতার কথা বলা হইয়াছে। ভার্গব উপস্থায় আমরা এক অমৃত সপ্তকের সন্ধান পাইতেছি। অমেষ স্পেন্তা অমৃত-সপ্তক। জরথুস্ত্রের মতে তাহারা অহুর মজদা, বহুমন, আশা বশিষ্ট, ক্ষত্র বীর্য্য, স্পেন্তা অরমিতি, হৌর্বতাত, অমৃতত্ত। সংস্কৃত ভাষান্তর করিলে এই সপ্ত দেবতার যে রূপ আমরা পাই, তাহা যথাক্রমে অসুর মহৎ, বসুমন, আশা বশিষ্ঠ, ক্ষত্রবীর্য্য, অরমতি, সর্ব্বতাতি এবং অমৃতত্ব।

দেবতাদিগের একটি নাম যজত্রা। অবেস্তায় যজনীয়গণকে যজত বলা হইয়াছে। যজতগণের মধ্যে অমৃত-সপ্তক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জরথুস্ত্র যে ধর্ম্ম, ন্যায় ও নীতির রাজ্য দেখিতে পাইয়াছেন, তাহা এই অমৃত-সপ্তকের দ্বারা রক্ষিত।

ইহাদের মধ্যে বহুমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি মহৎ অসুরের মহৎ প্রজ্ঞা। বহুমন সংস্কৃত বসুমনের রূপান্তর। ইহা ব্রহ্ম কথাটির রূপান্তরও হইতে পারে। বৈদিক ব্রহ্মবাদের সঙ্গে ভার্গব ব্রহ্মবাদের ঐক্য ছিল, একথা যখন আমরা স্মরণ করি, তখন ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুযায়ী ব্রহ্ম হইতে বহুমনের রূপান্তর স্বীকার করিতে আমাদের দ্বিধা থাকে না।

আশা বশিষ্ঠ ঋতপন্থা। বৈদিক ঋষিরা বিশ্বের অন্তরালে যে ঋতের লীলা দেখিয়াছেন—দেবতারা যে ঋতের গোপ্তা, জরথুস্ত্র তাহাকেই আশা নাম দিয়াছেন। ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন ঋত হইতেই শব্দ-পরিবর্ত্তনের নিয়মানুসারে আশা কথা রূপ নিয়াছে। অবেস্তা বলেন—একটি পন্থাই আছে সে পন্থা আশার, অন্য পথ সব অপথ।

আশা বসিষ্ঠ সেই ভাগবত পন্থা, যাহার সহায়তায় মানুষ দিব্য জীবন লাভ করে। তাই জরথুস্ত্র স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে আশা বশিষ্ঠের জয়গান করিতে বসিয়াছেন। যাহারা সত্যের এই নির্ম্মল রূপ ধ্যান করেন তাহারাই জীবনে সার্থকতা ও সিদ্ধি লাভ করেন। আশা বশিষ্ঠ দেবশক্তি ও দেববীর্য্য। জরথুস্ত্র মানুষকে তাহার মর্ত্ত্য চেতনায় এই অমৃতশক্তি উপলব্ধি করিয়া কর্ত্তব্যের পথে অটল ক্ষত্রবীর্য্যে চলিতে উপদেশ দিয়াছেন।

প্রজ্ঞা ও সত্যকে আশ্রয় করিয়া ভাগবতরস-পিপাসু ভক্ত জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন না, তাহার চাই অমোঘ শক্তি, অভয় বীর্য্য। বলহীন আত্মাকে লাভ করে না। অকুতোভয় হইয়া সত্যকে পালন ও গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্য অমৃত-সপ্তকের অন্যতমকে ক্ষত্রবীর্য্য বলা হইয়াছে। তিনি মানুষের ভাগবত সাম্রাজ্য অধিকারের পরম সহায়ক।

অরমতি বৈদিক দেবতা পৃথিবী। সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার মূর্ত্তি ধরিত্রী মানুষকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা শিক্ষা দেন। এইভাবে ধর্ম্মজীবন যাপন করিলে মানুষ দুইটি পরা সম্পৎ লাভ করে—তাহা সর্ব্বতাতি এবং অমৃতত্ব। সর্ব্বতাতি সর্ব্বব্যাপক সম্পৎ—মানুষকে ইহকালে এবং পরকালে দেয় পরম ধন ও সম্পৎ।

ধর্ম্মজীবনের শেষ পরিণতি অমৃতত্বে। পুণ্যপথে চলিয়া পুণ্যকর্ম্মে লিপ্ত

থাকিয়া মানুষ পৃথিবীতেই অমৃত সৌন্দর্য্য ও বীর্য্য প্রাপ্ত হয়। আনন্দের উল্লাসে তাহার জীবন উল্লসিত হয়—পরিতৃপ্তির ছন্দে ছন্দিত হয়।

এই ধর্ম্মজীবনের যাত্রার তিনটি সহজ সোপান জরথুস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। রহস্যজালে ইহা আবৃত নহে—ইহা অতি সরল অথচ অতি পবিত্র। তাহাদের নাম অবেস্তার ভাষায় হুমত, হুক্ত, হ্বর্ষ্ট—সংস্কৃত করিলে পাইব সুমত, সূক্ত এবং সুকার্য্য। জীবনে আমরা চাই স্বস্তি—চাই শান্তির আবহাওয়া। ইহার জন্য অতি গভীর অতিগহন কোনও সাধনার কথা জরথুস্ত্র বলেন নাই। তিনি মানুষকে বলিলেন—সুচিন্তা কর। পুষ্প-সৌরভের মত সুচিন্তা আপন প্রভাব চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়, সেই চিন্তাকে ফলবতী করে শোভন বাক্য, তাই আমাদের উক্তি যেন সকল সময় শোভন হয়। কিন্তু কেবল চিন্তা ও বাক্য সুন্দর হইলেই হইবে না, চাই তাহার প্রয়োগ। সুকার্য্য করিয়াই শান্তি লাভ করিতে পারিব। কর্ম্মের মাঝেই বিধাতার পূজা ও সেবা সাধিত হয়।

অবেস্তা মানুষের ধর্ম্মজীবনকে "কায়েন মনসা বাচা" মধুময় ও সত্যময় করিবার আদেশ দিয়াছেন। সে মধুরতা শুধু স্বপ্ন-বিলাসিতা নয়, তাহ বাস্তবের পুষ্পফলে সমৃদ্ধ হউক, ইহাও বিধান করিতে তিনি ভোলেন নাই।

বেদ ও অবেস্তার ভাষা, ছন্দ ও গাঁথুনির ঐক্য যতই আলোচনা করি, ততই ইরাণীয় পিতামহগণকে একান্ত আত্মীয় অনুভব করি। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ অবেস্তার একটি মন্ত্রের সংস্কৃত ভাষান্তর দেওয়া যাইতেছে।

ইথা আত্ যজমইদে অহুরম্ মজদাম্ য গাঁমচা অধমচা দাত্।
অপশ্চা দাত্ উর্বরাআস্বা বঙুহীশ রওচাওয়োস্বা দাত্ বূমীম্চা বীস্পা চা বোহু ॥

ইহার সংস্কৃত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়—

ইথা অত্র যজামহে অসুরং মহান্তম্ যঃ গাম্ চ ইযম্ চ অদাৎ।
অপশ্চ অদাৎ উর্ব্বরেয়াশ্চ বস্বীহ (চ) রুচশ্চ অদাৎ ভূমিম চ বিশ্বা
চ বসুনি॥

এখানে এইভাবে মহৎ অসুরকে যজন করিব, যিনি দিয়াছেন গোধন এবং শস্য, যিনি অপ্ এবং বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি আকাশের আলো সৃষ্টি করিয়াছেন, নানা ধনসম্পৎ-পূর্ণ ভূমি সৃষ্টি করিয়াছেন।

জরথুস্ত্রের ধর্ম্ম বৈরাগ্যের ধর্ম্ম নহে। তিনি মানুষকে পলায়নের মনোবৃত্তি শিখান নাই। কবিগুরুর মত তিনিও বলেন :—

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাহি।

জীবনের এই জয়গান, পৃথিবীর সম্পৎকে সম্ভোগের আহ্বান অথচ ব্রহ্মজীবন যাপন, ইহা যেমন অবেস্তার বাণী তেমনই বেদেরও বাণী।

অথর্ব্ববাদে মন্ত্র আছে—

পশ্যেম শরদঃ শতম জীবেম শরদঃ শতম্।
পুষেম শরদঃ শতম রোহেম শরদঃ শতম্॥
বুধ্যেম শরদঃ শতম ভবেম শরদঃ শতম্।
ভূয়েম শরদঃ শতম ভূয়সী শরদঃ শতাৎ॥

দেববীর্য্য ও তপঃশক্তি নিয়া বৈদিক ঋষি শত বর্ষ পৃথিবীর শোভা ও সৌন্দর্য্য দেখিবেন, শত বৎসর বাঁচিবার মত বাঁচিবেন। একশত বৎসর তিনি নিত্য নূতন নবীনতায় ও শ্রীবৃদ্ধিতে পরিপুষ্টি লাভ করিবেন। লতার মত জীবন আনন্দ-শক্তিতে নিত্য নব নব দিকে বিস্তৃতি লাভ করিবে। বোধশক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিলাভ করিতে—পুত্রকলত্রে জীবন সমুজ্জ্বল ও দীর্ঘ হইবে। শুধু একশত শরৎ নয়, তাহার অধিকও তিনি বাঁচিবেন।

ভারতবর্ষ ভণ্ড বৈরাগ্যের বাণী নিয়া জীবনকে ব্যর্থ ও মলিন করিয়া তুলিয়াছে, তাই বেদ ও অবেস্তার এই পরিপূর্ণ জীবনবাদ আমাদিগের প্রতিদিন স্মরণ, মনন ও ধ্যান করা কর্ত্তব্য।

জরথুস্ত্র পৃথিবীতে নিত্য প্রবহমান সংঘর্ষকে বিধাতার দুইটি শক্তির বিরোধরূপে বলিয়াছেন স্পেন্তামইন্যু এবং অঙ্গ্রমইন্যু অর্থাৎ শিবতম মন্যু এবং অঙ্গ্রমন্যু। যাহারা চিন্তাশীল, তাঁহারা সংসারে দেখেন আলোছায়ার মত সত্যামৃত, প্রেম ও হিংসা, ন্যায় ও অন্যায় যুগপৎ বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রেয় ও প্রেয়ের এই দ্বন্দে মানুষকে শ্রেয়ের পথ, সত্যের ও কল্যাণের মার্গ গ্রহণ করিতে হইবে। জরথুস্ত্রের এই মতবাদ অহুনাবতী গাথায় তৃতীয় অধ্যায়ে আছে। নিম্নে তাহার একটী স্বচ্ছন্দ অনুবাদ দিতেছি :—

বলব এখন তারস্বরে শুশ্রূষু সব ভক্তজনে
জ্ঞানীর লাগি মহৎ অসুর বিধান করেন বিধি,
বলব দুয়ের কথা গোপন।
স্তুতি কর মহৎ তাঁরে ভক্তিনত-মনে
ব্রহ্মমনের, ঋতপথের রহস্য সব নিধি
জানি সুখে হওহে শোভন।

কর্ণে শোন মন্ত্র গভীর, মহত্তম বাণী,
গোপন মনের গোপনতায় লভ সত্যদৃষ্টি,
শ্রেয়ে যাহে করবে বরণ।
জনে জনে আপন মনে নেবে ঠিকই জানি
ঋতের প্লাবন আসুক নামি করুক সুধাবৃষ্টি
মোদের আশা করুক পূরণ।

শক্তি দুটি চিরন্তনী কর্ম্মে এবং ভাবে
প্রকাশ করে আপনারে নিত্য জগৎ-মাঝে,
স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলাচ্ছলে।
শ্রেয়ে বরি জ্ঞানী জনে শান্তি সদাই পাবে
সকল কথায়, সকল ভাবে, সকল তাহার কাজে
বরবে প্রেয়ে দুষ্ট দলে।

ঐশী শক্তি দুটি যখন মিলল সৃজন-লীলায়
কোন অনাদি যুগে প্রথম, গড়ল তারা তখন
জীবন এবং মরণ দুটি।
দ্বৈতদেবের এই যে লীলা জগৎ-মাঝে বিলায়
অজ্ঞানী নেয় মরণটাকে, অসত্য তার কারণ,
জ্ঞানী চলে জীবন লুটি'।

শ্রেয়ের প্রেয়ের এই বিরোধে, ব্রহ্মবাদী যারা
ঋতের পথে আশার সুরে করল গমন তারা,
ডুবল পাপী তিমির মাঝে।
আলোর মহৎ পারাবারে হয়ে আত্মহারা
মহৎ অসুর পূজবে যারা, দেবে বসুধারা,
লাগুক তারা মহৎ কাজে।

প্রেয়ের পন্থা মানল যারা, ক্ষণিক সুখের লাগি,
ভ্রান্তি এবং সংশয়েতে ডুবল তারা মোহে,
চলল তারা বিপথ পানে।

তাদের সাথে মিলল আসি যতেক অনুরাগী
মিলল তারা বঞ্চনাতে. মিলল তারা দ্রোহে,
ভরল পাপে সকল থানে।

জরথুস্ত্রের এই দ্বৈত তত্ত্বকে অনেকে ভুল বোঝেন। পাপের শক্তি শাশ্বত নয়, অন্তিমে সত্যের বিজয় হইবে। পাপ ও পুণ্যের চিরন্তন সংঘর্ষের মধ্য দিয়া জগৎ আপন ঋতের পথ বহিয়া চলিয়াছে। পরম অসুরের প্রতিদ্বন্দ্বী কেহ নাই—তিনি সর্ব্বোত্তম, পুরুষোত্তম, তাহারই এই দুই শক্তি।

উপরে উদ্ধৃত জরথুস্ত্রের গাথার সহিত কাঠোপনিষদের মন্ত্রগুলির তুলনা করা যায়:

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভাতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥
শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

শ্রেয় প্রেয় হইতে বিভিন্ন। ইহারা দুইটিই পুরুষকে নানাভাবে আবদ্ধ করে। উভয়ের মধ্যে যিনি শ্রেয়কে গ্রহণ করেন, তাহার কল্যাণ হয়; আর যিনি প্রেয়কে বরণ করেন, তিনি পরমার্থকে হারান। শ্রেয় ও প্রেয় সম্মিলিতভাবে মানুষকে আশ্রয় করে। ধীর ও বিচক্ষণ তাহাকে সম্যক পরীক্ষা করিয়া নেন। জ্ঞানী প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয় উৎকৃষ্ট জানিয়া

শ্রেয়ের শরণ নেন, কিন্তু অল্পবুদ্ধি মন্দ ব্যক্তি যোগক্ষেম না লইয়া প্রেয়কেই আশ্রয় করেন।

গাথা ও উপনিষদের এই তুলনামূলক সমালোচনা করিলে, আমরা বুঝিতে পারি, জরথুস্ত্রের দ্বৈতবাদ ভারতীয় সাধনার রূপান্তরমাত্র।

মিলস্ অবেস্তার সৌন্দর্য্য ও ভাবগভীরতা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, প্রত্যেক সমদর্শী সত্যদ্রষ্টা ব্যক্তির তাহা অনুধাবনযোগ্য।

"If the mental illumination and spiritual elevation of many millions of mankind, throughout long periods of time, are of any importance, it would require strong proofs to deny that Zarathustrianism has had an influence of very positive power in determining the gravest results. That man should be taught to look within rather than without, to believe that suffering and sin do not originate from the capricious power of a Diety still called 'good' that the 'good thought, word, and deed' should be recognised as essential to all sanctity, even in the presence of a superstitious ceremonial, that judgment should be expected according to deeds done in the body, and the soul consigned to a Heaven of virtue or to a Hell of vice, its recompense being pronounced by the happy or stricken conscience —these can never be regarded by serious historians as matters of little moment, and if, on the contrary, they are allowed to be matters of great moment, the Zend-Avesta should be revered and studied by all who value the records of the human race."

বেদ ও অবেস্তা মানবজাতির প্রাচীনতম পরিচয়গ্রন্থ। শ্রদ্ধায় ও যত্নে ইহাদিগকে অধ্যয়ন করিলে আমার অতীতের অনেক কিছুর সন্ধান পাইব। ভারতীয়েরা যেমন বেদকে ভক্তি করেন, তেমন ভাবেই

অবেস্তাকে যেন গ্রহণ করেন। বেদ ও অবেস্তা অতীতের বস্তু, বর্ত্তমানের বিজ্ঞানের যুগে তাহাদের কোনও উপকারিতা নাই, ইহা যাহারা বলেন, তাহারা ভুল করেন। শ্রীঅরবিন্দ ঠিকই বলিয়াছেন, মানুষের চরমতম ও পরমতম সত্য অতীতে যাহা ছিল, আজও তাহা আছে। বরং অতীতে যেদিন জীবনে এত ঝঞ্ঝাট ছিল না, তখন আমরা পরমতম রহস্যোপলব্ধির বৃহত্তর সুযোগ ও সুবিধা পাইতাম।

পারসীকেরা প্রত্যেক প্রার্থনার আগে সাধারণতঃ, বলেন, ক্ষ্নাওথ্রা অহুরা মজদাও—পরম অসুর পরিতৃপ্তি লাভ করুন। ইহা আমাদের শাস্ত্রের চরমতম কথা। গীতায় 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' মন্ত্রে যে শরণাগতি ও ভক্তির নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে, জরথুস্ত্রও তাহার গাথায় অনুরূপ মৈত্রী ও প্রপত্তির কথা বলিয়াছেন।

স্বাধীন ভারতে ভারত-ভারতীর নব অভ্যুদয় কামনা করি। তাহার যে অমেয় প্রভাব, তাহা নিশ্চয়ই দেশদেশান্তরে প্রভাব বিস্তার করিবে। সেই বিজয়াভিযানে ভারতকে প্রথমেই ইরাণের সহিত মিতালি করিতে হইবে। যদি আমরা ইরাণের সহিত, ইরাণীয় ভাষার সহিত আমাদের জ্ঞাতিত্ব অনুভব করি, তাহা হইলে সে মৈত্রী সরল ও সহজ হইবে।

অখিল ধর্ম্মমূল বেদ ও ভার্গব উপস্থা তাহাদের দিব্য ও ভাস্বর প্রভায় আমাদের জীবন প্রদীপ্ত করুক; ভগবানের নিকট এই প্রার্থনাই করি। ভারতপ্রবাসী পারসীকগণ বেদের সমাদর করিয়া ভারতীয় সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলিয়া নিজেদের গৌরবান্বিত বোধ করুন। অনাগত কালের সেই মহামিলনের স্বপ্ন দেখিয়া এই ক্ষুদ্র নিবন্ধ শেষ করিতেছি।

যজ্ঞ-তত্ত্ব

বৈদিক সাহিত্য যজ্ঞকেন্দ্রিক। বৈদিক ঋষির সমস্ত সাধনা যজ্ঞের পরিবেশে সমুজ্জ্বল। যজ্ঞ আর্য্য-সভ্যতার মূলে, মধ্যে এবং বর্ত্তমানে সমভাবে আপন অসীম প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাই বেদ বুঝিতে হইলে যজ্ঞ বুঝিতে হইবে। যজ্ঞের দীপ্তশিখা আজিও ভারতের গৃহে গৃহে জ্বলিতেছে, আজিও আমাদের ক্রিয়াকর্ম্মে তাহার অব্যাহত প্রভাব।

যজ্ঞের দুই রূপ। এক রূপ ক্রিয়াবহুল হবনক্রিয়া—যজুর্ব্বেদে ও ব্রাহ্মণে ইহার পরিচয় পাই; অন্যরূপ ইহার দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্ব—গীতায় তাহার সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে উভয়ের কথা বলিব।

যজ্ঞের ধাত্বর্থ—ইজ্যতে হবির্দীয়তেঽত্র। যাহাতে হবির্দান হয় তাহাই যজ্ঞ। 'যজ্ঞঃ সবোঽধ্বরো যাগঃ সপ্ততন্তুর্মখঃ ক্রতুঃ।' অমরকোষে যজ্ঞের এই সাতটি প্রতিশব্দ পাই। শব্দরত্নাবলী ইহা ছাড়া—ইষ্টি, ইষ্ট, বিতান, মন্যু, আহব, সবন, হব, অভিষব, হোম, হবন, মহ প্রভৃতি পর্য্যায়শব্দ দিয়াছেন। বেদ-নির্ঘণ্টুতে যজ্ঞের পর্য্যায় পাই—বেন, অধ্বর, মেধ, বিদথ, নার্য্য, সবন, হোত্রা, ইষ্টি, দেবতাতা, মখ, বিষ্ণু, ইন্দু, প্রজাপতি, ধর্ম্ম।

যজ্ঞ আর্য্যজাতির জীবনকে আদ্যন্ত নিয়মিত করিত। তাহার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এক অবিচ্ছিন্ন যজ্ঞক্রিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গর্ভাধান, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি তাহার সর্ব্ববিধ সংস্কারের সময় যজ্ঞ অপরিহার্য্য কর্ম্ম। এক কথায় আর্য্যের জীবন যজ্ঞময়। শতপথ

ব্রাহ্মণে পাই—প্রজাপতির্যজ্ঞমসৃজত। প্রজাপতি যজ্ঞ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। গীতাতেই ইহার অনুবৃত্তি দেখি :—

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥

পুরাকালে প্রজাপতি যজ্ঞ-সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া বলিলেন—তোমরা যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি লাভ কর। যজ্ঞ তোমাদের ইষ্টফলদাতা হউক।

শব্দকল্পদ্রুম কালিকাপুরাণ হইতে যজ্ঞোৎপত্তির কথা তুলিয়াছেন—তাহা শিক্ষাপ্রদ। তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধার করিতেছি :—

ঋষয়ঃ উচুঃ। কথং যজ্ঞবরাহস্য দেহো যজ্ঞত্বমাপ্তবান্
ত্রেতাত্বমগমন্ পুত্র বরাহস্য কথং ত্রয়ঃ।
তন্নোঽস্য শ্রোষ্যমাণানাং কথয়স্ব মহামতে ॥

শ্রীমার্কণ্ডেয় উবাচ। শৃণুধ্বং দ্বিজশার্দ্দূলা যৎপৃষ্টোঽহং মহাদ্ভুতং।
যজ্ঞেষু দেবাস্তিষ্ঠন্তি যজ্ঞে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
যজ্ঞেন ধ্রিয়তে পৃথ্বী যজ্ঞস্তারয়তি প্রজাঃ।
অন্নেন ভূতা জীবন্তি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
পর্জ্জন্যো জায়তে যজ্ঞাৎ সর্ব্বংযজ্ঞময়ং ততঃ ॥
স যজ্ঞোঽভূদ্বরাহস্য কায়াৎ শম্ভুবিদারিতাৎ।
যথাহং কথয়ে তদ্বঃ শৃণ্বন্তবহিতা দ্বিজাঃ ॥
বিদারিতে বরাহস্য কায়ে ভর্গেন তৎক্ষণাৎ
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবা দেবাঃ সর্বৈশ্চ প্রমথৈঃ সহ।
নির্ম্মজ্জলাৎ সমুদ্ধৃত্য তচ্ছরীরং নভঃ প্রতি।
তদ্বিভেজুঃ শরীরন্তে বিষ্ণোশ্চক্রেণ খণ্ডশঃ।
তস্যাঙ্গসন্ধয়ো যজ্ঞা জাতাস্তে বৈ পৃথক্ পৃথক্।

যস্মাদ্ যস্মাচ্চ যে যজ্ঞাস্তৎ শৃণ্বন্তু মহর্ষয়ঃ।
জ্রনাসা সন্ধিনা জাতো জ্যোতিষ্টোমো মহাধ্বরঃ।
হনুশ্রবণ সন্ধ্যোস্তু বহ্নিষ্টোমো ব্যজায়ত॥
চক্ষু ভ্রুবো সন্ধিনা তু ব্রাত্যাষ্টোমো ব্যজায়ত॥
রাজঃ পৌনর্ভবষ্টোমস্তস্য পোত্রোষ্ঠসন্ধিনা।
বৃদ্ধষ্টোমবৃহষ্টোমৌ জিহবামূলাদ্ব্যজায়ত॥
অতিরাত্রং স বৈরাজমধোজিহ্বান্তরাদভূৎ॥
অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং
হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনং।
স্নানং তর্পণপর্য্যন্তং নিত্যযজ্ঞশ্চ সর্ব্বশঃ
কণ্ঠসন্ধে সমুৎপন্না জিহ্বাতো বিধয়স্তথা॥
বাজিমেধো মহামেধো নরমেধস্তথৈবচ।
প্রাণিহিংসাকরা যেঽন্যে তে জাতা পাদসন্ধিতঃ
রাজসূয়োঽথ কারীষো বাজপেয়স্তথৈবচ
পৃষ্ঠসন্ধৌ সমুৎপন্না গ্রহযজ্ঞাস্তথৈবচ॥
প্রতিষ্ঠোৎসর্গযজ্ঞাশ্চ দানশ্রাদ্ধাদয়স্তথা।
হৃৎসন্ধিত সমুৎপন্না সাবিত্রীযজ্ঞ এব চ।
সর্ব্বেষাং সাধকা যজ্ঞঃ প্রায়শ্চিত্তকরাশ্চ যে।
তে মেঢ্রসন্ধিতো জাতা যজ্ঞাস্তস্য মহাত্মনঃ।
রক্ষসত্রং সর্পসত্রং সর্ব্বঞ্চৈবাভিচারিকং।
গোমেধো বৃক্ষজাপশ্চ খুরেভ্যো হ্যভবন্নিমে।
মায়েষ্টিঃ পরমেষ্টিশ্চ গীষ্পতির্ভোগসম্ভবঃ।
লাঙ্গুলসন্ধৌ সংজাতা অগ্নিষ্টোমস্তথৈব চ।
নৈমিত্তিকাশ্চ যে যজ্ঞা সংক্রান্ত্যাদৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

লাঙ্গুলসন্ধৌ তে জাতাস্তথা দ্বাদশ বার্ষিকং।
তীর্থপ্রয়োগ সামৌজ-যজুঃ সঙ্কর্ষণস্তথা।
আর্কমাথর্ব্বণশ্চৈব নাভিসন্ধে সমুদ্গতাঃ॥
ঋচোৎকর্ষ ক্ষেত্রযজ্ঞঃ পঞ্চমার্গোঽতিযোজনঃ
লিঙ্গ সংস্থানহৈরম্ব যজ্ঞা জাতাশ্চ জানুনি
এবমষ্টাধিকং জাতং সহস্রং দ্বিজসত্তমাঃ।
যজ্ঞানাং সততং লোকা যৈর্ভাব্যস্তেঽধুনাপি চ।
স্রুগস্য পোত্রাৎ সংজাতা নাসিকায়াঃ স্রুবোঽভবৎ॥
অন্যে স্রুক স্রুব ভেদা যে তে জাতাঃ পোত্র নাসয়োঃ।
গ্রীবাভাগেন তস্যাভূৎ প্রাগ্বংশো মুনিসত্তমাঃ॥
ইষ্টাপূর্ত্তং যর্জুধর্ম্মো জাতা শ্রবণরন্ধ্রতঃ।
দংষ্ট্রাভ্যোঽভবন্ যূপাঃ কুশা রোমানি চাভবন্।
উদ্গাতা চ তথাধ্বর্য্যুর্হোতা সমিধ এব চ।
অগ্র দক্ষিণ বামাঙ্গ পশ্চাৎ পাদেষু সঙ্গতাঃ।
পুরোডাশাঃ সচর বো জাতাঃ মস্তিষ্কসঞ্চয়াৎ।
কর্ষুর্নেত্রযুগাজ্জাতা যজ্ঞকেতুস্তথা খুরাৎ।
মধ্যভাগোঽভবদ্বেদী মেঢ্রাৎ কুণ্ডমজায়ত।
রেতোধারাস্তথৈবাজ্যং স্বরাস্মন্ত্রা সমুদ্গতাঃ॥
যজ্ঞালয়ঃ পৃষ্ঠভাগাৎ হৃৎপদ্মাৎ যজ্ঞ এব চ।
তদাত্মা যজ্ঞপুরুষো মুণ্ডাঃ কক্ষাৎ সমুদ্গতাঃ॥
এবং যাবন্তি যজ্ঞানাং ভাণ্ডানি চ হবীংষি চ
তানি যজ্ঞবরাহস্য শরীরাদেব চাভবন্।
এবং যজ্ঞবরাহস্য শরীরং যজ্ঞতামগাৎ।
যজ্ঞরূপেন সকলমাপ্যায়িতুমিদং জগৎ॥

এবংবিধায় যজ্ঞস্ত ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
সুবৃত্তং কনকং ঘোরমাসেচুর্যজ্ঞতৎপরাঃ।
ততস্তেষাং শরীরাণি পিণ্ডীকৃত্য পৃথক্ পৃথক্।
ত্রিদেবাস্ত্রিশরীরানি ব্যধস্মুখবায়ুভিঃ॥
সুবৃত্তস্য শরীরস্ত ব্যধস্মুখবায়ুনা।
স্বয়মেব জগৎস্রষ্টা দক্ষিণাগ্নিস্ততোঽভবৎ।
কনকস্য শরীরস্ত ধ্মাপয়ামাস কেশবঃ।
ততোঽভূদ্‌গার্হপত্যাগ্নিঃ পঞ্চবৈতানভোজনঃ॥
ঘোরস্য তু বপুঃ শম্ভুর্ধ্মাপয়ামাস বৈ স্বয়ং।
তত আহবনীয়োঽগ্নিস্ততক্ষণাৎ সমজায়ত॥
এতৈস্ত্রিভির্জগৎ ব্যাপ্তং ত্রিমূলং সকলং জগৎ।
এতৎ যত্র এয়ং নিত্যং তিষ্ঠতি দ্বিজসত্তমাঃ
সমস্তা দেবতাস্তত্রা বসন্তেঽনুচরৈঃ সহ।
এতত্তত্রপ্রদং নিত্যমেতদ্দেব ত্রয়াত্মকং।
এতৎ এয়ীবিধিস্নানমেতৎ পুণ্যকরং পরং।
যস্মিন্ জনপদে চৈতে হূয়ন্তে অগ্নয়স্ত্রয়ঃ।
তস্মিন্ জনপদে নিত্যং চতুর্ব্বর্গো বিবর্দ্ধতে॥
এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং যৎ পৃষ্টং দ্বিজসত্তমৈঃ
যথা যজ্ঞবরাহস্য দেহো যজ্ঞত্বমাপ্তবান্।
তথা চ তস্য পুত্রাণাং দেহাস্ত্রেতাত্বমাগমন্॥

কালিকাপুরাণ-৩০শ অধ্যায়।

কালিকা পুরাণের এই বিস্তৃত উপাখ্যানে যজ্ঞবিভাগের ও নানা যজ্ঞের প্রকার-ভেদ পরিকীর্ত্তিত। মহাদেব সুদর্শন চক্রদ্বারা বরাহদেবের অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিলে, সেই ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডসকল যজ্ঞরূপে পরিণত হইল।

ইহাদের সংখ্যা ১০০৮। গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি, এই অগ্নিত্রয় যজ্ঞের তিন পুত্র। এই অগ্নিতে যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন হইলে চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়।

এই ব্যা হইতে আমরা বুঝি, কেমন করিয়া বৈদিক কৃষ্টি পৌরাণিক যুগে রূপক ও আখ্যানে পরিণত হইয়াছিল। বৈদিক যজ্ঞাদি বুঝিতে হইলে আমাদিগকে ব্রাহ্মণ ও শ্রৌত সূত্রাদির শরণ লইতে হইবে। পৌরাণিক যুগ বৈদিক ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—তাই তাহাতে বৈদিক পরিবেশ সম্যকরূপে স্ফুরিত হয় নাই।

বৈদিক ঋষিরা নানাবিধ যজ্ঞ করিতেন—কোনটিতে একদিন লাগিত, কোনটি পাক্ষিক, কোনটি মাসিক, কোনটি সাংবৎসরিক। জীবনের যাহা কিছু বিশেষ ঘটনা, জন্ম, মৃত্যু, উপনয়ন, বিবাহ সর্ব্বত্রই যজ্ঞ।

যজ্ঞে তিনটি শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন—দেবতা, দ্রব্য এবং ত্যাগ। কারণ দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগই যজ্ঞ। সংকীর্ণ অর্থে বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা। যে দ্রব্য ত্যাগ করা হইত, তাহা হব্য। ত্যাগকর্ম্মের নাম আহুতি। ঘৃত, চরু, পুরোডাশ, সোমরস প্রভৃতি পদার্থ হব্য দেওয়া হইত। যে গৃহস্থের জন্য যাগ তিনি যজমান। যিনি যাগ করেন, তিনি যাজক বা ঋত্বিক।

যজ্ঞ অনুসারে নানাবিধ ঋত্বিক ছিল। যিনি দেবতাদের আহ্বান করেন, তিনি হোতা। আগুনে যিনি আহুতি দেন তিনি অধ্বর্য্যু। যিনি সাম গান করেন, তিনি উদ্গাতা। আর একজন ছিলেন সর্ব্বাধ্যক্ষ—তাঁহার কাজ ছিল সমস্ত কর্ম্ম সুশৃঙ্খল-ভাবে হইতেছে কি না, তাহা পর্য্যবেক্ষণ। তাঁহার নাম ছিল ব্রহ্মা। ইহাদের প্রত্যেকের আবার সহকারী ছিলেন।

হোতার সহকারী মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুৎ। অধ্বর্য্যুর প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা ও উন্নেতা। উদ্গাতার পক্ষে প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য। ব্রহ্মার পক্ষে ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, আগ্নীধ্র ও পোতা।

ঋতুতে ঋতুতে যজ্ঞ করেন বলিয়া যাজ্ঞিকের সাধারণ নাম ঋত্বিক। ইহার ব্যুৎপত্তি এই শ্লোকে আছে :—

অগ্ন্যাধেয়ং পাকযজ্ঞানগ্নিষ্টোমাদিকান্ মখন।
যঃ করোতি বৃতো যস্য তস্যর্ত্বিংগোহোচ্যতে ॥

যজ্ঞ কতকগুলি নিত্য, কতকগুলি কাম্য, কতকগুলি স্মার্ত্ত, কতকগুলি শ্রৌত। কাম্যকর্ম্ম স্বেচ্ছাধীন। পুত্র যিনি কামনা করেন, তিনি পুত্রেষ্টি যাগ করেন—ইহা না করিলে কোনও পাতক নাই। নিত্যকর্ম্ম অবশ্যকরণীয়—না করিলে প্রত্যবায় আছে। স্মার্ত্তকর্ম্মের জন্য যে অগ্নি তাহার নাম গৃহ্য অগ্নি। ইহাকে আবসথ্য বা স্মার্ত্ত অগ্নিও বলে। এই অগ্নিতে পাকযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রে পাকযজ্ঞ ত্রিবিধ বলা হইয়াছে। মনু বলিতেছেন—

যে পাকযজ্ঞাশ্চ চত্বারো বিধিযজ্ঞসমন্বিতাঃ।
সর্ব্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥

কুল্লুক এই চারিপ্রকার পাকযজ্ঞের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—ইহারা বৈশ্বদেব হোম, বলি, নিত্যশ্রাদ্ধ এবং অতিথিভোজন।

বৃষোৎসর্গ, উপনয়ন, বিবাহ, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, জলাশয়-প্রতিষ্ঠায় যে সব যজ্ঞ করিতে হয়, সেগুলি গৃহ্যসূত্রের বিধানে করিতে হয়। আর অগ্নিহোত্র, অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয়, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞ শ্রৌত-সূত্রের বিধানে করিতে হয়।

শ্রৌতযজ্ঞ আজ কাল আর কেহ করে না, কিন্তু স্মার্ত্তযজ্ঞ আজিও অব্যাহতভাবে চলিতেছে। বৈদিক গৃহস্থকে আহিতাগ্নি হইতে হইত।

বিবাহের পর এই অগ্নি স্থাপন করিয়া আজীবন ইহার সেবা চলিত। সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ হইত—বিবাহের পর অগ্নিস্থাপন হইত। ইহাকে অগ্ন্যাধান বা অগ্ন্যাধেয় বলিত। ইহার জন্য একখানি ঘর বাঁধিতে হইত; তাহাকে অগ্নিশালা বলিত। ইহাতে চতুষ্কোণ বেদী রচিত হইত। বেদীর পশ্চিমে গার্হপত্যের স্থান—পূর্ব্বে আহবনীয়ের এবং দক্ষিণদিকে দক্ষিণাগ্নির অবস্থান। গার্হপত্য বৃত্তাকার, আহবনীয় চতুষ্কোণ, আর দক্ষিণাগ্নি অর্দ্ধবৃত্তাকার—কিন্তু প্রত্যেকের ক্ষেত্রফল এক বর্গহাত। গার্হপত্য অগ্নি বাড়ীর কাজের জন্য—সর্ব্বদাই ইহা জ্বালা হইয়া থাকে। আহবনীয় দেবতাদের অগ্নি—ইহাতে দেবোদ্দেশে সকলই আহুতি দেওয়া যায়। দক্ষিণাগ্নিতে পিতৃগণকে হব্য দান করা হয়। অগ্ন্যাধানের পূর্ব্বদিন যজমান দেহশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি মাঙ্গলিক কার্য্য করিয়া প্রস্তুত হন। অধ্বর্য্যু অগ্নিশালায় গার্হপত্য অগ্নি রাখেন, তথায় যজমানদম্পতী রাত্রিবাস করেন এবং অগ্নিতে সমিৎ দিয়া তাহা বাঁচাইয়া রাখেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অরণি দিয়া অগ্নিমন্থন করা হয়। অধ্বর্য্যু এই অগ্নি গার্হপত্যে রাখেন। ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক তখন সাম গান করেন। তারপর অধ্বর্য্যু গার্হপত্যের অগ্নি লইয়া আহবনীয়ের দিকে চলেন। একটী অশ্ব আগে আগে চলে, যজমান তাহার পশ্চাতে চলেন। ব্রহ্মা সাম গান করিতে করিতে অনুগমন করেন। আহবনীয়ের স্থানে একটী পা রাখিয়া ঘোড়াটিকে পশ্চিমমুখী করিয়া দাঁড় করানো হয়। অশ্বপদতলে সেই অগ্নি স্পর্শ করাইয়া আহবনীয় অগ্নিতে স্থাপিত হয়। তৎপরে দক্ষিণাগ্নি স্থাপন হয়। ব্রহ্মা তিন অগ্নি স্থাপনের সময় তিনবার সাম গান করেন। সকলে তখন অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া ঘোড়াটিকে ছাড়িয়া দেন।

ইহার পর পূর্ণাহুতি হোম। গার্হপত্যের আগুণে ঘি গরম করিয়া

জুহূ নামক হাতায় লইয়া তাহা যজুর্মন্ত্রে আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হয়। যজমান অধ্বর্য্যুকে স্পর্শ করিয়া থাকেন। পূর্ণাহুতি দিলেই অগ্ন্যাধান শেষ। গার্হপত্য অগ্নি সর্ব্বক্ষণ জ্বালিয়া রাখিতে হয়।

অগ্ন্যাধানের পর অগ্নিহোত্রী গৃহস্থকে প্রাতে একবার এবং সন্ধ্যায় একবার আহবনীয় অগ্নিতে আহুতি দিতে হইত। আহুতির দ্রব্য দশবিধ—দুগ্ধ, দধি, যবাগু, ঘৃত, অন্ন, তণ্ডুল, সোমরস, মাংস, তৈল ও মাষকলায়। অগ্নিহোত্রীর গৃহে সাধারণতঃ একটী গাভী থাকিত, তাহার নামই ছিল অগ্নিহোত্রী গাভী। ইহার দুধেই আহুতি দেওয়া হইত। আহুতির জন্য দুইখানি কাঠের হাতা লাগিত—বড়টিকে বলিত অগ্নিহোত্র হবনী, ছোটটীকে স্রুব।

অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে সপত্নীক অগ্নিহোত্রী যজ্ঞশালায় গিয়া গার্হপত্য হইতে আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি জ্বালাইয়া দেন। পরে গার্হপত্যে দুধ জাল দিয়া আহবনীয় অগ্নিতে দুইবার আহুতি দেন। অগ্নিহোত্র হোমে যে পাঁচটি মন্ত্র লাগে; শুক্ল যজুর্ব্বেদের তৃতীয় অধ্যায়ের নবম কণ্ডিকায় তাহা আছে :—

অগ্নির্জ্যোতি জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা
সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতি সূর্য্য স্বাহা
অগ্নির্ব্বর্চ্চো জ্যোতির্ব্বর্চ্চঃ স্বাহা।
সূর্য্যো বর্চ্চো জ্যোতির্ব্বর্চ্চঃ স্বাহা।
জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যো জ্যোতিঃ স্বাহা। যজু ৩।৩।৯

যিনিই অগ্নিদেব, তিনিই দৃশ্যমান জ্যোতিস্বরূপ; আবার দৃশ্যমান জ্যোতিই অগ্নি; স্বাহামন্ত্রে তাঁহাকে হবিঃ দান করি—অনুষ্ঠান শুভ হউক।

যিনিই সূর্য্যদেব, তিনিই দৃশ্যমান জ্যোতিস্বরূপ; আবার দৃশ্যমান জ্যোতিই সূর্য্য; তাহাকে স্বাহামন্ত্রে হবিঃ প্রদান করি।

যিনিই অগ্নিদেব, তিনিই তেজ; আবার যাহা দৃশ্যমান জ্যোতি, তাহাই তেজ; স্বাহামন্ত্রে হবিঃ প্রদান করি।

যিনি সূর্য্যদেব তিনিই তেজ; দৃশ্যমান জ্যোতিই তেজ, স্বাহামন্ত্রে হবিঃ দেই।

জ্যোতিই সূর্য্য, সূর্য্যই জ্যোতি—সূর্য্যকে স্বাহা।

অগ্নিস্বাহা প্রাতঃহোমে, সূর্য্যস্বাহা সায়ংহোমে ব্যবহার হয়। সমস্ত দুধ আহুতি দেওয়া হয় না। ইহার পর গার্হপত্য এবং দক্ষিণাগ্নিকে আহুতি দেওয়া হয়। আহুতিদানের পর হবিঃশেষ ভক্ষণ করিয়া তিন অগ্নিতে তিনটি সমিৎ দিয়া গৃহস্থ অগ্নিশালা ত্যাগ করেন।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বলেন, অনুদয়ে হোম ঠিক নয়, সূর্য্যোদয়ের পরই হোম বিধেয়। "যে ব্যক্তি সূর্য্য অস্তগমন করিলে সায়ংহোম করে ও উদিত হইল প্রবর্ত্তহোম করে, সে সত্যমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সত্যই হোম করে। ভূর্ভুবঃস্বরোম অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নি বলিয়া সায়ংকালে এবং ভূর্ভুবঃ স্বরোম সূর্য্যো জ্যোতির্জ্যোতিঃসূর্য্যঃ এই বলিয়া প্রাতঃকালে হোম করা হয়। যে ইহা জানিয়া উদয়ের পরে হোম করে, তাহার সত্যমন্ত্র উচ্চারণ হয় ও সত্যে হোম হয়। অতএব উদয়ের পরই হোম করিবে।" ঐতরেয় পঞ্চম পঞ্চিকা ৬।২৫)

আহিতাগ্নি গৃহস্থকে প্রত্যেক অমাবস্যায় এবং প্রত্যেক পূর্ণিমায় একটী ইষ্টিযাগ করিতে হইত। অমাবস্যায় যাহা করা হইত, তাহার নাম দর্শযাগ, পূর্ণিমার ইষ্টি পৌর্ণমাস যজ্ঞ। যবের বা চাউলের রুটিকে পুরোডাশ বলে। প্রথম আহুতি অগ্নি। আটখানি মাটির খোলায় সেঁকিতে হইত বলিয়া ইহাকে অষ্টকপাল পুরোডাশ বলে। অগ্নি ও

বিষ্ণুর উদ্দেশে দ্বিতীয় আহুতি একাদশ কপালে নির্ম্মিত হয়। চারিজন ঋত্বিকের প্রয়োজন—অধ্বর্য্যু, হোতা, ব্রহ্মা, অগ্নীধ্র।

যাগের পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্নে যজমান তিন অগ্নিতে এক একখানি সমিৎ দিয়া রাখেন এবং অপরাহ্নে ব্রত গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক অগ্নিশালায় রাত্রি যাপন করেন। প্রথমে ঋত্বিক বরণ হয়। তারপর অধ্বর্য্যুর আদেশে হোতা অগ্নিসমিন্ধনের জন্য সামিধেনী মন্ত্র পাঠ করেন—আহবনীয় অগ্নি অধ্বর্য্যুর দত্ত সমিধে জ্বলিয়া ওঠে।

প্রথমে প্রযাজ অনুষ্ঠিত হয়। অধ্বর্য্যু ঘৃতদ্বারা সমিৎ, তনূনপাৎ ইড়া, বর্হি, স্বাহাকার এই পঞ্চদেবতাকে আহুতি দেন। তাহার পর অগ্নির উদ্দেশে একবার, সোমের উদ্দেশে একবার আজ্য আহুতি দেওয়া হয়। ইহাই আজ্যভাগ দান। তাহার পর প্রধান যাগ আরম্ভ হয়—প্রথমে অগ্নির পুরোডাশ, তাহার পর সোমের পুরোডাশ দিতে হয়। উভয়ের মাঝে অনুচ্চস্বরে অগ্নি ও সোমের উদ্দেশে ঘৃতাহুতি দিতে হয়। তাহাকে উপাংশু যাগ বলে। পুরোডাশের অবশিষ্ট অংশ হইতে কিছু স্বিষ্টকৃৎ অগ্নিতে দেওয়া হয়। ইহাই স্বিষ্টকৃৎ যাগ।

তারপর হবিঃশেষ ভক্ষণ করা হয়। ঘৃতাক্ত পুরোডাশকে ইড়া বলে। তাহার পর বর্হি. নরাশংস এবং স্বিষ্টকৃতে আজ্যাহুতি দিয়া অনুযাজ করা হয়। ইহার পর প্রস্তর নামক যে দর্ভমুষ্টি বেদীতে রাখা হয়, তাহাই দাহন হয় এবং পুড়িবার সময় হোতা সূক্তবাক্ পড়েন। পুড়িবার পর যে আশীর্ব্বাচন মন্ত্র পড়েন, তাহাকে শংযুবাক্ বলে। তাহার পর পরিধি নামক সমিৎত্রয় অগ্নিতে ফেলিয়া দিয়া অধ্বর্য্যু বিশ্বদেবগণের উদ্দেশে সংস্রব হোম করেন। এই হোমের সহিত যজমানের পক্ষে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

কিন্তু হোমান্তে যজমানপত্নী গার্হপত্য অগ্নিতে দেবপত্নীগণের এবং অগ্নি গৃহপতির উদ্দেশে যাগ করেন। ইহাকে পত্নীসংযাজ বলে। তাহার পর হবিঃশেষ ভক্ষণ কর্ শংযুবাক্ সংস্রব করিতে হয়।

তাহার পর পিষ্টলেপাহুতি এবং সমিষ্ট যজুর্হোমের পর দেবগণ যজ্ঞস্থল হইতে চলিয়া যান। বেদীর উপর যে কুশ থাকে, তাহা আহবনীয়তে ফেলিয়া দেওয়া হয়। প্রণীতা নামক যে জল রাখা হয়, তাহা বেদীর উপর ঢালিয়া দেওয়া হয়। তুষ ও ক্ষুদের গুঁড়া রাক্ষসদের জন্য দেওয়া হয়। ইহার পর বিষ্ণুক্রম অনুষ্ঠান। যজমান তিন পা ফেলিয়া পূর্ব্বমুখে আহবনীয় পর্য্যন্ত যজ্ঞস্থল প্রক্রমণ করেন। পরে সূর্য্য ও গার্হপত্য অগ্নির উপস্থান করিয়া মন্ত্র পড়েন :—

"অগ্নে গৃহপতি সুগৃহপতিস্ত্বয়াগ্নেঽহং গৃহপতিনা ভূয়াসং।
সুগৃহপতিস্তং ময়াগ্নে গৃহপতিনা ভূয়াঃ অস্থূরি নৌ গার্হপত্যানি।
সন্তু শতং হিমাঃ
সূর্য্যস্যাবৃতমন্বাবর্ত্তে॥ যজু ২।২৭

অগ্নে ব্রতপতে ব্রতমপরিষং তদশকং তন্মেঽরাধি।
ইদমহং য এবাস্মি সোঽস্মি। ২।২৮

এই মন্ত্রে ব্রত বিসর্জ্জন দিয়া দক্ষিণা দিতে হয়। দক্ষিণাগ্নিতে চারিজন ঋত্বিকের জন্য ভাত চড়াইয়া দেওয়া হইত। এই অন্নই যজ্ঞশেষে তাহারা ভক্ষণ করিতেন। ইহাতে যজ্ঞ দক্ষিণান্ত হইত। পরে অন্নের পরে ধেনু দক্ষিণা দেওয়া হইত। শেষে ধেনুর পরিবর্ত্তে কাঞ্চন-মূল্য দেওয়া হইত।

নিরূঢ় পশুবন্ধ সমস্ত পশুযাগের প্রকৃতি। ইহাতে ছয়জন ঋত্বিক লাগে—অধ্বর্য্যু, প্রতি প্রোস্থাতা, হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রহ্মা ও অগ্নীধ্র।

ইষ্টিযাগের বেদীর পূর্বে পাশুকবেদী নামে বেদী রচিত হয়—তাহার উপর উত্তরবেদী নামে একটী ছোট বেদী করা হয়। উত্তরবেদীর মধ্যস্থল নাভি, আহবনীয় হইতে অগ্নি আনিয়া সেখানে রাখা হয়। পশুবন্ধনের জন্য চাই যুপ। যুপ সংস্কার করিতে হয়। ইহার পরে ঘি মাখাইয়া যুপাঞ্জন করা হয়। যূপের গায়ে দড়ি জড়াইতে হয় তাহাকে রশনাবেষ্টন বলে। উচ্ছ্রয়স্ব বনস্পতি—প্রভৃতি মন্ত্রে যুপকে উত্তোলন করা হয়। বন্ধনের পূর্ব্বে পশুকে কুশস্পর্শ করাইতে হয়। তাহাকে উপাকরণ বলে। পশুকে যুপের সঙ্গে বন্ধনের নাম নিয়োজন।

তারপর অগ্নি সমিন্ধন ও বরণ করিয়া প্রযাজ করিতে হয়। ইহাতে আপ্রীসূক্তে এগার দেবতার উদ্দেশে এগারটি আহুতি দেওয়া হয়। প্রথম দশটি আহুতির দ্রব্য আজ্য, শেষটীর আহুতি পশুর বসা।

যে পশুবধ করে তাহার নাম শমিতা। শ্বাসরোধ করিয়া পশুবধ করা হইত—ইহাকে সংজ্ঞপন বলিত। পশুর উদর হইতে বসা গ্রহণ করিয়া অন্তিম প্রযাজাহুতি হইত। তাহার পর অধ্বর্য্যু অগ্নি ও ইন্দ্রের উদ্দেশে বপাহুতি, পুরোডাশ এবং পশুর অঙ্গ আহুতি দেন। পুরোডাশ আহুতির পর শমিতা পশুর মেধ্য অঙ্গ পাক করিয়া দেন। অধ্বর্য্যু তাহা ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহুতি দেন। পাকের হাঁড়ির চর্ব্বিগুলি বনস্পতিকে দেওয়া হয়। ইহার পর স্বিষ্টকৃৎ যাগ ও হবিঃশেষ ভক্ষণ। তদনন্তর আনুষঙ্গিক একাদশ অনুযাজ ও একাদশ উপযাজ যাগ করা হয়। তারপর ইষ্টিযাগের ন্যায় অনুষ্ঠান করিয়া ব্রত সমাপ্ত হয়।

যাগ ত্রিবিধ—ইষ্টিযাগ, পশুযাগ এবং সোমযাগ। এখন সোমযাগের কথা বলিব।

সোমযাগ নিত্য কর্ম্ম নহে, কিন্তু তিন পুরুষের মধ্যে না করিলে সেকালে দুর্ব্রাহ্মণ বলিয়া নিন্দা হইত। গ্রামের বাহিরে বিস্তৃত ভূমিতে এই যজ্ঞ করিতে হইত। সেই স্থানকে দেবযজন ভূমি বলিত। দুইটি বেদী লাগিত—একটি ঐষ্টিক বেদী, আর তাহার পূর্ব্বে মহাবেদী বা সৌমিক বেদী।

ঐষ্টিক বেদীকে ঘিরিয়া খুঁটির উপর পূর্ব্বমুখী বাঁশ দিয়া প্রাগ্বংশশালা তৈরী হইত। মহাবেদীর উপর কয়েকটী গৃহ নির্ম্মিত হইত—সকলের পশ্চিমের মণ্ডপের নাম সদঃশালা, মাঝে হবির্দ্ধান মণ্ডপ, আর বেদীর দুই পার্শ্বে অগ্নীধ্রীয় এবং মার্জ্জালীয় নামে দুইটি ছোট মণ্ডপ থাকিত। সদঃশালায় অগ্নি থাকিত। সেই অগ্নিস্থানকে ধিষ্ণ্য বলিত। ধিষ্ণ্যের পাশে বসিয়া অচ্ছাবাক, নেষ্টা প্রভৃতি ঋত্বিকেরা সোমযাগের মন্ত্রপাঠ করিতেন। মাঝখানে একটী ডুমুরের শাখা থাকিত—তাহাকে ঔদম্বরী শাখা বলিত। উদ্গাতা ও তাহার সহকারিগণ এই শাখা ছুঁইয়া সামগান করিতেন। মহাবেদীর উত্তরাংশে উত্তরবেদী ও নাভি পাশুক বেদীর মতই করা হইত। তাহার পূর্ব্বদিকে যূপ থাকিত। যজ্ঞশালার উত্তর দিকে মাটি তুলিয়া উত্তরবেদী নির্ম্মাণ করা হইত—এই গর্ত্তকে চাত্বাল বলিত। ধূলি ও আবর্জ্জনার স্তূপকে উৎকর বলা হইত। শামিত্র দেশ নামক স্থানে পশুবধ হইত। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইহার ছবি আছে। কৌতূহলী পাঠক যজ্ঞকথা ভাল ভাবে বুঝিতে চাহিলে, তাহার রচিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞকথা পড়িবেন। এই প্রবন্ধে তাহার পুস্তক হইতে সারাংশ চয়ন করিয়াছি।

সোমযাগ বিরাট ব্যাপার—ইহাতে ১৬ জন ঋত্বিক লাগিত। ষোল জন ঋত্বিক ছাড়া চমসাহুতির জন্য দশ জন চমসাধ্বর্য্যুর প্রয়োজন

হইত। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রকৃতি। তাহারই বর্ণনা করিব। অগ্নিষ্টোম একদিনের যাগ। কিন্তু ইহার পূর্ব্বে ও পরে করণীয় লইয়া পাঁচদিন লাগিত।

ষোড়শ জন ঋত্বিক বরণ করিয়া অরণিতে অগ্নি লইয়া যজ্ঞশালায় গমন করিয়া বলিতেন :—

এদমগন্ম দেবযজনং পৃথিব্যা যত্র দেবাসো অজুষন্ত বিশ্বে।
ঋকসামাভ্যাং সংতরন্তো যজুর্ভী রায়স্পোষেণ সমিধা মদেম।

আমরা দেবযজন ভূমি নামক পৃথিবীতে আসিয়াছি—আমার আহ্বানে এখানে বিশ্বদেবগণ পূজিত হইবেন। ঋক, যজু, সামমন্ত্রে যখন তাহাদের পূজা করিব, তখন আমরা ধন, পুষ্টি ও অভিলষিত অন্নলাভে সম্যক হৃষ্ট হইব।

নূতন যজ্ঞশালায় অগ্নি জ্বালিয়া যজমানের দীক্ষা হয়। প্রথমে ক্ষৌরকার্য্য হয়—তখন অধ্বর্য্যু বলেন—

ইমা আপঃ শমু মে সন্তু দেবীঃ
ওষধে ত্রায়স্ব স্বধিতে মৈনং হিংসীর।

এই নির্ম্মল জল যজমানের সুখের কারণ হউক। হে তরুণ কুশ, তুমি যজমানকে ক্ষুরের ধার হইতে রক্ষা কর। হে ক্ষুর, তুমি যজমানের মস্তক হিংসা করিও না। মস্তক মুণ্ডনে কেশমূলে লুক্কায়িত পাপ দূর হয়। তাহার পর স্নান হয়। স্নানান্তে তিনি পাঠ করেন :—

আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু ঘৃতেন নো ঘৃতস্বঃ পুনন্তু
বিশ্বং হি রিপ্রং প্রবহন্তি দেবীঃ।

হে মাতার ন্যায় পালনকর্ত্রী জলরাশি, ক্ষৌরক্ষত নিবারণ করুন। ক্ষরিত জলধারায় আমাদিগকে শুদ্ধ করুন। দ্যুতিমান জলরাশি সকল পাপ প্রকৃষ্টভাবে দূর করুন। তাহার পর ক্ষৌমবস্ত্র পরেন—তাহারও

মন্ত্র আছে। সমস্ত মন্ত্র তুলিবার স্থান নাই—অনুসন্ধিৎসু শুক্ল যজুর্ব্বেদের চতুর্থ হইতে অষ্টম অধ্যায় পড়িবেন। কুশের উপর দাঁড়াইয়া নবনীতে অভ্যঙ্গ করিয়া, নয়নে কাজল দিয়া মুষ্টিবদ্ধ করিয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিবেন এবং যজ্ঞ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আর বাহিরে আসিবেন না।

প্রথমে দীক্ষণীয় ইষ্টি করিতে হয়। একাদশ কপালে সংস্কৃত ও দীক্ষণীয় পুরোডাশ অগ্নি ও বিষ্ণুর উদ্দেশে নির্ব্বপণ করিয়া সর্ব্বদেবতার তৃপ্তি বিধান করা হয়। তৎপরে সপ্তদশ শমিধেনী পাঠ হইবে। তাহার পরে দীক্ষাসমাপনান্তে দেবগণকে যজ্ঞশালায় আহ্বান করা হয়—

আ বো দেবাস ঈমহে বামং প্রযত্যধ্বরে।
আ বো দেবাস আশিষো যজ্ঞিয়াসো হবামহে॥

হে দেবগণ আমাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে আপনাদের সহায়তা কামনা করি। অর্পিত হবি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ইহার পর রাক্ষসগণ বিনাশের জন্য ঔদগ্রভণ যজ্ঞে ঘৃতাহুতি দিয়া কৃষ্ণাজিন পাতিয়া বসিবেন। তৃণ ও শণের মেখলা পরিবেন, মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিবেন, দণ্ড ধারণ করিবেন, কৃষ্ণবিষল দ্বারা কণ্ডুয়ন করিবেন।

দীক্ষাতে যজমানের নবজন্ম। তাই এই বেশভূষার আয়োজন। তৎপরে চতুঃস্তন-বিশিষ্ট গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া ব্রত গ্রহণ করিবেন। শয়ন করিবার সময় অগ্নিকে রক্ষার জন্য বলিবেন :—

অগ্নে ত্বং সুজাগৃহি বয়ং সুমন্দিষীমহি।
রক্ষাণো অপ্রযুচ্ছন্ প্রবুধে নঃ পুনস্কৃধি। ৪।১৪

দ্বিতীয় দিন প্রাতে উঠিয়া আত্মোদ্বোধন মন্ত্র পড়েন :—

পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম্ম আগন্ পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্
পুনশ্চক্ষু পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্
বৈশ্বানরো অদব্ধস্তনূপা অগ্নির্ন পাতু দুরিতাদবদ্যাৎ॥ ৪।১৫

ইহার পর প্রায়ণীয় যাগ। এই ইষ্টির পঞ্চ দেবতা—পথ্যা, অগ্নি, সোম, সবিতা ও অদিতি। অদিতিকে চরু দিতে হয়—আর চারিজনকে ঘৃত দিলেই হয়। এই যাগের পর সোম ক্রয়। বাগ্‌দেবতা সোমকে আনয়ন করেন—তাই তাহার উদ্দেশ্যে সোমক্রয়ে এই চমৎকার মন্ত্রটি পঠিত হয় :—

চিদসি মনোসি ধীরসি দক্ষিণাসি ক্ষত্রিয়াসি
যজ্ঞিয়াস্যদিতিরস্যুভয়তঃ শীর্ষ্ণী।
সা নঃ সুপ্রাচী সুপ্রতীচ্যেধি মিত্রস্ত্বা পদি
বধ্নীতাং পূষাধ্বনস্পাত্বিন্দ্রায়াধ্যক্ষায় ॥

তুমি চিৎ হও, তুমি মন হও, তুমি ধী হও, তুমি দক্ষিণা, তুমি ক্ষত্রিয়া, তুমি যজ্ঞিয়া, তুমি অদিতি, তুমি সর্ব্বতোমুখী। তুমি আমাদিগের সহজপ্রাপ্য হও, সূর্য্যদেব তোমাকে আমাদের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করুন। অধ্যক্ষ ইন্দ্র এবং পূষা আমাদিগকে মার্গ হইতে রক্ষা করুন।

সোম-বিক্রয়ী পাপী, তাই সোম কিনিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হয়। যজমান সোমলতা কাপড়ে জড়াইয়া মাথায় লইয়া গাড়ীতে তুলেন। হোতা ঋক্ পড়েন। সুব্রহ্মণ্য গাড়ী চালাইয়া প্রাগ্‌বংশশালা ঘুরিয়া ভিতরে প্রবেশ করেন। সোমকে ঐষ্টিক বেদীর আহবনীয়ের পাশে কাঠের উপর রাখা হয়।

সোম রাজা, তাই সোম আসিলে আতিথ্য ইষ্টি হয়। এই যজ্ঞের দেবতা বিষ্ণু। নিম্ন মন্ত্রে তাহার আহ্বান :—

বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যানি প্রবোচং য পার্থিবানি বিমমে রজাংসি
যো অস্কভায়দুত্তরং সধস্থং বিচক্রমানস্ত্রেধোরুগায়ঃ
বিষ্ণবে ত্বা। ৫।১৮

দিবো বা বিষ্ণ উত বা পৃথিব্যা মহো বা
বিষ্ণ উরোরন্তরিক্ষাৎ।
উভাহি হস্তা বসুনা পৃণস্বা প্রযচ্ছ দক্ষিণাদোত সব্যাৎ।
বিষ্ণবে ত্বা ॥ ৫।১৯

প্র তদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভীমঃ কুচরো গিরিষ্ঠাঃ
যস্যোরুষু বিষ্ণু বিক্রমনেষ্বধিক্ষিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বা। ৫।২০

মন্ত্র তিনটির ভাবার্থ দিলাম :—

হে বিষ্ণু, তুমি সর্ব্বব্যাপী, তুমি চরাচর জগৎ ব্যক্ত করিয়া শোভিত, একপাদে পৃথিবী, দ্বিতীয় পাদে অন্তরীক্ষ, তৃতীয়পাদে দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছ। সর্ব্ব বিশ্ব তোমার বিভূতি—তুমি আমাদের যজ্ঞে এস। হে সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বর, তুমি সর্ব্বদেবগণের বিক্রমস্থান, ভূরাদি তোমার পদত্রয়ের বিভূতি, তুমি সমগ্র জগতে আছ, তুমি নৃসিংহরূপে আসিয়াছিলে। তুমি গিরিশায়ী মৃগরাজের মত সকলের পূজ্য।

আতিথ্য ইষ্টের পর প্রবর্গ। ইহার প্রধান হব্যের নাম ঘর্ম্ম। মহাবীর নামক মৃৎভাণ্ডে গোরু ও ছাগলের দুধ মিশাইয়া পাক করিয়া ইহা প্রস্তুত হয়। অশ্বিদ্বয় এবং অগ্নির উদ্দেশে আহুতি দিয়া হবিঃশেষ ভক্ষণ করিতে হয়।

প্রবর্গ্যের পর উপসৎ ইষ্টি। ইহাতে ঘৃতাহুতি দিয়া অগ্নি, বিষ্ণু এবং সোমের হবন হয়। নির্ব্বিঘ্ন যজ্ঞসমাপ্তির জন্য তিন দেবতার নিকট প্রার্থনা হয়। অসুরেরা তিন লোক জয় করিয়া তাহাদিগকে সোনা, রূপা ও লোহার দেওয়ালে ঘিরিয়া দুর্গ করিয়াছিল। এই তিন দেবতা সেই ত্রিপুর জয় করিয়াছিলেন। তাহা স্মরণ করিয়া প্রথম দিন অয়ঃশয়া নামক কল্পিত লৌহপুরে, দ্বিতীয় দিন রজঃশয়া নামক রজতপুর এবং তৃতীয় দিন হরিশয়া নামক স্বর্ণপুরে অবস্থান করিয়া তিনদিবসে যজ্ঞ

সমাধান করিয়া যজমান ত্রিলোকবিজয়ী হন। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ দিন পূর্ব্বাহ্ণ পর্য্যন্ত প্রবর্গ্য ও উপসৎ ছয় বার করা হয়। তাহার পর ঐষ্টিক বেদীর অগ্নি আনিয়া উত্তর বেদীর নাভিতে রাখা হয়। ছইওয়ালা গোরুর গাড়ীর নাম হবির্দ্ধান। সোম ইহাতে রাখা হইত। যজমানপত্নী গাড়ীর ধুরায় ঘি মাখাইতেন। অধ্বর্য্যু ও প্রতিপ্রস্থাতা গাড়ী চালাইয়া মহাবেদীর দিকে লয়—তাহার উপর হবির্দ্ধান মণ্ডপ বাঁধা হইত।

দুইবেলা জলের ছিটা দিয়া সোমকে ভাজা রাখা হইত—ইহাকে সোমাপ্যায়ন বলিত। চতুর্থ দিনে সোম আনিয়া হবির্দ্ধানমণ্ডপে রাখা হইত। ধিষ্ণ্যার্থ অগ্নি ও সোমের আনয়নকে অগ্নীষোমপ্রণয়ন। তাহার পর ইহাদের উদ্দেশে পশুযাগ হইত। পশুবধের পর সমারোহে বাদ্যভাণ্ড-সহকারে নদী বা তড়াগ হইতে জল আনিয়া রাখা হইত—ইহাকে বসতীবরী জল বলিত।

সোমলতা ছেঁচিয়া রস জলে মিশাইয়া আহুতি দিতে হয়। ইহাকে অভিষব বলে। সোমাভিষবের মন্ত্র এইরূপ :—

দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পূষ্ণোহস্তাভ্যাং।
আদদে রাবাসি গভীরমিমধ্বরং কৃধীন্দ্রায় সুষতমম্।
উত্তমেন পবিনোর্জ্জস্বন্তং মধুমন্তং পয়স্বন্তম্।
নিগ্রাভ্যা স্থ দেবশ্রুত স্তর্পয়ত মা॥ ৬।৩০

মনো মে তর্পয়ত বাচং মে তর্পয়ত প্রাণং মে তর্পয়ত চক্ষুর্ম্মে
তর্পয়ত। শ্রোত্রং মে তর্পয়তাত্মানং মে তর্পয়ত প্রজাং মে তর্পয়ত।
পশূন্ মে তর্পয়ত গণান মে তর্পয়ত গণাণ্ মে মা বিতৃষণ॥ ৬।৩১

অভিষব তিনবার হয়—প্রাতঃকালে; মধ্যাহ্নে এবং অপরাহ্ণে। এই তিন সবনের সঙ্গে একটী পশুযাগও হয়।

সোমরস প্রস্তুত হইলে দশাপবিত্র নামক বস্ত্রে ছাঁকিয়া লওয়া হয়।

এবং এক এক দেবতার জন্য এক এক পাত্রে রাখা হয়। উপাংশুগ্রহ প্রাতঃসবনের প্রথম গ্রহ। ইহার আহুতি সময় হোতা যাজ্যা মন্ত্র পাঠ করেন না। অধ্বর্য্যু অনুচ্চস্বরে যজুর্মন্ত্রদ্বারা সোমরস আহুতি দেন।

বাচস্পতয়ে পবস্ব বৃষ্ণো অংশুভ্যাং গভস্তিপূতঃ
দেবো দেবেভ্যঃ পবস্ব যেষাং ভাগোঽসি। ৭।১
মধুমতীর্ন ইষস্কৃধি
যত্তে সোমাদাভ্যং নাম জাগৃবি তস্মৈ তে সোম সোমায় স্বাহা
স্বাহা উর্ব্বন্তরিক্ষমন্বেমি। ৭।২

হে সোম, তুমি প্রাণের জন্য গমন কর। তুমি সর্ব্বকামনায় ফলবর্ষী। তোমার অংশুদ্বয় আমার হস্তে পবিত্র হইয়া পাত্রের উপর ধৃত হইয়াছে। হে দেবতা, তুমি দেবতাগণের জন্য গমন কর। তুমি যে সব দেবতার অংশ, তাহাদের প্রীত কর। হে সোম, তুমি আমার অন্ন স্বাদু ও মধুর কর। হে সোম, তুমি অহিংসিত, তুমি জাগরূক, তোমায় স্বাহা। স্বাহা বলিয়া বিস্তৃত অন্তরীক্ষে অনুগমন করিব।

সূর্য্যোদয়ের পরে সূর্য্যের জন্য অন্তর্যাম হোম। এই হোমের পর ঋত্বিকেরা বাহির হইয়া দ্রোণকলস নামক পাত্র হইতে সোমরস পূতভৃৎ নামক পাত্রে ঢালেন এবং উদ্গাতারা বহিস্পবমান স্তোত্র গান করেন।

উপাংশুগ্রহ দেবগণের জন্য দেওয়া হইয়াছে। এখন ইন্দ্র ও বায়ুর জন্য ঐন্দ্রবায়ব গ্রহ, মিত্র ও বরুণের জন্য মৈত্রাবরুণ গ্রহ, অশ্বিনীকুমারদের জন্য আশ্বিন গ্রহ, যণ্ড ও মর্ক নামক অসুরদ্বয়ের জন্য শুক্রামন্থী গ্রহ। তারপর সূর্য্যের জন্য অগ্রহায়ণ গ্রহ, বিষ্ণুর জন্য উক্থেয় গ্রহ, ধ্রুবের ধ্রুব গ্রহ এবং আদিত্যের জন্য আদিত্য-গ্রহ। এই নবগ্রহে নবদেবতার স্তুতি হয়। দেবগণকে যজ্ঞে আহ্বান করিয়া সোমরসের ভাগদানের

নাম শস্ত্র। প্রশংসা করা যায় বলিয়া ইহাদিগকে শস্ত্র বলে। এই শস্ত্রের জন্য বহু ঋক্ পড়িতে হয়।

রাত্রি চারি ঘটিকা হইতে বেলা নয় ঘটিকা পর্য্যন্ত প্রাতঃসবন—বেলা নয় ঘটিকা হইতে মধ্যাহ্ন তিন ঘটিকা পর্য্যন্ত মাধ্যন্দিন সবন এবং তখন হইতে রাত্রি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত সায়ংসবন। এই ষোল ঘণ্টা যজমান অবহিত হইয়া যজ্ঞে ব্যাপৃত থাকেন।

দ্বিতীয় সবন সংক্ষিপ্ততর—ইহাতে শুক্রগ্রহ এবং মন্থিগ্রহের যাগ আছে। ইহার পর চমসাহুতি। তাহার পর তিন প্রধান আহুতি দেওয়া হয়। তৃতীয় সবন সংক্ষিপ্ততম। ইহাতে আদিত্য ও পবিত্র গ্রহের ও পাত্নীব্রত গ্রহের আহুতি আছে। প্রধান আহুতি দুইটি —বৈশ্বদেব এবং অগ্নি মারুত। মাঝে মাঝে চমসাহুতি।

যজ্ঞান্তে অবভৃথ স্নান করা হয়। স্নানের পর সমাপ্তিসূচক উদয়নীয় ইষ্টি হয়। তাহার পর অনুবন্ধ্য পশুযাগ। পশুযাগের পর উদবসানীয় ইষ্টি যাগ তখন যজমাম একশত গাভী ও হিরণ্য দক্ষিণা দিয়া গৃহে ফেরেন।

অনেক অগ্নি হোম হয় বলিয়া এই যজ্ঞের নাম অগ্নিষ্টোম বা জ্যোতিষ্টোম। ইহার পর বিকৃত যাগের কথা বলিব।

প্রথম উকথ্য যাগ। অগ্নিষ্টোমে প্রাতঃসবনে পাঁচটি, দ্বিতীয়ে পাঁচটি এবং তৃতীয়ে দুইটি—এই দ্বাদশ শস্ত্র। উকথ্যে তিম সবনে পাঁচটি করিয়া পনর শস্ত্র। সবনীয় পশু দুইটি—অগ্নির উদ্দেশে একটি ছাগ, অগ্নি ও ইন্দ্রের উদ্দেশে অন্য একটি ছাগ। অসুরেরা উকথ আশ্রয় করিয়াছিল। ইন্দ্র দেবতাদের শরণ লইলেন। তাঁহার প্রার্থনায় বরুণ, বৃহস্পতি এবং বিষ্ণু ইন্দ্রকে সাহায্য করেন। এই সাহায্য কথা স্মরণ করিয়া সপ্তমমণ্ডলের ৮২ সূক্তের ইন্দ্র বরুণ দৈবত দশমমণ্ডলের

৬৮ সূক্তের ইন্দ্র বৃহস্পতি দৈবত এবং ষষ্ঠ মণ্ডলের ৬৯ সূক্তের ইন্দ্র বিষ্ণুদৈবত পাঠ করা হয়। ষোড়শী যাগে ষোলটি স্তোত্র, ষোলটি শস্ত্র। সবনীয় পশু তিনটি—ইন্দ্রের ছাগ, ইন্দ্রাগ্নির ছাগ এবং ইন্দ্রের মেষ। কেহ বলেন গৌরীবীত মন্ত্রে ষোড়শী সাম করিবে, কেহ বলেন নানদ মন্ত্রে ষোড়শী সাম করিবে।

অতিরাত্র যজ্ঞে উনত্রিশটি শস্ত্র—ইহাতে রাত্রিকৃত্য আছে। সবনীয় পশু চারিটি—অগ্নির ছাগ, ইন্দ্রাগ্নি ও সরস্বতীর ছাগ এবং ইন্দ্রের মেষ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে অতিরাত্রের কথা তুলিতেছি :—

একদা দেবগণ দিবসকে আশ্রয় করিয়াছিলেন ও অসুরেরা রাত্রি আশ্রয় করিয়াছিল। তাঁহারা (উভয়ে) সমান-বীর্য্য হইয়াছিলেন ও কেহ কাহাকেও পরাভূত করিতে পারেন নাই। ইন্দ্র বলিলেন, কে আমার সহিত (একযোগে) এই অসুরদিগকে এই রাত্রি হইতে অপসারিত করিবে। কিন্তু তি'ন দেবগণের মধ্যে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। রাত্রির অন্ধকারকে তাঁহারা মৃত্যুর মত ভয় করিয়াছিলেন। সেই নিমিত্ত এখনও লোকে রাত্রিকালে (গৃহ হইতে) কিঞ্চিৎ বাহিরে আসিয়াই ভয় পায় ; (কেননা) রাত্রি অন্ধকার এবং মৃত্যুরই মত।

কেবল ছন্দেরা ইন্দ্রের অনুগমন করিয়াছিল। সেইজন্য ইন্দ্র এবং ছন্দোগণ (অতিরাত্র ক্রতুতে) রাত্রির কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। (উহাতে) নিবিৎ বা পুরোরুক্ বা ধায্যা বা অন্য দেবতার উদ্দিষ্ট শস্ত্র পঠিত হয় না, কেবল ইন্দ্রই ছন্দোগণের সহিত রাত্রির কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। (রাত্রিতে অনুষ্ঠিত) পর্য্যায় সকল দ্বারাই তাঁহারা (যাগভূমি) পরিক্রমণ করিয়া অসুরদিগকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন। পর্য্যায়সমূহ দ্বারা পর্য্যায় (পরিক্রমণ) করিয়া উহাদিগকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন। উহাই পর্য্যায়-সকলের পর্য্যায়ত্ব। প্রথম পর্য্যায়দ্বারা পূর্ব্বরাত্র হইতে,

মধ্য পর্য্যায়দ্বারা মধ্যম রাত্র হইতে ও শেষ পর্য্যায়দ্বারা শেষরাত্র হইতে উহাদিগকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন।

ছন্দেরা বলিয়াছিল (অহে ইন্দ্র) আমরাই শর্ব্বরী (রাত্রি) হইতে (অসুরদিগকে নিরাকৃত করিবার জন্য) তোমার অনুগমন করিয়াছি। এইজন্যই ঐ ছন্দগুলিকে অপিশর্ব্বর নাম দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্র রাত্রির অন্ধকারকে মৃত্যুর মত ভয় করিয়াছিলেন; ঐ ছন্দেরাই তাঁহাকে সেই ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন। ইহাই অপিশর্ব্বরের (তন্নামক ছন্দের) অপিশর্ব্বরত্ব।

যজ্ঞের তিনটি সংস্থা। সোম সংস্থায় সাতটি যাগ—অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উকথ্য, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র এবং আপ্তোর্যাম। অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস আগ্রয়ণ, চাতুর্ম্মাস্য ও পশুবন্ধ নামক সপ্তযাগ হবিসংস্থা; আর সায়ংহোম, প্রাতর্হোম, স্থালীপাক, নবযজ্ঞ, বৈশ্বদেব, পিতৃযজ্ঞ ও অষ্টকা পাকসংস্থা।

একদিবস সাধ্য যাগকে একাহ, কয়েক দিবস সম্পাদ্য যজ্ঞগুলি অহীন, বারদিন বা তাহার অধিক দিন ব্যাপিয়া যে যজ্ঞ হয় তাহাকে সত্র বলে। দ্বাদশাহ নামক সত্র বার দিনের, গবাময়ন নামক সত্র সংবৎসরের অনুষ্ঠান।

বাজপেয় যজ্ঞ শরৎকালের অষ্টাদশ দিবসে আরম্ভ হয়। ঋত্বিকগণের কণ্ঠে হিরণ্যমালা পরাইয়া যজমান প্রার্থনা করেন :—

দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়।
দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাজং নঃ স্বদতু স্বাহা।

হে সবিতৃদেব, আমি বাজপেয় অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, আপনি আমাকে প্রেরণা দিন। আপনি যজ্ঞপতি, আমাকে ঐশ্বর্য্য দিন। আপনি

আমাদের অন্নকে পবিত্র করুন, আপনার প্রসাদে প্রজাপতি আমাদের অন্ন সুমিষ্ট করুন। এই যজ্ঞ শুদ্ধ হউক।

বাজপেয়ে অগ্নিষ্টোম তিনবার অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সপ্তদশ ছাগবলি হয় সুরাগ্রহ এবং মধুগ্রহ দিয়া ইহাতে ইন্দ্রের হবন করিতে হয়। সুরা বাজ হইতে প্রস্তুত হইত বলিয়া ইহাকে বাজপেয় বলে। প্রথমে বৃহস্পতিসব, মধ্যে বাজপেয় এবং পরে পুনরায় বৃহস্পতিসব যজ্ঞ সম্পাদিত হয়। এই যজ্ঞে নানাবিধ সুরা দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া হবি দেওয়া হয়। যজ্ঞান্তে রাজা রথে আরোহণ করেন এবং দুন্দুভি প্রভৃতি নিনাদে সাম্রাজ্যাভিষেক এবং সম্রাটস্থপতি ঘোষণা হয়। এই মন্ত্রে আহুতি হয়ঃ—

বাজস্যেমং প্রসবঃ সুষুবেঽগ্রে সোমং রাজানমোষধীষ্প্সু।
তা অস্মভ্যং মধুমতীর্ভবন্তু বয়ং রাষ্ট্রে জাগৃয়াম পুরোহিতাঃ স্বাহা ॥৯॥২৩॥
বাজস্যেমাং প্রসবঃ শিশ্রিয়ে দিবমিমাং চ বিশ্বা ভুবনানি সম্রাট্।
অদিৎসন্তং দাপয়তি প্রজানন্ স নো রয়িং সর্ব্ববীরং নিযচ্ছতু স্বাহা ॥ ৯॥২৪॥
বাজস্য নু প্রসব আবভূবে মা চ বিশ্বা ভুবনানি সর্ব্বতঃ।
সনেমি রাজা পরিযাতি বিদ্বান্ প্রজাং পুষ্টিং বর্দ্ধয়মানো অস্মে স্বাহা ॥৯॥২৫
সোমং রাজানমবসেঽগ্নিমন্বা রভামহে।
আদিত্যান্ বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিং স্বাহা ॥ ৯॥২৬॥
অর্য্যমণং বৃহস্পতিমিন্দ্রং দানায় চোদয়।
বাচং বিষ্ণুং সরস্বতীং সবিতারঞ্চ বাজিনং স্বাহা ॥ ৯॥২৭॥
অগ্নে অচ্ছা বদেহ নঃ প্রতি নঃ সুমনা ভব।
প্র নো যচ্ছ সহস্রজিত্ত্বং হি ধনদা অসি স্বাহা ॥ ৯॥২৮॥
প্র নো যচ্ছত্বর্য্যমা প্র পূষা প্র বৃহস্পতিঃ প্র বাগ্দেবী দদাতু নঃ স্বাহা ॥
৯॥২৯॥

হে প্রজাপতি! আপনার নিকট হইতে প্রেরণা পাইয়া প্রজা-পালনের জন্য এই যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলাম। হে বিষ্ণো! আপনি ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়া বিরাজ করেন। আপনি সর্ব্ব অন্নের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনার প্রেরণাতে এই যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছি, অতএব আমাকে প্রজা রক্ষার জন্য ধন রত্ন পুত্রাদি দান করিয়া আমার প্রদত্ত আহুতি গ্রহণ করুন। যিনি সমস্ত অন্ন উৎপাদন করেন, যিনি প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত পৃথিবীর অন্তঃর্বহি বিরাজমান, যিনি সর্ব্বাদি নৃপতি, যিনি প্রকৃত বিদ্বান, যিনি সর্ব্বশক্তিমান, যিনি বহুকাল অবধি আমার প্রজাসম্পদ বৃদ্ধি করেন, আপনি সেই পরমেশ্বর বিষ্ণু, আপনার জন্য অর্পিত আহুতি আপনি গ্রহণ করুন। যিনি সমস্ত জগতের উৎপাদক এবং যে প্রজাপতি আমাকে প্রতিপালন করিবার জন্য ইন্দ্র-সোম-বৈশ্বানর-অগ্নিও দ্বাদশ আদিত্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যে প্রজাপতি সূর্য্য-বৃহস্পতি প্রভৃতি দেবগণকে স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করেন, তাঁহাকে আহ্বান করিয়া তাহার গ্রহণের জন্য আহুতি দিতেছি।

হে পরমেশ্বর! অর্য্যমাদেবতা বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বাণীর অধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী, সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি, সূর্য্য যাহারা এই যজ্ঞে প্রয়োজনীয় অন্ন উৎপাদন করেন, আপনি তাঁহাদের সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমাকে ধন দানের জন্য আপনি যাহাতে ইহাদিগকে প্রেরণা দেন। সেজন্য আপনার প্রীতির জন্য এই আহুতি অর্পণ করিতেছি। হে অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেব। এই যজ্ঞে আপনি আমার মঙ্গলের জন্য আশীর্ব্বাদ করুন, আমার প্রতি সদয় হউন। হে সর্ব্বজিৎ। আপনি সকলকে ধন প্রদান করেন। সেজন্য আপনার নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি। আপনি সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারেন। হে পরমাত্মন! আপনার

দয়ায় অর্য্যমা, পূষা, বৃহস্পতি, সরস্বতী সকলেই আমাকে অভীষ্ট প্রদান করুন। ইহার পর সপ্তদশ অক্ষরাত্মক সপ্তদশ আহুতি দ্বারা বাজপেয় যজ্ঞ সমাপ্ত হয়।

ফাল্গুনী শুক্লা দশমীতে আরম্ভ করিয়া দশ দিনে দশ জন সোমযাজী ঋত্বিক্‌গণের দ্বারা বিজয়কাম রাজা রাজসূয় যজ্ঞ করেন। নানাস্থানের সলিল-সম্ভারে সপ্তদশ কলসের জলে রাজার রাজ্যাভিষেক হয়।

অধ্বর্য্যু যজমানের দক্ষিণ বাহু স্পর্শ করিয়া মন্ত্র পড়েন :—

"সবিতা ত্বা সবানাং সুবতামগ্নির্গৃহপতীনাং সোমো বনস্পতীনাম্
বৃহস্পতির্বাচ ইন্দ্রো জ্যৈষ্ঠায় রুদ্র পশুভ্যো মিত্র সত্যো
বরুণো ধর্ম্মপতীনাম্।"

হে যজমান, সবিতা তোমাকে আজ্ঞাদানে অধিকারী করুন, অগ্নি তোমাকে গৃহপতিদের আধিপত্য দিন, সোম বনস্পতিদের উপর প্রাধান্য প্রদান করুন। বৃহস্পতি তোমাকে বাক্যের অধিপতি, ইন্দ্র তোমাকে শ্রেষ্ঠ, রুদ্র পশুপাল, মিত্র তোমাকে সত্যপালয়িতা এবং বরুণ তোমাকে ধর্ম্মপতি করুন।

সমস্ত নৃপতিগণকে ডাকিয়া এই যজ্ঞে বিশেষ সমারোহ হইত। যজ্ঞ শেষে অধ্বর্য্যু রাজাকে যে উপদেশ দিতেন, তাহা অতিশয় সুন্দর :—

নিষসাদ ধৃতব্রতো বরুণঃ পস্ত্যাস্বা সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ।

হে যজমান! তুমি প্রজাপালনে ধৃতব্রত হও, তুমি সমস্ত অকল্যাণ দূর করিয়া বরুণের মত অনিষ্ট নিবারক হও। তোমার সঙ্কল্প শোভন হউক। তুমি প্রজাপালনে ব্যবহিতচিত্ত ধৃতব্রত সম্রাট্ হও।

সমস্ত যজ্ঞের বর্ণনা দিতে গেলে একখানি বিরাট মহাভারত লিখিতে হয়। সংক্ষেপে অশ্বমেধ ও পুরুষমেধ বলিয়া শ্রৌত যজ্ঞের কথা শেষ করিব। ফাল্গুনী শুক্লাষ্টমীতে অশ্বমেধ হয়। ইহা সম্পন্ন করিতে এক

বৎসর সাতাশি দিন লাগে। কলিযুগে ইহা নিষিদ্ধ হইলেও জয়পুরের মহারাজা ইহার অনুষ্ঠান করেন। গুপ্তবংশের সমুদ্রগুপ্তই ইহার শেষ অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে ঘোড়াকে বলি দিয়া তাহার মাংস-ভক্ষণ করা হইত। কিন্তু যে সে ঘোড়া নয়—তাহার গা মেঘের মত, মুখ সোনালি, উভয় পার্শ্ব অর্দ্ধচন্দ্রাকার চিহ্নে চিহ্নিত, পুচ্ছ বিদ্যুৎপ্রভ। সর্ব্বাঙ্গসুরভিময় বেগবান্ ও তেজস্বী এইরূপ অশ্ব দুর্লভ ছিল। প্রথমে উনিশটি যজ্ঞ করিয়া অশ্বের কপালে জয়পত্র বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। যদি কেহ বাধা দিত, তাহাকে জয় করিতে হইত। রাজা সুদাস, বৈবস্বত মনুর পুত্র শর্য্যাতি, ভরত, মরুত্ত, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অনেকে এই যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

এই যজ্ঞে যেসব প্রশ্নোত্তর হইত তাহা অতি চমৎকার। উদ্গাতা ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিতেন :—

কো অস্য বেদ ভুবনস্য নাভিং কো দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্।

কঃ সূর্য্যস্য বেদ বৃহতো জনিত্রং কো বেদ চন্দ্রমসং যতোজাঃ। ২৩।৫৯

ব্রহ্মার উত্তর :—বেদাহমস্য ভুবনস্য নাভিং বেদ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষম্

বেদ সূর্য্যস্য বৃহতো জনিত্রমথো বেদ চন্দ্রমসং যতোজাঃ

যজমান অধ্বর্য্যুকে প্রশ্ন করিতেন :—

পৃচ্ছামি ত্বা পরমন্তং পৃথিব্যাঃ পৃচ্ছামি যত্র ভুবনস্য নাভিঃ।

পৃচ্ছামি ত্বা বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতঃ পৃচ্ছামি বাচঃ পরমং ব্যোম। ২৯।৬১

অধ্বর্য্যুর উত্তর :—ইয়ং বেদিঃ পরো অন্তঃ পৃথিব্যা অয়ং যজ্ঞো ভুবনস্য নাভিঃ।

অয়ং সোমো বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতো ব্রহ্মায়ং বাচঃ পরমং ব্যোম। ২৯।৬২

উদ্গাতা বলেন—কে জানে ভুবনের নাভি কোথায়? কে জানে

স্তাবা পৃথিবী, কে জানে অন্তরিক্ষ? কে সূর্য্যের মহৎ জন্মের কথা জানে? কে জানে চন্দ্রমা কোথায় উৎপত্তি হয়?

ব্রহ্মা উত্তর দেন—আমি জানি ভুবনের নাভি, স্তাবা পৃথিবী, অন্তরিক্ষ। সূর্য্যের বৃহৎ জন্ম, চন্দ্রমার উৎপত্তি-কথা সবই আমি জানি।

যজমান। হে অধ্বর্য্যু পৃথিবীর শেষ সীমা কোথায়, কোথায় ভুবনের নাভি? কোথায় এই বলশালী অশ্বের বীর্য্য, কোথায় বাক্যের পরম ব্যোম।

অধ্বর্য্যু। এই উত্তর বেদী পৃথিবীর অন্ত, এই যজ্ঞ ভুবনের নাভি। এই সোম অশ্বের বীর্য্য, ত্রিবেদজ্ঞ ব্রহ্মা বেদের পরম ব্যোম।

জীবন্মুক্তির জন্য পুরুষমেধ যজ্ঞ হইত। চৈত্রের শুক্লাদশমীতে এই যজ্ঞারম্ভ করিয়া চল্লিশ দিনে শেষ হয়। ইহাতে এয়োবিংশ দীক্ষা, দ্বাদশ উপসদ্ এবং পঞ্চস্তুতি আছে। ইহাতে একাদশ যূপে একাদশটি পশু বাঁধিয়া মধ্যে মধ্যে ১৮৪ জন পুরুষ বলি দিতে হইত। কিন্তু ইহাতে আসলে কোনও নরবলি হইত না। ইহার আরম্ভ মন্ত্রগুলি এই কথার পোষকতা করে।

দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়।
দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতং ন পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাচং
নঃ স্বদতু ॥ ৩০ ॥ ১ ॥

তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভার্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো য়ো নঃ
প্রচোদয়াৎ ॥ ৩০ ॥ ২ ॥

বিশ্বানি দেব সবিতর্দ্দুরিতানি পরাসুব যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব ॥
৩০ ॥ ৩ ॥

বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ সবিতারং নৃচক্ষসম্ ॥
৩০ ॥ ৪ ॥

হে জগতের প্রেরণাকারী দেব! আমার বিভবকামী নয়নপথে ঐশ্বর্য্যের উপায়ের জন্য যজ্ঞ প্রেরণ করুন। হে যজ্ঞেশ্বর! যজ্ঞ করিবার ক্ষমতা আমাকে দিন। হে দিব্যস্বরূপ গন্ধর্ব্ব! আপনি জ্ঞানদান করিতে পারেন, আমাকে পবিত্র জ্ঞানদান করুন। হে বাচস্পতি, আমার বাক্যকে মধুময় করুন। সেই সবিতৃদেবের বীর্য্য ও কল্যাণকে ধ্যান করি, তিনি আমাদের ধীতে প্রেরণা দেন। হে দেবতা, সকল পাপ নিবারণ কর। যাহা ভদ্র, তাহা আমাদিগকে দাও, আমরা সবিতাকে আহ্বান করি, তিনি সর্ব্বধনের বিভক্তা, শুভাশুভের দ্রষ্টা।

ইহা ছাড়া আরও যজ্ঞ ছিল। শুক্লযজুর্ব্বেদে পুত্রকামীর জন্য পিণ্ড পিতৃযজ্ঞের বিধান আছে। ফাল্গুন, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্রের শুক্ল পূর্ণিমাতে উদ্‌যাপ্য চার্তুম্মাস্য যাগের বিবরণ আছে। অগ্নিচয়ন, শতরুদ্রীয় ষোম, কোকিলসৌত্রামনী যজ্ঞ, সর্ব্বমেধ যজ্ঞ এবং পিতৃমেধ যজ্ঞের কথা আছে।

শুক্ল যজুর শান্তি পাঠ মন্ত্র দিয়া এই শ্রৌতযজ্ঞ কথা শেষ করি :—

ঋচং বাচং প্রপদ্যে মনো যজুঃ প্রপদ্যে সাম প্রাণং
প্রপদ্যে চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপদ্যে।
বাগোজঃ সহৌজো ময়ি প্রাণাপানৌ॥

যন্মে ছিদ্রং চক্ষুষো হৃদয়স্য মনসো বাতিতৃণ্ণং বৃহস্পতির্ম্মেতদ্দধাতু।
শং নো ভবতু ভুবনস্য যস্পতিঃ।

ভূর্ভুবঃ স্ব তৎ সবির্তুবরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।

কয়া নশ্চিত্র আভুবদূতী সদাবৃধঃ সখা কয়া শচিষ্টয়া বৃতা
কস্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্টো মৎসদ ন্ধসঃ দৃঢ়া চিদারুজে বসু
অভী ষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাম শতং ভবাস্যূতিভিঃ।

কয়া ত্বং ন উত্যাভি প্রমন্দসে বৃষন্ কয়া স্তোতৃভ্য আভর।
ইন্দ্রো বিশ্বস্য রাজতি শংনো অস্তু দ্বিপদে শং চতুষ্পদে।
শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্য্যমা।
শং নো ইন্দ্রো বৃহস্পতি শং নো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ।
শংনো বাতঃ পবতাং শং নস্তপতু সূর্য্যঃ
শংনো কনিক্রদদ্দেবঃ পর্জ্জন্যো অভিবর্ষতু
অহানি শং ভবন্তু নঃ শং রাত্রি প্রতিধীয়তাম্।
শংনো ইন্দ্রাগ্নি ভবতামবোভিঃ শং ন ইন্দ্রাবরুণা রাতহব্যা।
শং ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ শমিন্দ্রানোমা সুবিতায় শং যোঃ॥

শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে
শং যোরভিস্রবন্তু নঃ। ১২

স্যোনা পৃথিবি নো ভবানৃক্ষরা নিবেশনী
যচ্ছা নঃ শর্ম্ম সপ্রথাঃ। ১৩

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন
মহে রণায় চক্ষসে। ১৪

যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তি হ নঃ উশতীরিব মাতরঃ। ১৫

তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ
আপো জনয়থা চ নঃ। ১৬

দ্যৌ শান্তিরন্তরিক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ শান্তিরোষধয়ঃ শান্তিঃ।
বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বে দেবাঃ শান্তির্ব্রহ্ম শান্তি সর্ব্বং শান্তি
শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি। ১৭.

দৃতে দৃংহ মা মিত্রস্য মা চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষন্তাম্।
মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্ব্বাণি ভূতানি সমীক্ষে। মিত্রস্য চক্ষুষা
সমীক্ষামহে। ১৮

দৃতে দৃংহ মা জ্যোক্তে সন্দৃশি জীব্যানং জ্যোক্তে সংদৃশি জীব্যাসম্। ১৯
নমস্তে হরসে শোচিষে নমস্তে অস্ত্বর্চিষে।
অন্যাংস্তে অস্মত্তপন্তু হেতাঃ পাবকো অস্মভ্যং শিবো ভব। ২০
নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে
নমস্তে ভগবন্নস্তু যতঃ স্ব সমীহসে। ২১
যতো যতো সমীহসে ততো নো অভয়ং কুরু।
শং নঃ কুরু প্রজাভ্যোঽভয়ং নঃ পশুভ্যঃ। ২২
সুমিত্রিয়া ন আপঃ ওষধয়ঃ সন্তু দুর্মিত্রিয়াস্তস্মৈ সন্তু।
যোঽস্মান্দ্বেষ্টি যং চ বয়ং দ্বিষ্মঃ। ২৩
তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃশতং।
শৃণুয়াম শরদঃশতং প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম।
শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ॥ ২৪

এই শান্তি পাঠ ত্রয়ীর শরণ লইয়া ত্রুটিক্ষালনের প্রার্থনা জানায়। গায়ত্রী অনুধ্যান করিয়া দেবতাদের কল্যাণ যাচ্ঞা করে এবং বিশ্বের সকলের কল্যাণ ও শান্তি কামনা করে। শিবতমের সঙ্গে যোগ রাখিয়া শতবর্ষ ব্রতসুন্দর, কর্ম্মসুন্দর আনন্দরায় জীবন যাপন করিতে চায়। আড়ম্বর ও অনুষ্ঠানের জটিলতার মাঝে এই সকল হৃদ্য ও প্রীতিকর স্তোত্র ও মন্ত্রের কথা যখনই ভাবি, তখনই ইহাদের আধ্যাত্মিকতা, ইহাদের কবিত্ব ও রসগভীরতা অনুভব করিয়া মুগ্ধ হই।

কালের প্রবাহে মানুষের অন্তরে পরিবর্ত্তন আসিল। তাহারা শ্রুতিজাত যাজ্ঞিকী ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বর ও বাহুল্যে বীতশ্রদ্ধ হইল, তখন যজ্ঞের আধ্যাত্মিক দিকে মনীষীদের দৃষ্টি পড়িল। উপনিষদের জ্ঞানকাণ্ড যে ভাগবত জীবনের তত্ত্ব প্রচার করিয়াছিল, সেই সমুদায়

ভাগবতোপলব্ধি দিয়া দার্শনিকেরা যজ্ঞের রহস্য ব্যাখ্যা করিলেন। গীতায় পার্থসারথি যজ্ঞের যে সুমধুর আধ্যাত্মিক রূপ দিয়াছেন, তাহা ভাবে ও কল্পনায় অতুলনীয়। তিনি যে সামঞ্জস্য করিয়াছেন, তাহা নূতন হইলেও পুরাতনকে বর্জ্জন করিয়া সনাতনপন্থীদের মনে বিদ্রোহ জাগায় নাই। তাহার সুসঙ্গত ও সুন্দর বিশ্লেষণ ভারতীয় ধর্ম্মজীবনে নূতন আলোক বিকিরণ করিয়া সকলের শ্রদ্ধার বিষয় হইয়া পড়িল।

গীতার মূলমন্ত্র—নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। নিরাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবার পন্থা বলিবার সময় ভগবান্ উপদেশ দিলেন :—

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় ! মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩।৯

যে কর্ম্ম যজ্ঞার্থ নয়, তাহা মানুষকে বন্ধন করে, অতএব মুক্তসঙ্গ হইয়া যজ্ঞার্থে কর্ম্ম কর। এই শ্লোকের শাঙ্কর ভাষ্য এই :—

"যচ্চ মন্যসে বন্ধার্থত্বাৎ কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিতি তদপ্যসৎ, কথম্ যজ্ঞার্থাদিতি। 'যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ' ইতি শ্রুতেঃ যজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ তদর্থং যৎ ক্রিয়তে তদ্ যজ্ঞার্থং কর্ম্ম তস্মাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র অন্যেন কর্ম্মণা লোকোঽয়মধিকৃতঃ কর্ম্মকৃৎ কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্ম বন্ধনং যস্য :সোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ লোকো ন তু যজ্ঞার্থাৎ, অতস্তদর্থং যজ্ঞার্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ কর্ম্মফলসঙ্গবর্জ্জিতঃ সন্ সমাচর নির্ব্বর্ত্তয়।

ইহার পরের কয়েকটী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বৈদিক ধারণার প্রকাশ করিয়াছেন। যজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টি হইতে অন্ন হয়, অন্ন জীবগণের ধাতা ইত্যাদি। কিন্তু এই বৈদিক কল্পনাকে শ্রীকৃষ্ণ নূতন অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। যজ্ঞ ভাগবত কর্ম্ম—সমস্ত কর্ম্ম যখন আমরা ঈশ্বরোদ্দেশে করি তখনই যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করি। শঙ্কর গীতায় এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সমগ্র গীতা পড়িয়াও আমরা অনুরূপ অর্থ পাই। গীতা বৈদিক রীতি ও

প্রণালীকে আধ্যাত্মিকতার রসে পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। বৈদিক ঋষি পৃথিবীর লোকযাত্রায় দেখিলেন যজ্ঞচক্র—এখানে কিছুই নিঃসম্পর্কিত নয়। একে অন্যকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া চলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ এই যজ্ঞচক্রকে ভাবে ও সাধনায় ঋদ্ধ করিয়া সমস্ত কর্ম্মকে ঈশ্বরানুগত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডকে তিনি বেদান্তের জ্ঞানকাণ্ডের আশ্রয়ে পরিপূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে এই তত্ত্বকে তিনি সুব্যক্তরূপ দিয়াছেন :—

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥
সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মানি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপেযাজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথা পরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥
এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপঃ
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥
তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় জীবনবৃত্তের যে নূতন পথ নির্দ্দেশ করিলেন, সে পথ নিষ্কাম কর্ম্মের পথ—সংসারে কাজ করিব, অথচ লিপ্ত হইব না, যাহা পাইব তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব ; সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, জয় ও পরাজয় সুখ ও দুঃখ দুইই সমান হইবে। কিন্তু এই পথে চলা ত সহজ নহে।

এই পথে চলিবার কথায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—গতসঙ্গ মানুষ সংসারে উদাসীন হইয়া চলিবে না, তাঁহাকে কর্ম্ম করিতে হইবে। কিন্তু সে কর্ম্ম যজ্ঞের জন্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, তাহা হইলে আর বন্ধন হইবে না। যজ্ঞের নানা অঙ্গ। যজ্ঞে হোতা অর্পণ করেন। তিনি হবি অর্পণ করেন, অগ্নিতে সে হবি দেওয়া হয়। যিনি অর্পণ করেন, তিনি যজমান, আর এই হবন-ক্রিয়া সাধারণভাবে যজ্ঞ নামে অভিহিত হয়। নিষ্কাম কর্ম্মযোগী বাহিরের এই অনুষ্ঠানকে অন্তরের আধ্যাত্মিক ক্রিয়া করিয়া লইবেন।

তিনি যজমানকে ব্রহ্ম, অগ্নিকে ব্রহ্ম, ঘৃতকে ব্রহ্ম এবং আহুতিকে ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান করিবেন। সমস্ত যজ্ঞাঙ্গগুলিকে তিনি ব্রহ্মোপাসনার বলিয়া স্থির করিবেন, তাহা হইলে ব্রহ্মভাবনা দ্বারা তিনি পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবেন। কর্ম্ম যখন ঈশ্বরে অর্পিত, তখন তাহা যজ্ঞ। আর ঈশ্বরার্পিত এই কর্ম্ম মানুষকে স্তরে স্তরে উচ্চতর লোকে লইয়া যায়—

মানুষ মরজীবনেই অমৃতের আস্বাদ লাভ করে। বৈদিক যজ্ঞ কর্ম্ম-যজ্ঞ—দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আড়ম্বরময় অনুষ্ঠান, কিন্তু এই জ্ঞান-যজ্ঞ নিরুপাধি ব্রহ্মে আত্মার আহুতি।

তাহার পর নানা প্রকার যজ্ঞের কথা বলা হইতেছে। প্রথম সংযম যজ্ঞ—মানুষ এই যজ্ঞ দ্বারা চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার করিয়া লয়। বিষয় প্রতিনিয়ত মানুষের মনকে বাহিরে টানিতেছে, তাহাকে প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি প্রভৃতির দ্বারা ভিতরে টানিয়া লইতে হইবে। এই ইন্দ্রিয়-বিরতিই সংযম-যজ্ঞ। আবার কেহ কেহ বা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ করিয়াই যজ্ঞ করেন। রবীন্দ্রনাথ যে বলিয়াছেন, 'মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠুক জ্বলিয়া'—ইহা সেই ভাব। সাধক পৃথিবীকে বিসর্জ্জন দিয়া মুক্তি চাহেন না—পৃথিবীকে তিনি পার্থিবতা হইতে তুলিয়া দিব্য ভাগবত অনুভূতিতে ভাস্বর করিয়া তুলেন। যজ্ঞার্থেই তিনি ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করেন।

অপরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাইয়া দেন। আত্মসংযম-রূপ আগুনে তাহাদের হোম দেন। সে হোমে তাঁহারা সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও সমস্ত প্রাণকর্ম্মকে ঈশ্বরানুগত করিয়া দিয়া ঈশ্বরতন্ময় হইয়া যান।

ইহা ছাড়া কেহ দ্রব্যযজ্ঞ করেন—দেবতার উদ্দেশে দান করেন, কেহ বা তপস্যা করেন, কেহ বা যোগসাধন করেন, কেহ বা বেদপাঠ ও স্বাধ্যায় দ্বারা জ্ঞান-যজ্ঞ করেন। কেহ বা প্রাণায়াম করেন, কেহ বা আহারের সংযম করেন। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞ যাঁহারা জানেন, তাঁহারা সকলেই যজ্ঞবিদ্। বেদে এইরূপ আরও বহুবিধ যজ্ঞকথা আছে। সমস্ত যজ্ঞই কর্ম্মসমুদ্ভব। কায়িক, বাচিক ও মানসিক সমস্ত কর্ম্ম অনাসক্ত হইয়া অনুষ্ঠান করিলে, মানুষ মোক্ষ লাভ করে।

দ্রব্যযজ্ঞের চেয়ে জ্ঞান-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মমাত্রই জ্ঞানদ্বারা পরাকাষ্ঠা

লাভ করে। যে কর্ম্ম জ্ঞানে প্রোজ্জ্বল নয়, তাহা কল্যাণকর নয়। কর্ম্ম জ্ঞানেই পরমপূর্ণতা লাভ করে। এই জ্ঞানের জন্য জিজ্ঞাসু হইয়া গুরুর নিকট যাইতে হইবে। তাহার পর শ্রদ্ধা ও সেবা ও পরিপ্রশ্নে তাহাকে তৃপ্ত করিয়া এই জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এই জ্ঞান লাভ হইলে, সকল জীবকে নিজের অন্তরাত্মার এবং পরে পরমাত্মার মধ্যে দেখিতে পাইবে। জ্ঞানের নৌকা ভবনদী পার হইবার শ্রেষ্ঠতম উপায়। জ্ঞান সমস্ত কর্ম্মকে ভস্ম করিয়া ফেলে এবং সাধককে পরামুক্তি দেয়।

ইহার যে ব্যাখ্যা শ্রীঅরবিন্দ দিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ তুলিতেছি—

"The offering of the striver after perfection may be material and physical, dravya-yajna, like that consecrated in worship by the devotce to his deity or it may be the austerity of his self-discipline and energy of his soul directed to some high aim, tapo-yajna or it may be some form of yoga like the Pranayama of the Rajayogins and Hathayogins or any other Yoga-yajna. All these tend to the purification of the being; all sacrifice is a way towards the attainment of the highest.

The one thing needful, the saving principle constant in all these variations is to subordinate the lower activities, to diminish the control of desire and replace it by a superior energy, to abandon the purely egoistic enjoyment for that divine delight which comes by sacrifice, by self-dedication, by self-mastery, by the giving up of one's lower impulses to a greater and higher aim. "They who enjoy the nectar of immortality left over from the

sacrifice, attain to the eternal Brahma." Sacrifice is the law of the world and nothing can be gained without it, neither the mastery here, nor the possessions of heavens beyond, nor the supreme possession of all; this world is not for him who doeth not sacrifice, how then any other world?" Therefore all these and many other forms of sacrifice have been "extended in the mouth of Brahman," the mouth of that fire which receives all offerings; they are all means and forms of one great Existence in activity, means by which his inmost self is one. They are all 'born of work,' 'all born of work' all proceed from and are ordained by the one vast energy of the Divine which manifests itself in the universal Karma and makes all the cosmic activity a progressive offering to the one Self and Lord and of which the last stage for the human being is self-knowledge and the possession of the divine or Brahmic consciousness. "So knowing thou shall become free."

শ্রীকৃষ্ণ বলেন—মানুষের জীবনের প্রত্যেক কর্ম্মই যজ্ঞ। আমরা যাহা কিছু করিব, সকলই যজ্ঞের সুরে মিলাইয়া করিব। সে সুর আধ্যাত্মিকতার সুর, আত্মসমর্পণের বা ত্যাগের সুর। যজ্ঞের মূলগত অর্থ ত্যাগ, ত্যাগের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ভোজন করিতে হইবে। ইহাই হবিঃশেষ ভোজন, ইহাই যজ্ঞাশিষ্ট অমৃত। এই অমৃতের সন্ধান যাহারা পায়, তাহারাই হীনতার পঙ্ক হইতে মহত্ত্বের পাদপীঠে উন্নীত হয়। তাহারা পশু-জীবন ত্যাগ করিয়া দেবজন্ম লাভ করে—তাহারাই দ্বিজত্ব লাভ করে। এই সর্ব্বজীবনব্যাপী ত্যাগযজ্ঞের মর্ম্ম উদ্ভাবন করেন বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ দেবতাতে পরিণত হন। এই প্রসঙ্গে পঞ্চযজ্ঞের কথাটি

বলা কর্ত্তব্য। গৃহস্থের পাঁচটি নিত্যকর্ত্তব্য আছে, তাহাকে মহাযজ্ঞ বলা মহাযজ্ঞ বলে। মনুষ্য জন্মমাত্রেই পাঁচটি ঋণে আবদ্ধ হয়।ः সততি যুগে প্রথমে তিন ঋণের কথা চলিত ছিল। 'জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণ। দিনে ঋণবান্ জায়তে।' পরে ইহা পঞ্চ ঋণে পরিণত হইয়াছে। ত

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমোদৈব বলির্ভৌত নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্।

যথাবিধি বেদাধ্যাপনের নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যথারীতি শ্রদ্ধাতর্পণাদির নাম পিতৃযজ্ঞ, দেবতাদিগের উদ্দেশে হোমাদি অনুষ্ঠান দৈবযজ্ঞ, যথাবিধি বলিদান ভৌতযজ্ঞ এবং অতিথিসেবার নাম নৃযজ্ঞ।

পঞ্চযজ্ঞ সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দরের অতিসুন্দর কথাগুলি তুলিতেছি :—

"দেবগণ মানুষের ভাগ্যবিধাতা; পিতৃগণ তাঁহাকে মানবজন্ম দিয়াছেন; ঋষিগণ যে বিদ্যা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, সেই বিদ্যাই তাহাকে উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জন্মের অধিকারী করিয়াছে; বন্ধু প্রতিবেশী হইতে সমাজের যাবতীয় ব্যক্তি তাহাকে রক্ষা করিতেছেন; পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত কোন না কোনরূপে তাহার জীবন-রক্ষার সাহায্য করিতেছে। অতএব ইহাদের সকলের নিকটেই ঋণ আছে, এই পাঁচটী ঋণ লইয়াই মানুষকে জন্মিতে হয়। ঋণের বোঝা ফেলিয়া রাখিয়া জীবনযাত্রাটা দুষ্কর্ম্ম। জীবন ব্যাপিয়া এই ঋণ-শোধের চেষ্টা করিতে হইবে। এক-একটা ঋণ-শোধের চেষ্টার অভ্যাস এক-একটা যজ্ঞ। প্রত্যেক যজ্ঞেই কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন, "যদগ্নৌ জুহোতি অপি সমিধং, তৎ দেবযজ্ঞ সন্তিষ্ঠতে"—দেবতার উদ্দেশ্যে আগুনে অন্ততঃ একখানা সমিৎ ফেলিয়া দিলেও দেবযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। "যৎ পিতৃভ্যঃ স্বধা করোতি অপি অপঃ,

তৎ পিতৃযজ্ঞ সন্তিষ্ঠতে”—পিতৃগণের উদ্দেশ্যে অন্ততঃ এক গণ্ডুষ জল দিলেও পিতৃযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। “যদ্ ভূতেভ্যো বলিং হরতি, তদ্ ভূতযজ্ঞ সন্তিষ্ঠতে”—ভূতগণের অর্থাৎ পশুপক্ষীর উদ্দেশ্যে কিঞ্চিৎ অন্ন দিলেই ভূতযজ্ঞ সম্পন্ন হয়।

“যদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো অন্নং দদাতি, তন্মনুষ্যযজ্ঞঃ সন্তিষ্ঠতে”—ব্রাহ্মণ অতিথিকে কিছু অন্ন দিলেই মনুষ্যযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। “যৎ স্বাধ্যায়ং অধীয়ীত একামপি ঋচং, যজুঃ, সাম, বা তদ্ ব্রহ্মযজ্ঞ সন্তিষ্ঠতে”—বেদাধ্যয়ন করিলে, অন্ততঃ একটী ঋক্, একটী যজু, বা একটী সাম অধ্যয়ন করিলে ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। গৃহস্থের এই নিত্যযজ্ঞের অনুষ্ঠানে কোনরূপ জটিলতা নাই; কার্য্যতঃ বেদপন্থী সমাজের অধিকাংশ গৃহস্থ অদ্যাপি এই পাঁচটী যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

গৃহস্থমাত্রেরই এই যজ্ঞ কয়টী কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জগতে তিনি যে একাকী আসেন নাই এবং একা যাইবেন না, সমস্ত জগতের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক বাঁধা আছে, সমস্ত জগৎ যে তাঁহাকে একযোগে স্থির-প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, এইটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া জগতের যাবতীয় প্রাণীর নিকটে ঋণ-স্বীকারে তিনি বাধ্য আছেন এবং প্রত্যহ কোন না কোন অনুষ্ঠান শ্রদ্ধার সহিত সম্পন্ন করিয়া, আমি যে ঋণী, এইটী সর্ব্বদা মনে রাখিতে বাধ্য আছেন। বস্তুতঃ এই ঋণ কেহই শোধ করিতে পারে না; তবে এই ঋণটা স্বীকার না করিলে জগদ্ব্যবস্থার প্রতি, বিশ্বব্যাপারের প্রতি, ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞা দেখান হয়। মানব, বিশ্ব ব্যাপারকে তুমি প্রণাম কর; এবং এই অভিপ্রায়ে প্রত্যহ কিছু না কিছু ত্যাগ-স্বীকার অভ্যাস কর। ব্যাপক অর্থে ত্যাগেরই নামান্তর যজ্ঞ। এস্থলে সমস্ত জগৎটাই দেবতা জগতে যাহা কিছু আছে, সবই দেবতা। প্রত্যেকের নিকট মানুষ ঋণী এবং সেই ঋণ স্বীকারার্থ প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার

করিয়া যজ্ঞ করিতে হইবে। শাস্ত্রে এই পাঁচটী যজ্ঞকে মহাযজ্ঞ বলা হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলেন, "পঞ্চ বা এতে মহাযজ্ঞাঃ সততি প্রতায়ন্তে, সততি সন্তিষ্ঠন্তে"—এই পাঁচটী মহাযজ্ঞ সতত অর্থাৎ দিনে দিনে অনুষ্ঠান করিতে হইবে, সতত অর্থাৎ দিনে দিনে সমাপ্ত করিতে হইবে। কৌতুক এই যে, ঋষিযজ্ঞকে সকল যজ্ঞের উপরে, এমন কি দেব-যজ্ঞের উপরেও স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই ঋষিযজ্ঞ বেদাধ্যয়ন বা বিদ্যার্জ্জন; ইহার নামান্তর ব্রহ্মযজ্ঞ। এই বিদ্যার যাঁহারা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহারাই ঋষি, তাঁহারাই বেদপন্থী সমাজের বিশিষ্ট culture-এর প্রতিষ্ঠাতা; ঐ সমাজের যাহা প্রাণ, তাহারই প্রতিষ্ঠাতা। তৈত্তিরীয় আরণ্যক বলিতেছেন, "সমাজের সেই আদিম প্রতিষ্ঠাতারা তপস্যা করিলে স্বয়ং স্বয়ম্ভু তাহাদের সম্মুখে আসিলেন এবং তাঁহাদিগকে ব্রহ্মযজ্ঞের উপদেশ দিলেন। তদবধি তাহারা ঋষি হইলেন। বেদপন্থী সমাজের প্রত্যেক গৃহস্থ সেই ঋষিগণের নিকট হইতে সেই বেদবিদ্যাকে পাইয়াছেন, এবং তাঁহাকে রক্ষা করিতে বাধ্য আছেন। রক্ষার জন্য প্রত্যহ অধ্যয়ন আবশ্যক এবং এই অধ্যয়নই ব্রহ্মযজ্ঞ। যজ্ঞ-সম্পাদনে নানা সরঞ্জাম আবশ্যক, নানা অনুষ্ঠান আবশ্যক। শতপথ ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "এই যে ব্রহ্মযজ্ঞ, বাক্যই ইহার জুহূ, মন ইহার উপভৃৎ, চক্ষু ইহার ধ্রুবা, মেধা ইহার স্রুব, সত্যই ইহার অবভৃথ স্নান, স্বর্গলোক ইহার উদয়ন বা সমাপ্তি। ঋগ্ মন্ত্র এই যজ্ঞের ক্ষীরাহুতি, যজুর্মন্ত্র ইহার আজ্যাহুতি, সামমন্ত্র ইহার সোমাহুতি, অথর্ব্বাঙ্গিরস মন্ত্র ইহার মেদাহুতি, পুরাণ-ইতিহাসাদি ইহার মধু-আহুতি। জল চলিতেছে, আদিত্য চলিতেছেন, চন্দ্রমা চলিতেছেন, নক্ষত্রেরা চলিতেছে। ইহাদের গতিক্রিয়া ক্ষান্ত হইলে জগদ্ যন্ত্রের যে অবস্থা হয়, গৃহস্থ যে দিন অধ্যয়ন না করেন, তাহার গৃহেরও সেই অবস্থা ঘটে।"

যজ্ঞতত্ত্ব শ্রদ্ধায় বুঝিতে হইবে। পরিপ্রশ্ন এবং প্রণিপাতের দ্বারা ভারতের সভ্যতার এই মর্ম্মধারাকে অনুধ্যান করিতে হইবে। ইহা সহজে বোঝা যায় না—সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া, শ্রদ্ধালু হইয়া এই তত্ত্ব ধ্যান ধারণা এবং নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।

ভারতীয় সাধনা মানুষকে পশুর জীবন-যাপন করিতে দেখিয়া তাহাকে দেবত্বে আহ্বান করিবার জন্য বারংবার ডাক দিয়াছে। এই আহ্বান একদিন যজ্ঞধূম-পরিবৃত সরস্বতী-তীরে ধ্বনিত হইয়াছিল। ইহাই একদিন কুরুক্ষেত্রের প্রাঙ্গণে পার্থসারথির কণ্ঠে ঘোষিত হইয়াছিল এবং ইহাই বর্ত্তমান যুগের সাধক ও ঋষির কণ্ঠে পুনরায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

স্বার্থের বন্ধন মানুষকে ছোট করে। কেবল আত্মোদয়ের ভাবনা তাহাকে ক্লিষ্ট করে—তাই

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

এই পৃথিবী পরমাত্মায় বিধৃত। তিনি সমস্ত চরাচর পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন। অনাসক্ত হইয়া ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে। কোন ধনই কোনও ভাবে আকাঙ্ক্ষা করিও না, কারণ ধন বস্তুতঃ কাহারও নহে। ধন কেবলই হস্ত ত্যাগ করে, কাজেই তাহা আপন বলিয়া অভিমান অবিদ্যা। চরাচর সেই অমৃতময়ের নিলয়, ইহা জানিয়া সর্ব্বত্র পরমাত্মার অধিষ্ঠান অনুভব কর।

মানুষ স্বার্থের অচলায়তনে আবদ্ধ বলিয়া বিশ্বজগতের কর্ম্মের ধারা হইতে সে বিচ্ছিন্ন। আমরা যদি দেবজীবন চাই—তবে আমাদিগকে বিশ্বের জীবনের সহিত সুসঙ্গতি করিয়া চলিতে হইবে। এইভাবে ব্যক্তির জীবনকে বৃহতের সহিত যোগই যজ্ঞ। জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কর্ম্মকে

ক্ষুদ্র করিয়া দেখিলে আমরা হীন ও ছোট হই। তাহাদিগকে যখন বিশ্বকর্ম্মের সহিত সমঞ্জস করিয়া দেখি, তখনই তাহা যজ্ঞকর্ম্মে পরিণত হয়।

এই বিশ্বরূপ বৈশ্বানর। ইনি অগ্নিরূপে পৃথিবীতে পরিদৃশ্যমান। ইনিই আদিত্যরূপে জগৎ প্রকাশ করেন। এই বৈশ্বানরে আমাদের যাহা কিছু ক্লিন্ন, যাহা কিছু ক্ষুদ্র, তাহা আহুতি দিয়া, আমরা অমৃতের আস্বাদ লাভ করিব।

বৈদিক ঋষিরা মানবজীবনকে বৈশ্বানরের অগ্নিচয়নযজ্ঞ মনে করিতেন। মানুষ যদি ভোগের ফাঁদে পা ফেলে, তাহা হইলে সংসারে বিপ্লব বাধে। মানুষকে দিতে হইবে আত্মাহুতি—তবেই অমৃতের উদ্ভব হইবে।

জীবন ত কেবল জৈব কর্ম্ম নয়—ইহা বিশ্বদেবের পূজা, ইহা বৈশ্বানরের আহুতি। জীবনকে প্রতিমুহূর্ত্তে এই পূজায় নিরত রাখিতে হইবে। যাহা কিছু করিব—শয়ন, ভোজন, ভ্রমণ, উপবেশন—সব চেষ্টাকেই ভাগবত আরাধনায় পরিণত করিতে হইবে।

জীবনকে, পশুত্বকে এই চিন্ময় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিবার বিরাট আশা ভারতীয় ঋষিদের সুগভীর অবদান। পৃথিবী বারংবার পশুত্বের প্রবাহে ভাসিয়াছে, দানবিকতা অট্টহাসে মানুষকে বিদ্রূপ করিয়াছে, অন্যায় ও পাপ কুরুক্ষেত্র বাধাইয়াছে; কিন্তু সেই সমস্ত পিশাচ-তাণ্ডবের মধ্যেও বৈদিক কামনা আজিও অব্যাহত। তাহাদের ত্যাগের মন্ত্র অক্ষয়, তাহাদের সাধনা অবিকৃত।

আজ আবার এই শোণিত-ধারা-সিক্ত পৃথিবীতে ত্যাগযজ্ঞ আরম্ভ হউক। আবার অধ্বর্য্যু আহবনীয় অগ্নির উত্তরে তাহার যে আসন, সে সুখাসন ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ হস্তে জুহূ এবং বাম হস্তে উপভৃৎ ধারণ

করিয়া বেদীর উত্তর হইতে দক্ষিণে চলিয়া আসুন। আবার জলদগম্ভীর-স্বরে অগ্নীধ্র ঋত্বিককে আদেশ করুন :—

ওঁ শ্রাবয়!

হে অগ্নীৎ, তুমি দেবতাদিগকে মন্ত্র শুনিতে অনুরোধ কর। শতাব্দীর তন্দ্রা ঘোর হইতে জাগিয়া তিনি আবার বলুন :—

অস্তু শ্রৌষট্

হাঁ দেবতারা শুনিতেছেন।

তখন অধ্বর্য্যু আবার হোতাকে দেবতার আহ্বানে আদেশ করুন।

হোতা পড়ুন—যে যজামহে অগ্নিং দেবম্।

তাহার পর অনুবাক্যা ও যাজ্যা পড়ুন

অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাম সংগতানামুত্তমো বিষ্ণুরাসীৎ।
যজমানায় পরিগৃহ্য দেবান্ দীক্ষয়েদং হবিরাগচ্ছতং নঃ॥
অগ্নিশ্চ বিষ্ণো তপ উত্তমং মহো দীক্ষাপালায় বসতং হি শক্রা।
বিশ্বৈদেবৈর্যজ্ঞিয়ৈঃ সংবিদানৌ দীক্ষামস্মৈ যজমানায় ধত্তম্॥

এই রূপসমৃদ্ধ ঋকে যজ্ঞ সমৃদ্ধ করিয়া বলুন—

অগ্নে বীহি বৌষট্

আর তাহা শুনিয়া অধ্বর্য্যু আহুতি দিন।

যজমান ভক্তিগদ্গদচিত্তে বলুন—ইদম্ অগ্নয়ে ন মম।

ইহা অগ্নির—আমার নয়।

কিন্তু কি আহুতি দিব? দিব প্রাণ। কি যজ্ঞ করিব—বিশ্বযজ্ঞ। বিশ্বমানবের কল্যাণের জন্য হোমাগ্নি আবার জ্বলুক। আবার সোমরস-পানে আমরা আনন্দ-বিহ্বল হইয়া উঠি। আবার রোদনপরায়ণা রোদসী হাস্যে দীপ্ত ও কল্যাণে মহিমাময়ী হইয়া উঠুক। আবারআমরা উদাত্ত অনুদাত্ত এবং স্বরিত স্বরের নৃত্যদোদুল ছন্দে প্রার্থনা করি :—

মো ষু বরুণ মৃণ্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমম্।

মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়। ১

যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্নধ্মাতো অদ্রিবঃ

মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়। ২

ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে

মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়। ৩

অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারম্

মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য়। ৪

যৎ কিঞ্চেদং বরুণ দৈব্যে জনেভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি

অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মা যুয়োপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ॥ ৫

হে অধীশ্বর বরুণ, আমি যেন মৃন্ময় গৃহে না পচি, আমি যেন তোমার চিন্ময় গৃহের সন্ধান পাই। হে মহাত্মা, তুমি আমাকে সুখী কর, হে আয়ুধবান্ বরুণ. আমি যদি তোমার ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার পাশে আবদ্ধ হই, তুমি আমায় যেন দয়া কর।

হে বরুণ, তুমি চিরশুচি, আমি দীন, আমি কর্ত্তব্যোপরাঙ্মুখ, তাইত আমি সংসারপাশে বদ্ধ। হে সুবীর্য্য, তুমি আমায় সুখী কর। হে দেবতা, আমি অমৃত-সমুদ্রের মধ্যে দাঁড়াইয়াও তৃষ্ণায় কাতর। তুমি আমায় অমৃত দানে সুখী কর।

হে বরুণ, আমাদের দ্রোহ, আমাদের পাপ, আমাদের ত্রুটি যতই হউক না কেন, আমরা মর্ত্ত্য মানুষ অমর্ত্ত্যজনের যতই বিরোধ করি, যখন অজ্ঞানতায় আমরা সত্য ও ঋতের পথ বিসর্জ্জন করি, তখন তুমি যেন আমাদের ত্যাগ করিও না।

এই প্রার্থনা পূর্ণ হউক। অমৃতে, আনন্দে, অভয়বীর্য্যে আমরা আবার প্রতিষ্ঠিত হই।

পূর্ণাদ্বৈতবাদ

যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভারতীয় সংস্কৃতির বিচিত্র রত্ন-ভাণ্ডারে সর্বশ্রেষ্ঠ ও উজ্জ্বলতম রত্ন কি? আমি দ্বিধাহীন চিত্তে উত্তর করিব—বেদান্ত। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, বিশ্বের দরবারে এবং মানব-সভ্যতার অগ্রগতির পথে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় অবদান কি? আমি নিঃসংশয়ে উত্তর করিব—বেদান্ত। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, মানুষের জীবনকে অন্ধ অবিদ্যাশক্তির অর্থাৎ আসুরিক শক্তির প্রলয়ঙ্কর চক্রান্ত হইতে রক্ষা করিয়া স্থায়ী শান্তি সাম্য ও বিশ্বমৈত্রীর মধ্যে অমৃতময় করিয়া তুলিবার উপায় কি? আমি নিশ্চত বিশ্বাসে উত্তর করিব—বেদান্তের সাধনা।

বেদান্ত যে মহাসত্যকে জীবনের মূল আশ্রয় ও ধ্রুবতারা বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহা হইল ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে জানিলে পর জীবনের সমস্ত গ্লানি দূর হয়, সমস্ত ভয় ও সংশয় কাটিয়া যায়, সমস্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করে। উপনিষদের পাতায় পাতায় এ কথার সাক্ষ্য মিলিবে। ব্রহ্মকে জানিলে পর মানুষ উপলব্ধি করে, উপনিষদের সেই অভয় বাণী :

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥

ব্রহ্মকে জানিলে পর মানুষ কবির কণ্ঠে সুর মিলাইয়া বলিতে পারে :

দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ,
মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া ;

অন্তর মোর কল্যাণ রস সরসে
শতদল সম ফুটিল পরম হরষে,
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।

বেদান্ত মানুষকে যে পথের সন্ধান দিয়াছে, তাহা হইল অমৃত-সাধনার পথ; বেদান্তের সাধনা হইল জীবনকে অমৃতময় ও মধুময় করিবার সাধনা। কেননা, ব্রহ্ম যে অমৃতস্বরূপ—"আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি।"* তাই উপনিষদের ঋষি একদিন বিশ্বমানবকে সম্বোধন করিয়া অমৃতের বাণী শুনাইয়াছিলেন। বেদান্ত মানুষকে যে মূলমন্ত্র দিয়াছে তাহা হইল আত্মোপলব্ধির মন্ত্র—"আত্মানং বিদ্ধি।" কেননা, আত্মাই যে ব্রহ্ম—"অয়মাত্মা ব্রহ্ম

বেদান্তের রহস্য

বেদান্তের মূল রহস্য নিহিত রহিয়াছে সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের স্বতঃস্ফূর্ত শব্দঝঙ্কারে,—বেদে, উপনিষদে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়। কিন্তু মানুষ যখন তাহার বুদ্ধির সাহায্যে বেদান্তের মর্মার্থ যাচাই করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করে, তখন তাহার মনে অন্তহীন প্রশ্ন উঠে, কত শত সংশয়ের কুয়াশা চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া নামিয়া আসে, আর সৃষ্টি হয় অসংখ্য পরস্পর বিরোধী মতবাদ। দ্বন্দ্ব, বিরোধ, সংঘর্ষ—এ যে বুদ্ধি ও মনের ধর্ম। তাই আমরা দেখিতে পাই যে ভারতের দার্শনিক যুগে যখন বেদান্তের বিশুদ্ধজ্ঞানকে বুদ্ধির ছাঁচে ঢালিবার চেষ্টা হইল, তখন এক বেদান্তের আওতার মধ্যেই কত বিচিত্র মতবাদের সৃষ্টি হইল। কেহ বেদান্তের অর্থ করিলেন—কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ; কেহ বেদান্তের অর্থ করিলেন—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ বা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ; আবার কেহ বা বেদান্তের অর্থ করিলেন—

দ্বৈতবাদ। এই বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সুরু হইল পারস্পরিক কলহ ও অন্তহীন বাগ্‌বিতণ্ডা।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে দেখাইবার চেষ্টা করিব যে, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ আপাতঃ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হইলেও এক সমন্বয়াত্মক মহাসত্যের মধ্যে বিধৃত। উক্ত মতবাদগুলি একই অখণ্ড সত্যের বিভিন্ন অংশকে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু উহারা কেহই গোটা সত্যটি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করিতে না পারায় পারস্পরিক বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে। উহাদের অন্তর্নিহিত সত্যগুলি যথাযথভাবে গ্রহণ করিয়া যদি একটি সমন্বয় সাধন করা যায়, তবে তাহাই হইবে বেদান্তের অবিকৃত স্বরূপ। আমরা সেই পূর্ণাঙ্গ বেদান্ত-সত্যকেই পূর্ণাদ্বৈতবাদ নামে অভিহিত করিয়াছি। শ্রীঅরবিন্দ এই পূর্ণাদ্বৈতবাদকে তাঁহার বিভিন্ন গ্রন্থে অতি সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়মূলক অনুভূতি

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সুগভীর অধ্যাত্ম-অনুভূতির আলোতে আমাদের চিন্তাক্ষেত্রের বহু দ্বন্দ্ব ও বিরোধের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, অদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ বস্তুতঃ পরস্পর বিরোধী নয়, উহারা আধ্যাত্মিক সত্য-অন্বেষণের পথে বিভিন্ন স্তর, সুতরাং একই পরাসত্যের বিভিন্ন প্রকাশ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ উক্তিটির অনেকে এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যে, আসল ও চরম সত্য কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদই বটে, কেননা ইহাই হইল সর্বোচ্চ অধ্যাত্ম-অনুভূতি; দ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আত্ম-উন্মীলনের পথে নিম্নতর অনুভূতিমাত্র; সুতরাং সর্বোচ্চ স্তরে নির্গুণ ব্রহ্মের ক্ষেত্রে উঠিয়া গেলে, ইহারা সর্বথা পরিত্যাজ্য হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তির এরূপ

ব্যাখ্যা করিলে মায়াবাদের প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব করা হয়, তাহা বলাই বাহুল্য। আমরা এ জাতীয় সমন্বয়-সাধন সমর্থন করি না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার Life Divine ও অন্যান্য অমূল্য গ্রন্থে যে মহাসমন্বয়াত্মক পূর্ণাঙ্গ সত্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাই পূর্ণাদ্বৈতবাদের প্রাণ। কেবলাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদের অন্তর্নিহিত সত্যাংশসমূহ পূর্ণাদ্বৈতবাদ অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করিয়া নেয়, অথচ উহাদের কোনটির নিকটই অন্যগুলিকে বলিদান করে না।

পূর্ণাদ্বৈতবাদে নির্গুণের অর্থ

পূর্ণাদ্বৈতবাদের মতে পরাসত্য বা পারমার্থিক সত্তা এক এবং অদ্বিতীয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই অদ্বৈত সত্তা এমন নিঃস্ব বা শূন্যগর্ভ নহে, যে উহার মধ্যে বহুর বা বৈচিত্রের কোন স্থান হইতে পারে না। পরম অদ্বৈতসত্তা অনন্তরূপী এক; উহা শূন্য নহে, পূর্ণ; উহা নিঃস্ব নহে, অপরিমেয় ঐশ্বর্যশালী। অনন্ত বিভাব, অনন্ত সম্ভাবনা, অনন্ত শক্তি, সেই অদ্বিতীয়ের অন্তর্নিহিত সম্পদ্। কিন্তু অদ্বৈত সত্তার সঙ্গে উহার অন্তর্নিহিত অনন্ত সম্পদের ঠিক সম্বন্ধটা কী, তাহা আমাদের বুদ্ধি ও মনের অনধিগম্য—চরম রহস্যাবৃত। এ কথা বলা ঠিক হইবে না যে বহু হইল একের গুণ বা বিশেষণ বা অংশ, বা এ জাতীয় একটা কিছু। বুদ্ধির কোন প্রত্যয়ের সাহায্যে সেই চরম রহস্য ভেদ করা অসম্ভব, কেননা, উহা যে "বাঙ্‌মনসোগোচরঃ", "অশব্দম্ অস্পর্শম্ অচিন্ত্যরূপম্"। সুতরাং সেই অদ্বৈতসত্তাকে সগুণ ব্রহ্ম অথবা বিশিষ্ট অদ্বৈত (qualified unity) বলিয়া বর্ণনা করা সমীচীন নহে। অথচ ব্রহ্ম আবার শূন্যগর্ভ-ও নহে, অথবা এই অর্থে—নির্গুণ নহে যে উহার মধ্যে অনন্ত বহুত্বের বা অনন্ত শক্তির কোন স্থান নাই। অনন্ত সম্পদে সমৃদ্ধ, অনন্ত শক্তিতে শক্তিমান,

অথচ বুদ্ধির অনধিগম্য সেই অদ্বৈত সত্তাকে আমরা বলিব পরব্রহ্ম, পরা-সম্বিৎ বা পুরুষোত্তম। পরব্রহ্মের প্রাথমিক বোধগম্য আত্ম-অভিব্যক্তি হইল সচ্চিদানন্দ। পরব্রহ্মের স্বরূপ যখন আমরা বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করি, তখন অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ রূপেই তাঁহাকে বুঝিতে হয়। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বলিতে গেলে, "Saccidananda is the eternel manifestation of the ineffable Supreme in the everlasting Consciousness of the trans-cendent Divine Mother."

নির্গুণত্ব পরব্রহ্মের দুর্জ্ঞেয় মহিমা সূচিত করে। আমরা দেখিয়াছি যে নির্গুণ কথাটার অর্থ ইহা নহে, যে ব্রহ্মের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা, অনন্ত সম্পদ্ বা অনন্ত শক্তির কোন স্থান নাই। পরব্রহ্ম এই অর্থে নির্গুণ, যে যদিও তিনি বিচিত্ররূপে নিত্য প্রকাশমান, যদিও তিনি নিত্য নূতন ছন্দে, নব নব বিস্ময়ে নিজকে প্রকাশ করেন, তবু কোন বিশেষ রূপ বা রূপসমষ্টির মধ্যেই—কোন বিশেষসৃষ্টি বা সৃষ্টি-পরম্পরার মধ্যেই—তিনি নিঃশেষিত হইয়া যান না। তাঁহার বিচিত্র আত্মপ্রকাশের গণ্ডীর মধ্যে তিনি বাঁধা পড়েন না। আত্ম-অভিব্যক্তির সমস্ত সীমা অতিক্রম করিয়া, বিচিত্র রূপ ও বিশাল সৃষ্টির বন্ধন তুচ্ছ করিয়া, তিনি আপন মহিমায় আপনি বিরাজ করেন। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের এই যে অপরি-মেয়তা, তাঁহার স্বরূপের এই যে নিত্যযুক্তভাব, ইহাই নির্গুণ কথাটার নিগূঢ় তাৎপর্য্য। ইহা ছাড়া নির্গুণ কথাটার আর একটি অর্থ হইল পরব্রহ্মস্বরূপের দুর্জ্ঞেয়তা। আমাদের মন, বুদ্ধি ও বাক্য তাঁহার নিকট হইতে ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। তাঁহাকে আমরা জানি এ কথা বলা যেমন ভুল, তাঁহাকে আমরা জানি না, এ কথা বলাও তেমনি ভুল। তিনি জানা ও না জানা, অস্তি ও নাস্তি, কার্য

কারণ সম্বন্ধ অথবা দ্রব্যগুণ সম্বন্ধ—এ সমস্তেরই অনেক ঊর্দ্ধে। তাই তো তিনি নিগুর্ণ। তৃতীয়তঃ, তাঁহার অন্তর্নিহিত অনন্ত শক্তির কর্ম-প্রেরণা সম্বন্ধে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ মুক্ত। অর্থাৎ তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তি সৃষ্টিপরায়ণা হইবে কি হইবে না, তাঁহার অন্তর্নিহিত বিচিত্র সম্ভাবনাকে দেশকালসন্ততির পটভূমিকায় রূপায়িত করিবে, কি করিবে না, তাহা পুরুষোত্তমের স্বাধীন সার্বভৌম ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাই শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছিলেন যে, মা ভগবতী কখনো পরমপুরুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা তাঁহার অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন কাজই করেন না। সুতরাং দেখা গেল যে, পরব্রহ্ম নিগুর্ণ এই অর্থে নয় যে তাঁহার স্বরূপের মধ্যে অনন্তশক্তি বা অনন্ত বহুত্বের কোন স্থান নাই, এই অর্থে যে তিনি আত্মপ্রকাশের সকল বন্ধনের অতীত, আমাদের মনবুদ্ধি ও বাক্যের তিনি সম্পূর্ণ অতীত, এবং সৃষ্টিব্যাপারে সর্বপ্রকার বাধ্যবাধকতা বা দুর্দমনীয়তার তিনি অতীত।

আমরা পরব্রহ্মের স্বরূপের মধ্যে বিচিত্র আত্ম-অভিব্যক্তির শক্তি (power of variable self-manfistation) স্বীকার করিলাম। এই শক্তির বলে তিনি একদিকে পরাৎপর পরব্রহ্ম রূপে এবং অন্যদিকে আবার যুগপৎ বিশ্বজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-কর্তা ঈশ্বররূপে এবং নব নব পরিবেশের মধ্যে নিত্য নূতন ছন্দে আত্ম-প্রকাশের অবলম্বন স্বরূপ জীবাত্মারূপে অবস্থান করিতে পারেন। সুতরাং ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীবাত্মা একই অনন্ত সত্তার বিভিন্ন শাশ্বত অবস্থানভঙ্গী বা প্রকাশভঙ্গী। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় বলিতে গেলে: "Supra-Cosmic trans-cendence, Cosmic Universality and Individuality are equally real and eternal poises of being or modes of manifestation of the same supreme spirit." সুতরাং ব্রহ্মকে

তাঁহার বিশ্বাতীত রূপে উপলব্ধি করিবার পর, ঈশ্বরত্ব বা জীবত্ব, ইহাদের কোনটিই মিথ্যা বলিয়া পরিহার করিবার কারণ নাই। ঈশ্বর ও জীবাত্মা একই পরব্রহ্মের বিভিন্ন অভিব্যক্তি। সত্তা ও স্বরূপের দিক হইতে, ব্রহ্মের সঙ্গে ঈশ্বরের বা জীবাত্মার কোন পার্থক্য নাই; পার্থক্য শুধু প্রকাশের দিক হইতে; লীলার দিক হইতে, অবস্থান ভঙ্গীমার দিক হইতে। পরব্রহ্মের মত ঈশ্বর ও জীবাত্মা উভয়ই অখণ্ড, অমর এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত-স্বভাব। ঈশ্বররূপে ব্রহ্ম অনন্ত জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার সাধন করিয়া থাকেন। এবং বহুজীবাত্মার মাধ্যমে তিনি কত বিচিত্ররূপে নিজেকে নিজে ভোগ করিয়া থাকেন, কত বিচিত্র ঢঙে নিত্য নবীন বিস্ময়ে নিজেকে প্রকাশ করেন—যুগে যুগে কত লীলা তিনি বিস্তার করেন।

পূর্ণাদ্বৈতবাদে ঈশ্বর ও জগৎ

ঈশ্বর ব্রহ্মেরই একটি বিশেষ অবস্থান-ভঙ্গী। সুতরাং অনন্ত বৈচিত্র্যময় এ জগৎ, যাহা ঈশ্বরের চেতনায় নিত্য বিধৃত রহিয়াছে, তাহা কখনো মিথ্যা হইতে পারে না। পরব্রহ্মের অন্তর্নিহিত বিচিত্র সম্ভাবনাই ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তির মাধ্যমে অনন্তবৈচিত্র্যময় জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে। ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে পর, যাহা মিথ্যা বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, তাহা জগৎ নহে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ লোকের—বদ্ধজীবের—যে অসম্পূর্ণ ও বিকৃত জ্ঞান তাহাই। জড় প্রাণ, মন প্রভৃতি জগতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন তত্ত্বসমূহের কোনটিই মিথ্যা নহে, মিথ্যা হইল ঐগুলি সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনের যে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ ধারণা তাহাই। স্বরূপতঃ জড় হইল সচ্চিদানন্দের অন্তর্নিহিত "সৎ" তত্ত্বের নিম্নতর অভিব্যক্তি, যাহা বাহ্যতঃ চেতনা ও আনন্দ হইতে

বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ; এবং স্বরূপতঃ জ্ঞান হইল সচ্চিদানন্দের অন্তর্নিহিত "চিৎ" তত্ত্বের নিম্নতর অভিব্যক্তি, যাহা বিজ্ঞান ও আনন্দ হইতে বাহ্যতঃ বিচ্ছিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে ; স্বরূপতঃ মন হইল, সচ্চিদানন্দের অখণ্ডচেতন বিজ্ঞান শক্তির নিম্নতর অভিব্যক্তি, যাহা বাহ্যতঃ আনন্দ ও পরাজ্ঞান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খণ্ডিতরূপে প্রকাশ পাইয়াছে ; এবং স্বরূপতঃ অন্তরাত্মা হইল সচ্চিদানন্দের অন্তর্নিহিত "আনন্দ" তত্ত্বের নিম্নতর অভিব্যক্তি। এই সব বিভিন্ন তত্ত্ব একই অখণ্ড সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ ; দৃশ্যতঃ পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হইলেও, মূলতঃ ও বস্তুতঃ ইহারা অপৃথক্ বা অভিন্ন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে জড়পদার্থ দৃশ্যতঃ ও বাহ্যতঃ চেতনা, আনন্দ প্রভৃতি হইতে পৃথক্‌ভাবে প্রকাশ পাইলেও ; ঊর্ধ্বতর তত্ত্বসমূহ গোড়া হইতেই জড়ের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্লীনভাবে ছিল, সেই জন্যই ক্রমিক আত্মবিকাশের পথে জড়ের বুকে একদিন মগ্নচেতন প্রাণশক্তির প্রকাশ্য আবির্ভাব হইয়া উদ্ভিদ্ জগতের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। তেমনি বিজ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি ঊর্ধ্বতর তত্ত্বগুলি প্রথম হইতেই প্রাণের অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্লীন ছিল বলিয়াই ক্রমিক আত্মবিকাশের পথে একদিন ইন্দ্রিয়াবদ্ধ মানস শক্তির প্রকাশ্য আবির্ভাব হইয়া পশুজগতের সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল। তারপর আবার যুক্তিপ্রবণ বা বুদ্ধিপ্রধান মানস-শক্তি—যাহা আগে প্রচ্ছন্ন ছিল—যখন বিবর্তনশীল বিশ্বপ্রকৃতির রঙ্গমঞ্চে প্রকাশ্যভাবে সক্রিয় হইয়া উঠিল, তখন পৃথিবীর বুকে মানুষের জন্ম হইল। কিন্তু মানুষও প্রকৃতির বিবর্তনধারার শেষ কথা নয়। মানস চেতনার মধ্যে প্রথম হইতেই বিজ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি ঊর্ধ্বতর তত্ত্বসমূহ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। তাই যুগে যুগে মানুষ সাধনা করিয়াছে তাহার অন্তরস্থ চেতনা-সমুদ্র মন্থন করিয়া বিচিত্র

জোর দেয় বেশী; আর দ্বৈতবাদ জীবের সঙ্গে নিত্যলীলারত তাঁহার আত্ম-অবগুণ্ঠিত লীলাময় রূপটির উপর জোর দেয় বেশী। কিন্তু পূর্ণাদ্বৈতবাদ আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয় যে নির্গুণ বিশ্বাতীত রূপ, সগুণ বিশ্বাত্মক রূপ এবং বহুধা বিভক্ত লীলাকেন্দ্ররূপ, একই পরব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ, একই পুরুষোত্তমের সমানভাবে ও শাশ্বতভাবে সত্য, বিচিত্র অবস্থান-ভঙ্গী। কেবলাদ্বৈতবাদ ঠিকই বলে যে ব্রহ্ম নির্গুণ ও বিশ্বাতীত, এবং তাঁহার নির্গুণত্বই সৃষ্টির অনন্ত বৈচিত্র্যের শাশ্বত ভিত্তি। কিন্তু কেবলাদ্বৈতবাদের মস্ত বড় ভুল হইল এই জায়গায়, যে উহার মতে ব্রহ্মের দিক হইতে ঈশ্বরত্ব, জীবত্ব ও জগৎ সবই মিথ্যা। কিন্তু ব্রহ্মের আত্ম-প্রকাশের মিথ্যা বলিবার মত এত বড় মিথ্যাকে আমরা নির্বিবাদে গ্রহণ করি কি করিয়া? ব্রহ্ম নির্গুণ হইলেও বিচিত্ররূপে আত্ম-প্রকাশের অসীম ক্ষমতা তাঁহার মধ্যে অন্তর্নিহিত। ব্রহ্ম যে নির্গুণ শুধু এই অর্থে যে অনন্ত রূপের মধ্যে নিত্য প্রকাশমান হইলেও তিনি সকল প্রকাশের ঊর্ধ্বে আপন মহিমায় আপনি বিরাজ করেন, দুর্ভেদ্য রহস্যে আবৃত হইয়া। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ঠিকই বলে যে ব্রহ্ম সগুণ এবং অনন্ত বিশ্বের তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-বিধাতা, কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ভুলিয়া যায় যে সগুণত্ব ব্রহ্মের একটি বিশেষ প্রকাশভঙ্গী মাত্র; ব্রহ্ম অনন্তগুণসম্পন্ন হইয়াও আবার সমস্ত গুণ অতিক্রম করিয়া দুর্বোধ্য রহস্যরূপে অবস্থান করেন। ব্রহ্মের এমন একটি অবস্থানভঙ্গী আছে, যেখানে প্রকাশের কোন বাধ্যবাধকতা নাই, কর্মের কোন তাগিদ নাই; যে অবস্থায় সাধনার বলে সরাসরি উপনীত হইলে পর, সব কিছু মিথ্যাজ্ঞান করিবার একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জন্মে। দ্বৈতবাদ ঠিকই বলে, যে ব্রহ্ম নিত্যলীলাময় এবং জীব তাঁহার লীলাসহচর বা লীলাকেন্দ্র। কিন্তু দ্বৈতবাদ ভুলিয়া যায়, যে লীলাময় ও তাঁহার লীলাসহচরের মধ্যে

প্রথম

সত্তাগত কোন পার্থক্য নাই। ব্রহ্মের সহিত জীবের পার্থক্য শুধু ক্রিয়া প্রকাশের দিক হইতে, সত্তা বা স্বরূপের দিক হইতে নয়।

কেবলাদ্বৈতবাদ ঠিকই বলে, যে স্বরূপতঃ জীবাত্মা ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন। জীবাত্মাকে ব্রহ্মের অংশ বলিয়া নির্দেশ করাটা ভুল, কেননা ব্রহ্ম অখণ্ড ও নিরবয়ব এবং সেই কারণে তাঁহার মধ্যে কোন স্বগত ভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু অভেদজ্ঞানের উপর অত্যধিক জোর দেওয়ার ফলে অদ্বৈতবাদ একটি জিনিস উপেক্ষা করিয়াছে। সত্তা ও স্বরূপের দিক থেকে ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন হইলেও, প্রকাশ ও লীলার দিক থেকে, প্রত্যেক জীবাত্মার একটি চিরন্তন বৈশিষ্ট্য আছে। অভিন্নতা প্রতিষ্ঠার আগ্রহাতিশয্যে অদ্বৈতবাদ এই মূল্যবান্ সত্যটুকু অবহেলা করিয়াছে। অদ্বৈতবাদ ঠিকই বলে, যে জীবাত্মাকে কখনো ব্রহ্মের বিশেষণ-রূপে বর্ণনা করা সমীচীন নহে, কেননা ব্রহ্ম তো নির্বিশেষ চেতনা। কিন্তু অদ্বৈতবাদ যখন ইহা হইতে এই সিদ্ধান্ত করে যে, জীবাত্মার কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নাই, এবং ব্রহ্মেরও কোন অন্তর্নিহিত শক্তি বা সম্পদ নাই, তাহা মোটেই সমর্থনযোগ্য নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় হইলেও নিঃস্ব বা রিক্ত নহেন। অনন্ত ঐশ্বর্যে তিনি ঐশ্বর্যশালী, অনন্ত শক্তিতে তিনি শক্তিমান, যদিও সেই একের সঙ্গে বহু ঐশ্বর্যের সঠিক সম্বন্ধটি বুদ্ধির অনধিগম্য, চিররহস্যাবৃত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ঠিকই বলে, যে জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে অপৃথক্ এবং নিত্যকালের জন্য তাঁহার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যখন এই নির্ভরশীলতাকে অংশ-অংশী, বিশেষ্য-বিশেষণ, দ্রব্য-গুণ, দেহী-দেহ অথবা এ জাতীয় কোন সম্পর্কের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করে তখন মারাত্মক ভুল করে। আমরা দেখিয়াছি যে, জীবাত্মা ব্রহ্মেরই একটি বিশেষ অবস্থান-ভঙ্গী। যে শক্তির সাহায্যে তিনি

যুগপৎ অসংখ্য জীবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন, উহা রহস্যজনকভাবে ব্রহ্মের স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত; বুদ্ধিগত কোন প্রত্যয়ের সাহায্যে ঐ রহস্যকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা প্রগল্‌ভতা মাত্র। দ্বৈতবাদ ঠিকই বলে, যে প্রত্যেক জীবাত্মার নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য আছে, এবং লীলার ক্ষেত্রে উহার একটি সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু দ্বৈতবাদ যখন এই বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যবোধের উপর অত্যধিক জোর দিয়া, জীবাত্মা ও পরমাত্মার সঙ্গে চিরন্তন ভেদ বা সত্তাগত পার্থক্য কল্পনা করে, তখন দ্বৈতবাদ মূলসত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে। লীলার ক্ষেত্রে জীবকে এমনভাবে আচরণ করিতে হয়, যেন জীব ব্রহ্ম হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র; কিন্তু লীলা-গত এই পার্থক্য সত্তা-গত পার্থক্য সূচিত করে না।

পূর্ণাদ্বৈতবাদে জীবনের তাৎপর্য

পূর্ণাদ্বৈতবাদ সত্যের যে অখণ্ড পরিপূর্ণ রূপটি আমাদের চোখের সম্মুখে তুলিয়া ধরে, তাহাতে আমাদের জীবন এক গভীর তাৎপর্যে ভরিয়া উঠে। ব্রহ্ম নির্গুণ হইয়াও সগুণ, বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বরূপী, সুতরাং জগৎ মিথ্যা নহে সত্য। জীবাত্মা ব্রহ্মেরই একটি বিশেষ অবস্থান-ভঙ্গী ভগবানের সনাতন অংশ, এবং সেই কারণে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব। সুতরাং অবিদ্যাগ্রন্থি ছিন্ন হইবার পর, কর্মের মলিনতা নিঃশেষে মুছিয়া যাওয়ার পর, জীবাত্মার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্যবোধ বিলুপ্ত হওয়ার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বরং মুক্তিলাভের পর মুক্তির আনন্দে নিশ্চেষ্টভাবে ডুবিয়া থাকাটাই কেমন যেন একটু বিসদৃশ। মুক্তির বিশুদ্ধ জ্ঞান ও আনন্দে শাশ্বত স্থিতিই যদি জীবনের একমাত্র এবং চরম লক্ষ্য হয়, তবে জীবনের বিরামহীন কর্মপ্রবাহ, অন্তহীন ভাগ্য-বিপর্যয়, সুখদুঃখ ... ন্দ, এ সবের মধ্য দিয়া আমাদের সুকঠোর

সাধনা নিতান্তই যেন অর্থহীন হইয়া পড়ে। কেন না মুক্তিলাভ তো পরিহৃত পরিহার মাত্র—যাহা স্বভাবসিদ্ধ তাহারই সম্যক্ উপলব্ধি মাত্র। শ্রীঅরবিন্দ বলেন যে, আমাদের জীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতা শুধু মুক্তি-লাভ নয়, মুক্তির জ্ঞান ও আনন্দকে কর্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ করা; মুক্তির সম্পদ্‌কে কর্মপ্রবাহের মধ্যে নামাইয়া আনিয়া ইতিহাসের যিনি দেবতা, মানব-সভ্যতার বিবর্তন-ধারার যিনি নিয়ন্তা, তাঁহার সঙ্গে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করা। অধ্যাত্ম সম্পদের ভিত্তিতে মানুষের জীবন ধারার—ব্যক্তিগত জীবন ও সমষ্টিগত জীবন, এ উভয়েরই—সর্বাঙ্গীণ পুনর্গঠন ও নব-রূপান্তর, ইহার চেয়ে বড় লক্ষ্য আর কি হইতে পারে? মানব-সভ্যতার ইতিহাসে আজ যে চরম সংকট উপস্থিত হইয়াছে, উহার স্থায়ী সমাধানের চাবিকাঠি আমরা এই আদর্শের মধ্যেই খুঁজিয়া পাই।

বিদেশী ভাষায় উপনিষদাবলীর প্রচার

বেদ হিন্দুধ-র্মের আদি শাস্ত্র। বেদের দার্শনিকাংশের নামই উপ-নিষদ্। উপনিষদাবলী সংখ্যায় শতাধিক। শঙ্কর, সায়ণ, রামানুজ, শঙ্করানন্দ প্রমুখ আচার্য্যগণ উপনিষদের ভাষ্যাদি রচনা করিয়াছেন। উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যই সমধিক প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। বাংলা, হিন্দি, গুজরাতী, মারাঠী, মালায়ালাম্ প্রভৃতি প্রায় সকল ভারতীয় ভাষায় উপনিষদাবলীর অনুবাদ হইয়াছে। পণ্ডিত দুর্গাচরণ শঙ্কর-রচিত

উপনিষদ্ ভাষ্যের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। বেলুড় মঠের স্বামী গম্ভীরানন্দ কৃত উপনিষদাবলীর বঙ্গানুবাদ প্রাঞ্জল ও উপাদেয়।

মোগল সম্রাট সাজাহানের পুত্র দারাসিকো কাশী হইতে পণ্ডিত আনাইয়া, দিল্লীতে ১৬৫৬-৫৭ খৃঃ পঞ্চাশখানি উপনিষদ্ ফার্শী ভাষায় অনুবাদ করান। ইহাই বিদেশী ভাষায় উপনিষদাবলীর সর্বপ্রথম অনুবাদ। আঙ্কোয়েটিল ডুপেরন নামক ইউরোপীয় প্রাচ্য ধর্ম অধ্যয়নের জন্য ভারতে আগমন করেন। তিনি উপনিষদাবলীর ফার্শী অনুবাদ অবলম্বনে একটী লাটীন অনুবাদ প্রস্তুত করেন। ইহাই ইউরোপীয় ভাষায় উক্ত গ্রন্থাবলীর আদি অনুবাদ। এই অনুবাদের ঐতিহাসিক মূল্য সমধিক; কারণ, ইহা হইতেই উপনিষৎ-তত্ত্ব ইউরোপে প্রথম প্রচারিত হয়। উক্ত অনুবাদ পাঠে জার্মান দার্শনিক সোপেনহাওয়ার উপনিষদাবলীর প্রতি অনুরক্ত হন। উপনিষদ্ পাঠ ছিল তাঁহার নিত্য ধর্মানুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। তিনি বলিয়াছেন—"উপনিষদ্ পাঠের মত লাভজনক (rewarding) এবং উন্নয়ন-কারী (elevating) আর কিছু জগতে নাই। ইহা আমাকে জীবনে শান্তি দিয়াছে, মৃত্যুতেও ইহা আমাকে শান্তি (solace) দিবে।" সোপেনহাওয়ারের দর্শন ঔপনিষৎ তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।

উপনিষদাবলীর লাটিন অনুবাদ হইতে প্রথম জার্মান অনুবাদ হয়। ১৮৮২ খৃঃ ড্রেসডেন হইতে প্রকাশিত এই অনুবাদ জার্মানীতে উপনিষদের ভাবরাশি প্রচার করে। দ্বিতীয় জার্মান অনুবাদ পল্ ডয়সন কর্তৃক। ডয়সন ছিলেন কীল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক ও সংস্কৃতজ্ঞ। মূল সংস্কৃত হইতে পঞ্চাশখানি প্রধান উপনিষদের জার্মান অনুবাদ করিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই। তিনি 'উপনিষদের দর্শন' নামে জার্মান ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা ইংরাজীতে অনূদিত

হইয়াছে। ঔপনিষদ্ তত্ত্ব সম্বন্ধে এইরূপ সারগর্ভ ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সার এস. রাধাকৃষ্ণান্ এবং অধ্যাপক আর. ডি রাণাডে তৎপরে উপনিষদ্-দর্শন সম্বন্ধে যে পুস্তকদ্বয় লিখিয়াছেন, তদুভয়ই পাণ্ডিত্যে ও প্রাঞ্জলতায় ডয়সনের গ্রন্থকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। উপনিষদ্ সম্বন্ধে ডয়সন যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস তাঁহার নিম্নোক্ত উক্তি হইতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "উপনিষদাবলীর বৈশিষ্ট্য উহাদের জন্মভূমি ও উৎপত্তিকাল অতিক্রমপূর্বক সুদূরপ্রসারী। সমগ্র মানব জাতির জন্য উহাদের যে অমূল্য ও অমর অবদান আছে, তাহাতে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাসী। একটী বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ যে, ভবিষ্যতের দর্শন যতই অভিনব ও অপূর্ব পথ আবিষ্কার করুক না কেন উপনিষদের মূল সিদ্ধান্তটী অবিচলিত থাকিবে, ইহা হইতে বিচ্যুতি (deviation) অসম্ভব।" অধ্যাপক ডয়সন ১৮৯৩ খৃঃ ভারতে আগমন করেন। ভারত ত্যাগের পূর্বে রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটীর বোম্বাই শাখার উদ্যোগে জার্মান মনীষী যে বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহাতে প্রদত্ত ভারতের প্রতি তাঁহার বিদায়-বাণী এই : "বেদান্তের অবিকৃত স্বরূপই বিশুদ্ধ নৈতিকতার বজ্রদৃঢ় ভিত্তি। ইহা জীবন-দুঃখে ও মৃত্যু-যন্ত্রণায় অমোঘ সান্ত্বনা। ভারতবাসিগণ, এই স্বর্গীয় সম্পদ্ সংরক্ষণে তৎপর হও।"

বোম্বাই স্টাফকোরের কর্ণেল জি. এ. জ্যাকব ১৮৯১ খৃঃ ছয়ষট্টিখানি প্রধান উপনিষদ্ এবং ভগবদ্গীতার একটি নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেন। ইহার নাম 'উপনিষদ্ বাক্যকোষ'। বইখানি আট বৎসর পরিশ্রমের ফলে প্রস্তুত হয়। উহার ভূমিকায় উক্ত ইংরাজ মনীষী মন্তব্য করেন যে, এই পুস্তকের অন্তর্গত ১০৮৩ পৃষ্ঠার প্রত্যেক শব্দটি স্বহস্তে লিখিত। নিউ-ইয়র্কের ডাঃ সি. ও. হায়াস এই প্রকারের আর একটি পুস্তক রচনা

করিয়াছেন। ইহা জ্যাকবের পুস্তক হইতে স্বতন্ত্র। যে সকল বাক্যের পুনরাবৃত্তি আছে, সে গুলির বর্ণনাক্রমিক সূচী ইহাতে প্রদত্ত। আমেরিকার প্রত্নতত্ত্বসমিতির পত্রিকার ৪২তম খণ্ডে ইহা প্রথমে প্রকাশিত হয়। ডাঃ হিউম তেরখানি প্রধান উপনিষদের যে সরল অনুবাদ করিয়াছেন, ডাঃ হায়াসের নির্ঘণ্ট তাহার পরিশিষ্টে প্রদত্ত। চার্লস এড্‌গার লিট্‌ল কৃত ছান্দোগ্য উপনিষদের বৈয়াকরণিক নির্ঘণ্ট অভিধানবৎ রচিত। ইহাতে প্রত্যেক শব্দের বিভিন্ন ধাত্বর্থ পাওয়া যায়। জি. আর. এস. মীড সাহেব নয়খানি উপনিষদের যে ইংরাজী অনুবাদ করেন। তাহা ১৮৯৬ খৃঃ লণ্ডন থিয়জফিক্যাল সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত হয়। মিঃ মীড তৎপুস্তকের ভূমিকায় বলেন, 'উপনিষদাবলী মানব জাতির ধর্মশাস্ত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারে। এই শাস্ত্রে সর্বকালে সর্বজাতির সত্যনিষ্ঠ ও ধর্মানুরাগী নরনারীগণের হৃদয় অনুপ্রাণিত করিবে।' এই পুস্তক ই. মারকল্‌ট্‌ কর্তৃক ফরাসী ভাষায় অনূদিত এবং প্যারিস হইতে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহা ডাচ ভাষায় ক্লারা স্ট্রাউবেল কর্তৃক অনূদিত এবং আমস্‌স্টারডম থিয়জফিক্যাল সোসাইটী কর্তৃক ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। জাপানের সাতাইশ জন সংস্কৃতজ্ঞ কর্তৃক ১১৬ খানি উপনিষদ জাপানী ভাষায় অনূদিত এবং ১৯২২।২৪ খৃঃ টোকিও হইতে নয় খণ্ডে প্রকাশিত।

হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে টমাস কোলব্রুকের রচনাতে ঐতরেয় উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ আছে। ইহা কলিকাতার 'এশিয়া গবেষণাবলীর' অষ্টম খণ্ডে ১৮০৫ খৃঃ প্রকাশিত। কোলব্রুকের রচনা জার্মান ভাষায় ১৮৫৭ খৃঃ এল. পোলে কর্তৃক অনূদিত হয়। ১৮৫৬ খৃঃ কলিকাতার 'বিবলিওথিকা ইণ্ডিকাতে' ই-রোয়ার কর্তৃক বৃহদারণ্যক উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত। মাধ্যন্দিন শাখানুসারে উক্ত উপনিষদ্

এ. এফ. হেরল্ড কর্তৃক ফরাসী অনূদিত এবং প্যারিস হইতে ১৮৯৪ খৃঃ মুদ্রিত হয়। এই উপনিষদের জার্মান অনুবাদ করেন অটোবইট্লিঙ্ক। ইহা ১৮৮৯ খৃঃ সেণ্টপিটার্স বুর্গ হইতে সংস্কৃত মূলের সহিত প্রকাশিত হয়। বৃহদারণ্যকের একাংশের ইংরাজী অনুবাদ করেন চার্লস জনষ্টন। ইহা নিউইয়র্ক হইতে ১৯০১ খৃঃ মুদ্রিত হয়। ইহার জার্মান অনুবাদ হইয়াছে।

ঐতরেয় উপনিষদের ব্যারণ ডি. একস্টাইন কৃত ফরাসী অনুবাদ ১৮৩৩ খৃঃ প্যারিসের এশিয়াটিক জার্ণালে প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ খৃঃ লুভেইনের সি. ডি. হার্লেজ কৌষীতকি উপনিষদের ফরাসী অনুবাদ করেন। কঠোপনিষদ্ ব্যারণ ডি. একস্টাইন কর্তৃক ১৮৩৫ খৃঃ ফরাসীতে এবং এল পোলে কর্তৃক ১৮৪৭ খৃঃ জার্মানীতে অনূদিত হয়। গীতার প্রসিদ্ধ ইংরাজী অনুবাদক এডুইন আরনল্ড কর্তৃক কঠোপনিষদের একাংশ পদ্যে অনূদিত এবং ১৮৮৫ খৃঃ 'মৃত্যু-রহস্য' নামে প্রকাশিত হয়। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক নিক্সন ওরফে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম কঠোপনিষদের একটী সুন্দর অনুবাদ ও অভিনব টীকা করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রাচীন ও নবীন ভাবালোকে, তিনি উক্ত উপনিষদের যে গভীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয় ও অভূতপূর্ব। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম বলেন, "কঠোপনিষদের শব্দাবলীর পশ্চাতে এক বিচিত্র সমৃদ্ধ ভাবজগৎ বিদ্যমান। মর্ত্যধাম হইতে অমর লোকে যাইবার প্রাচীন পথের ইঙ্গিত উক্ত উপনিষদে প্রদত্ত। যখন উহার মূল রচিত হয়, তখনো সেই পথ যেমন সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল, অদ্যাপি তদ্রূপ রহিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জগতের অল্প সংখ্যক ব্যক্তির নিকট সেই পথ বিদিত। সেই উপনিষদুক্ত পথ সকল প্রাচীন জাতির ধর্মগ্রন্থাবলীতে বিদিত।"

কঠোপনিষদের একটি সোয়েডিশ অনুবাদ করেন এণ্ডিয়া বুটেনসন।

উহা ১৯০২ খৃঃ স্টকহল্‌ম্‌ হইতে প্রকাশিত হয়। উক্ত উপনিষদের বেলানী ফিলিপী কৃত ইতালীয় অনুবাদ ১৯০৫ খৃঃ পিসা হইতে প্রকাশিত হয়। ডবলিউ. ডি. হুইটনি কৃত উক্ত উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ ১৮৯০ খৃঃ আমেরিকান ভাষাতত্ত্ব সমিতির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত ইংরাজী অনুবাদে ব্যাকরণ-সঙ্গত তথ্য পাওয়া যায়। ডবলিউ. গোর্ণওল্ড প্রণীত 'যমযোগ' পুস্তকখানি কঠোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ মাত্র। জার্ল চাপেন্টিয়ার কঠোপনিষদের যে ইংরাজী অনুবাদ করেন তাহা ১৯২৮ খৃঃ ইণ্ডিয়ান এন্টিকোয়ারীতে প্রকাশিত হয়। আর, টি, গ্রিফিথ ইংরাজীতে বাল্মীকি রামায়ণের একটি পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। তৎকৃত ঈশোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ ১৮৯৮ খৃঃ কাশী হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার সহিত বাজসনেয়ী সংহিতার সমস্ত মূলটি আছে। উক্ত সংহিতার ৪০তম অধ্যায়টির নাম ঈশোপনিষদ্‌।

বার্লিনের আলব্রেকত ওয়েবার পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস লিখিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। 'ভারতীয় অধ্যয়ন' নামক যে গ্রন্থ জার্মান ভাষায় ১৮৪৯-৫০ খৃঃ তিনি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উপনিষদাবলীর অনেক পরিচ্ছেদের অনুবাদ আছে। জন মুইর ১৮৫৮ খৃঃ লণ্ডন হইতে মূল সংস্কৃত সাহিত্য প্রথমে প্রকাশ করেন। ইহাতে নানা উপনিষদের বহু অংশ অনূদিত এবং বিষয় অনুসারে সজ্জিত। সার মনিয়ার উইলিয়ামসের সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান বিখ্যাত। সার মনিয়ারের 'ভারতীয় প্রজ্ঞা' নামক একটি সারগর্ভ ইংরাজী গ্রন্থ আছে। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে কয়েকটি প্রধান উপনিষদের বহু অংশ অনূদিত। 'এই অমর ইংরাজ সংস্কৃতবিৎ উক্ত গ্রন্থে বলেন, উপনিষদাবলী প্রকৃতপক্ষে আধুনিক চিন্তাশীল হিন্দুগণের বেদস্বরূপ। পল রেজিনাল্ড এবং পল অলট্রামোরের ফরাসী গ্রন্থাবলী এবং লুসিয়ান কারমানের জার্মান গ্রন্থ উপনিষদাবলী

সম্বন্ধে রচিত। এই সকল গ্রন্থদ্বারা উপনিষদাবলী ইউরোপে বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। মাদ্রাজের খৃষ্টান সাহিত্য সমিতি ১৮৯৮ খৃঃ কয়েকটি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইহাতে অনুবাদকের নাম নাই। কিন্তু উপনিষদের তীব্র সমালোচনা আছে। এই সমিতির পি. ই. শ্লেটারের 'উপনিষদের অধ্যয়ন' নামক গ্রন্থ ১৮৯৮ খৃঃ প্রকাশিত হয়। ইহাতে তিনি বলেন, 'আমি এই সকল গ্রন্থের শ্রেষ্ঠ ও মহত্তম চিন্তারাশির মধ্যে প্রকৃত ধর্মভাব খৃষ্টবাণীর সুদূরাগত প্রতিধ্বনি পাই। ইহাদের অতি সুন্দর বাক্যাবলীর সহিত খৃষ্টবাণীর অতি নিকট সাদৃশ্য আছে।'

১৯০৫ খৃঃ 'ওপেন কোর্ট' এবং ১৯১০ খৃঃ 'মনিষ্ট' নামক পত্রিকাদ্বয়ে চার্লস জনষ্টন উপনিষদ্ সম্বন্ধে কতকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। পত্রিকাদ্বয় চিকাগো হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ খৃঃ চিকাগো হইতে প্রকাশিত এবং পল ডয়সন কর্তৃক লিখিত 'উপনিষদের ভাব' নামক পুস্তিকায় হিন্দু দার্শনিক ভাবধারার সংক্ষিপ্তসার ব্যাখ্যাত। ১৯১১ খৃঃ ডাঃ লায়নেল ডি বারনেট কৃত 'ব্রহ্মজ্ঞান' নামক ইংরাজী পুস্তক নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা শঙ্কর-ব্যাখ্যাত ঔপনিষৎ দর্শনের একটি অপূর্ব ভূমিকা। উপনিষদাবলীর অনুবাদ জার্মান ভাষায় পল এবারহার্ড, আলফ্রেড হিলেব্র্যাণ্ড, জোহানেস হার্পটেল, কে. এফ. গেল্ডনার ও পল টি হফ্‌ম্যান কর্তৃক এবং ফরাসী ভাষায় গুইলাম পউথিয়ার ও পিয়ার শালেট কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। আর গর্ডন মিলবার্ণ 'উপনিষদের ধর্মতত্ত্ব' নামে একটি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে বারখানি প্রধান উপনিষদের মনোনীত অংশগুলি আত্ম-তত্ত্ব, জ্ঞান-তত্ত্ব, সৃষ্টি-তত্ত্ব প্রভৃতি শীর্ষক অধ্যায়ে সজ্জিত। অটো বইট্‌লিঙ্ক ১৮৯১ খৃঃ লিপ্‌জিগ হইতে কঠ, ঐতরেয় এবং প্রশ্ন উপনিষদের মূল দেবনাগরী অক্ষরে জার্মান

অনুবাদ এবং পাদটীকা সহিত প্রকাশ করেন। আরম্ভিক ব্যাখ্যায় উক্তগ্রন্থে তিনি শঙ্করাচার্য্যকে সমালোচনা পূর্বক বলেন 'প্রধানতঃ আমি শঙ্কর ভাষ্যে মনোযোগ দিই নাই। কারণ, ঐ লোকটি প্রাচীন ভাষা ভালরূপে জানিতেম না ; ভাষাতত্ত্বেও তাঁহার দখল ছিল না এবং তিনি স্বীয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মূল ব্যাখ্যা করেছেন। যদি কেহ কোন অস্পষ্ট মূলাংশের গভীরার্থ করতে চান, তিনি যেন কোম পূর্ব সিদ্ধান্তের আলোকে তাহা না করেন। এইজন্য আমি কোন প্রকার দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে বিরত হয়েছি এবং ভাষাতত্ত্বের আলোকে সমর্থন যোগ্য অনুবাদ মাত্র করতে চেষ্টা করেছি।'

অটো বইট্লিঙ্ক ১৮৮৯ খৃঃ জার্মান অনুবাদ সহ ছান্দোগ্য উপনিষদের যে মূল দেবনাগরী অক্ষরে লিপ্‌জিগ হইতে প্রকাশ করেছেন, তাহাতেও উক্ত প্রকার মন্তব্য দৃষ্ট হয়। তিনি উক্ত উপনিষদের ভূমিকায় বলেন, 'আমি শঙ্কর ভাষ্যের কোন উদ্ধৃতি করি নাই, করার আবশ্যকও নাই। কারণ ; উপনিষদাবলীর উক্ত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ অমূলক।' 'ঔপনিষদ্ দর্শন' নামক ইংরাজী গ্রন্থ ১৮৮২ খৃঃ লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। ইহা আর্চিবল্ড ই. গাফ্ কর্তৃক রচিত। গাফ বইটলিঙ্ক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক মত পোষণ করেন এবং বলেন, 'উপনিষদাবলীর শাঙ্কর ব্যাখ্যাই একমাত্র স্বাভাবিক ও সমীচীন। ঔপনিষদ্ দর্শনের প্রকৃত ব্যাখ্যাই বেদান্ত।' জার্মান পণ্ডিত পল ডয়সনের মত তিনি বলেন, 'উপনিষদাবলী ভারতীয় মনীষার অপূর্ব সৃষ্টি। এই সকল গ্রন্থে যে গভীর ভাবরাশি লিপিবদ্ধ তাহা পরবর্তী যুগে ভারতীয় সাহিত্যে প্রভাবশালী। ঔপনিষদ্ ভাবধারার জ্ঞান না থাকিলে, ভারতীয় সাহিত্যে গভীর প্রবেশ অসম্ভব। ভারতীয় দর্শনের গভীর অধ্যয়ন করিতে হইলে সর্বপ্রথমে উপমিষদাবলী পড়িতে হইবে। উপনিষৎ-তত্ত্ব হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার ভিত্তি ভূমি।'

গোল্ড্‌ষ্টুকার সত্যই বলিয়াছেন, 'উপনিষদাবলী শিক্ষিত ভারতীয় ধর্মের মূল। উপনিষদাবলী ভারতীয় প্রতিভার উচ্চতম বিকাশ। পাঠক-পাঠিকা এই সকল গ্রন্থের যে মূল্যই দিন না কেন, এইগুলি প্রাচীন ভারতীয় মনীষার সর্বোচ্চ সৃষ্টি। ভারতীয় সাহিত্যের সারতত্ত্ব উপনিষদাবলীতে বিদ্যমান, ভারতীয় সাহিত্যের প্রত্যেক শাখা উপনিষদের আলোকে উজ্জ্বল।'

বৃহদারণ্যক উপনিষদের মনোনীত অংশাবলী দেবনাগরী অক্ষরে ইউজেন বারনফ্‌ কৃত ফরাসী বা লাটিন অনুবাদ সহ ১৮৩৩ খৃঃ প্যারিস হইতে প্রকাশিত হয়। উক্ত উপনিষদের একটী মূলবিহীন জার্মান অনুবাদ অটো বইট্‌লিঙ্ক ১৮৮৯ খৃঃ সেণ্ট পিটার্সবর্গ (অধুনা লেলিনগ্রাড) হইতে প্রকাশ করেন। ১৮৬১ খৃঃ ই. বি. কাওয়েল কর্তৃক শঙ্করানন্দের দীপিকা সহিত কৌষীতকি উপনিষদ সম্পাদিত এবং ইংরাজীতে অনূদিত হয়। ইহা কলিকাতার বিব্‌লোথিকা ইণ্ডিকার অন্তর্ভুক্ত। কৌষীতকি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ মোক্ষ-মূলার, কীথ এবং হিউম ও করিয়াছেন। আমেরিকা প্রাচ্য সমিতির পত্রিকায় হানস্‌ ওয়েরটেল কর্তৃক কেনোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ ১৮৯৪ খ্রীঃ বাহির হয়। রিচার্ড হাউসচাইল্ড শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের যে জার্মান করেন ১৯২৭ খৃঃ লিপজিক হইতে তাহা প্রকাশিত হয়। ইহাতে মূল সংস্কৃতাংশ রোমান হরফে প্রদত্ত। এল, পোলে, ই, রোয়ার, আলব্রেক্‌ত ওয়েবার, জোহানেস হার্টেল, ই, বি. কাওয়েল প্রভৃতি বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিত উপনিষদাবলীর মূল একত্রে বা পৃথকভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ডবলিউ. ডি. হুইটনি, অটো বইট্‌লিঙ্ক, আর্ণষ্ট উইণ্ডিশ, ডবলিউ কার্ফেল, অটো ওয়েকার, আলফ্রেড হিলেব্রাণ্ড, আলফাস ফুরষ্ট, এবং এরিক ফ্রানওয়াল্‌নার উপনিষদাবলীর প্রধানতঃ ভাষাতত্ত্ব

মূলক সমালোচনা পুস্তকাকারে লিখিয়াছেন। দশটি প্রধান উপনিষদে ছয়টি বিভক্তির যে বিবিধ ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তাহার বিস্তৃত তালিকা ও আলোচনা অটো ওয়েকারের গ্রন্থে আছে। পাণিণি ব্যাকারণের সহায়ে ওয়েকার দশটি উপনিষদের সৃষ্টিক্রম স্বীকার করেছেন। তাঁহার মতে শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রী উপনিষদ পাণিণির পরে এবং বাকী আটটি পাণিণির পূর্বে রচিত। কঠ, প্রশ্ন, বৃহদারণ্যক, মুণ্ডক এবং শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যত সমাসবদ্ধ পদ আছে, তাহাদের তালিকা উইলিবাল্‌ড কারফেলের জার্মান গ্রন্থে পাওয়া যায়।

থাডানস্ আনসেল্‌ম রিজনার, ফ্রেডরিক হিউগো, উইণ্ডিশমান, জে. ডি, লাঞ্জুইনে, আল্‌ব্রেক্‌ত ওয়েবার, মিসেস চার্লস স্পীয়ার, ফ্রেডরিক ম্যাক্সমূলার, ম্যাক্সকার্ল ভন ক্রেমপেল হিউবার, মিসেস চার্লট ম্যানিং, পল রেগনল্ড, আগষ্ট বার্থ, আর্চিবাল্ড গাফ, হার্মান ওল্ডেন বার্গ, লিওপল্‌ড ভন শ্রেডার, চার্লস রকওয়েল লানমান (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক), লিপ্‌জিগের রিচার্ড গার্ব, আর. ডবলিউ. থ্রেজার, হার্বার্ট বেনেস, (ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের) ই. ডবলিউ হপকিন্স, আলফ্রেড গোডেন, হার্ভে গ্রীসওল্‌ড, আর্থার ম্যাকডোনেল, হার্ভার্ডের জেসিয়া রয়েস, আর্থার ইয়ুইং. আনি বেসান্ত, পল অলট্রামের, এড্‌ুইন রামবল, মরিস ব্লুফিল্‌ড, এম. আর. রোচাস, ডবলিউ. এচ. জি. হোম্‌স, পল্ এল্‌মার মোর, আর. গর্ডন উইলবার্ণ, হার্মান জর্ড জ্যাকোবি, জে. এস. স্পেয়ার, আর. উবলিউ. ফ্রেজার, নিকল ম্যাকনিকল, জেম্‌স প্র্যাট, ফ্রানক্‌লিন এডগার্টন, হেনরিক লুডার্স, ডবলিউ-এস. আর্ক্‌হার্ট, এচ. ডবলিউ. স্কোমারস, ডরোথি জেন ষ্টিফেন, এডওয়ার্ড কার্পেণ্টার, জি. এ. ল্যাংলে, জর্জ উইলিয়াম ব্রাউন, বেটি হাইমান, বি. থ্যাডেগন, ফ্রেডারিক হেলার, বেরিডেল কীথ, অটো ষ্ট্রস, এম. উইণ্টারনিজ এবং এমিল

সেনার্ট প্রভৃতি বহু পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ উপনিষদের তত্ত্ব ব্যাখ্যামূলক সারগর্ভ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকে ইংরাজীতে, ফরাসীতে বা জার্মানীতে উপনিষদ্ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বা পুস্তক লিখিয়াছেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোসিয়া রয়েস এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গিফোর্ড বক্তৃতাবলী দিয়াছিলেন তাহাতে ঔপনিষদ্ দর্শনের গভীর আলোচনা আছে। 'বিশ্ব এবং ব্যক্তি' নামক সুবৃহৎ গ্রন্থে তাঁহার গিফোর্ড বক্তৃতাবলী প্রকাশিত। উক্ত পুস্তকে কয়েকটি উপনিষদ্ হইতে যে মূলানুবাদ আছে, সেগুলি তাঁহার সহকর্মী অধ্যাপক লানমান কর্তৃক লিখিত।

উপনিষদাবলীর ইংরাজী অনুবাদসমূহের মধ্যে এফ. ম্যাক্সমূলার এবং আর. ই. হিউমের অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ম্যাক্সমূলার ছিলেন জার্মান পণ্ডিত। তাঁহার প্রকৃত সংস্কৃতপ্রীতি উপনিষদাবলী কর্তৃক উৎপন্ন হয়। ১৮৪৪ খৃঃ যখন তিনি বার্লিনে শেলিঙ্কের বক্তৃতাবলী শুনিতেছিলেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি এই প্রাচীন দার্শনিক গ্রন্থাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। বার্লিন ত্যাগ করিবার অল্পকাল পরেই তিনি প্যারিসে আসিয়া বারনফের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। শেষে তিনি অক্সফোর্ডে যাইয়া সমগ্র জীবন বৈদিক সাহিত্য অধ্যয়নে উৎসর্গ করেন। এই গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন তাঁহার অতি প্রিয় ছিল। দেশবিদেশের বহু প্রাচ্য তত্ত্ববিদের সহযোগে অনেক বৎসর কঠোর পরিশ্রমের ফলে 'প্রাচ্যের ধর্মগ্রন্থাবলী' অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশ করেন। উক্ত বিশ্ববিখ্যাত সিরিজ ম্যাক্সমূলার কর্তৃক সম্পাদিত। ইহার প্রথম খণ্ডে বারখানি প্রধান উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ আছে। এই সকল অনুবাদ পাদ-টীকা এবং ভূমিকা সম্বলিত। এই যুগান্তরকারী সিরিজের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় ১৮৭৯ খৃঃ ম্যাক্সমূলার লিখিয়াছেন, 'উপনিষদাবলী জগতের

দার্শনিক গ্রন্থসমূহের আদি পুস্তক। আমার বিশ্বাস, এইগুলি যে কোন দেশে, যে কোন যুগে, মানব মনের অদ্ভুততম সৃষ্টিরূপে পরিগণিত হইবে এবং বিশ্বসাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিবে।'

বিদেশী পণ্ডিতকৃত এই ইংরাজী অনুবাদ মূল্যবান্ এবং নির্ভরযোগ্য। ইহার দ্বারা উপনিষৎ-তত্ত্ব সর্বদেশে প্রচারিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে অবস্থানকালে এই অমর জার্মান সংস্কৃতজ্ঞের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। স্বামিজী বলেন, 'ভারতের বেদভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য বৈদিক সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও বিশ্বে প্রচারার্থ ইউরোপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।' ম্যাক্সমুলার পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞগণের মধ্যে সর্বপ্রথম। ঋগ্বেদের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ তিনি অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশ করেন। ভারতে আগমনের সুযোগ তাঁহার হয় নাই। স্বামী বিবেকানন্দ যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার ভারত গমনের ইচ্ছা আছে কিনা তখন বৃদ্ধ মুনির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল এবং তাঁহার নয়ন যুগল সজল হইল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'আমি তাহলে আর ফিরব না, আমাকে তথায় ভস্মীভূত করতে হবে।' আর. ই. হিউম কৃত তেরখানি উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ অধ্যাপক আর. ডি রাণাডের মতে সর্বাপেক্ষা আধুনিক, সহজবোধ্য এবং প্রাঞ্জল। ইহাতে উপনিষৎ দর্শনের বিস্তৃত উপক্রমণিকা, পাদটীকা এবং বিস্তৃত গ্রন্থপঞ্জী আছে। উপক্রমণিকাটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং বাহাত্তর পৃষ্ঠা ব্যাপী। ডাঃ হিউম নিউইয়র্ক ইউনিয়ন থিয়লজিক্যাল সেমিনারীতে ধর্মেতিহাসের অধ্যাপক। তিনি দর্শনের ইতিহাসে উপনিষদাবলীকে উচ্চস্থান প্রদান পূর্বক মন্তব্য করেন, 'নিঃসন্দেহে উপনিষদাবলীর ঐতিহাসিক এবং তুলনামূলক মূল্য সমধিক। আধুনিক কালেও এই সকল গ্রন্থ পাঠের বিশেষ আবশ্যকতা আছে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, উপনিষদোক্ত অদ্বৈতবাদ

পাশ্চাত্য অদ্বৈতবাদের উপর গভীর প্রভাব অতীতে বিস্তার করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরো করিবে। কারণ, এইসকল গ্রন্থে যে সকল তত্ত্ব নিহিত, সেগুলিতে প্রত্যেক দার্শনিক উপনীত হইতে বাধ্য, যদি তিনি মানব অভিজ্ঞতার গভীর বিশ্লেষণ করেন।'

ফ্রেডরিক হিউগো উইণ্ডিশম্যান তাঁহার পিতা কার্ল জোসেফ উইণ্ডিশম্যানের গ্রন্থে ঔপনিষৎ তত্ত্ব সম্বন্ধে লাটিন ভাষায় একটী অধ্যায় সংযোজিত করেন। উক্ত বিষয়ে ইহা একটী অতি প্রাচীন গ্রন্থ এবং ১৮২৭-৩৩ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ইহা খুব উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কারণ, ইহা বৈয়াকরণিক ও ঐতিহাসিক বিবেচনা দ্বারা উপনিষৎ যুগ নির্ধারণের প্রথম প্রচেষ্টা। রিচার্ড গার্বে তাঁহার জার্মান গ্রন্থে মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রাগ্বৌদ্ধ যুগের (খৃষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী হইতে ষষ্ঠ শতাব্দী) উপনিষদ্‌গুলি ভারতীয় দর্শনের আদি উৎস। এই সকল উপনিষদে উৎপন্ন ভাবরাশি পরবর্তী কালে দেশের দার্শনিক চিন্তার নিয়ামক হইয়াছে। চার্লস জনষ্টনের মতে উপনিষদ্ নামক মহাগ্রন্থসমূহ গভীর স্থির পার্বত্য হ্রদতুল্য, চিরতুষার বিগলিত বিশুদ্ধ বারিপূর্ণ, উজ্জ্বল সূর্য্যকরে উদ্‌ভাসিত এবং রাত্রিতে তারকারাজির উচ্চ সৌম্যতায় বিমণ্ডিত। আর. গর্ডন মিলবার্ণ ছিলেন কলিকাতা বিশপ কলেজের ভূতপূর্ব সহকারী অধ্যক্ষ এবং খৃষ্টান মিশনারী। উপনিষদ্ তত্ত্বের আধুনিক প্রয়োজন সম্বন্ধে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব তিনি করিয়াছেন। মাদ্রাজের অধুনালুপ্ত 'ইণ্ডিয়ান ইণ্টারপ্রিটার' পত্রিকায় তিনি ১৯১৩ খৃঃ 'খৃষ্টান বেদান্তবাদ' শীর্ষক একটী সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। মিলবার্ণ উক্ত প্রবন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন, 'ভারতে খৃষ্টান ধর্মে বেদান্তের আলোক আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, আমরা, মিশনারীগণ, এতকাল ইহার অভাব অনুভব করি নাই। সেইজন্য আমাদের স্বকীয় ধর্মেও আমরা সানন্দে স্বাধীন

ভাবে বিচরণ করিতে পারিনা। আমাদের ধর্মের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রকাশক শব্দও ভঙ্গী নাই। বেদান্ত সাহিত্যের কতকগুলি অংশ বা গ্রন্থকে বাইবেলের অঙ্গীভূত করিলে আমাদের পক্ষে অতিশয় উপকারক হইবে। গির্জায় উপাসনাকালে বাইবেলের সহিত উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিবার জন্য গির্জাকৃত পক্ষের অনুমতি গ্রহণ আবশ্যক।" তৎপরে উক্ত উদ্দেশ্যে এই চিন্তাশীল লেখক অন্যান্য হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের মধ্যে ছয়টী উপনিষদের কতকগুলি অংশ উল্লেখ করিয়াছেন।

হারমান ওল্ডেনবার্গের মতে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার চিন্তা, প্রতীক ও প্রকাশভঙ্গী বৌদ্ধধর্মে গৃহীত হইয়াছে। তিনি বলেন, 'কঠোপনিষদের উৎপত্তিকাল সম্বন্ধে আমার ধারণা যদি সত্য হয়, তাহলে ইহাতে মূল্যবান ইঙ্গিত আছে। ইহার ভাবরাশিতে বৌদ্ধ ধর্মের সূচনা পাওয়া যায়।' আগষ্টবার্থ তাঁহার ফরাসী গ্রন্থে বলেন, 'উপনিষৎ-সমূহে যে দার্শনিক চিন্তা অভিব্যক্ত তাহা চিরকাল ভারতের অন্তরে প্রিয় থাকিবে। ভারতের ধর্মসম্প্রদায় সকল যুগে যুগে উপনিষৎ তত্ত্বে প্রভাবিত হইবে। এই দেশের কবিগণ ও মনীষিগণও এই গূঢ় রহস্যে আবহমানকাল প্রীতি লাভ করিবে।' রিচার্ড গার্বে লিখিত 'প্রাচীন ভারতের দর্শন' ১৮৯৯ খৃঃ চিকাগো হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে এই জার্মান মনীষি সত্যই বলিয়াছেন, "পুরাতন উপনিষাদাবলীতে পরাবিদ্যা লাভের যে অপূর্ব সাধনা দেখা যায়, তাহা জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়। বস্তুতঃ এই সকল প্রাচীন গ্রন্থে যে সকল দর্শনিক ভাব আছে, তাহা চিন্তা করিতে আমাদের মাথা ঘুরিয়া যায়। উপনিষৎ পাঠে ব্রহ্মধ্যানে পাঠক অনুপ্রেরিত হন। ক্যাণ্টের 'ডিং আনসিক' বা ব্র্যাডলির 'অ্যাবসলিউট'কে উপনিষদুক্ত ব্রহ্মের নামান্তর বলা যেতে পারে। জীবাত্মাই বিশ্বাত্মা বা পরব্রহ্ম। উপনিষদের ভাষা অদ্ভুত

শক্তিতে সঞ্জীবিত। সেই যুগের দার্শনিকগণের অনুভূতিরাশি উপনিষদে লিপিবদ্ধ। যাহা ভাষায় প্রকাশ যোগ্য নহে, তাহাই ক্রমাগত নূতন শব্দে, ভাবে, উপমায় প্রকাশিত।”

আর্থার ম্যাকডোনেল প্রণীত 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' ১৯০০ খৃঃ যুগপৎ লণ্ডন ও নিউইয়র্ক হইতে প্রকাশিত হয়। উক্তগ্রন্থে এই ইংরাজ মনীষি বলেন, 'বিশ্বতত্ত্বের সম্পূর্ণ এবং যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা উপনিষদে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নাই। এই গ্রন্থগুলি অর্ধকবিত্বপূর্ণ, অর্ধদার্শনিক কথোপকথন ও বিচারের সমষ্টি। ইহাদের সর্বত্র দার্শনিক প্রশ্নের সমাধান চেষ্টিত। এই সকল চিন্তারাশিকে গৌড়পাদ ও শঙ্কর প্রভৃতি দার্শনিকগণ সুসংবদ্ধ দর্শনে পরিণত করিয়াছেন।' ১৮৯০ খৃঃ আমেরিকার প্রাচ্য সমিতির মুখপত্রে 'প্রাণায়ামতত্ত্ব' সম্বন্ধে আর্থার ইউয়িং একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। হিন্দুপ্রাণবিজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ সুগভীর আলোচনা খুবই কম দেখা যায়। প্রাণ সম্বন্ধে সংহিতা, ব্রাহ্মণ এবং উপনিষদাবলীতে যে সকল তথ্য আছে, সেগুলি নিঃশেষে সংগৃহীত এবং বিষয়ানুক্রমে এই পুস্তকে সজ্জিত। বেমেস হারবার্টের 'প্রাচ্যের আদর্শ' শীর্ষক সারগর্ভ গ্রন্থখানি ১৮৯৮ খৃঃ লণ্ডন হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাতে গ্রন্থকার বলেন, 'ভারতীয় প্রতিভার অপূর্ব সৃষ্টি স্বরূপ এই উপনিষদাবলীর মত কোন শ্রেণীর দার্শনিক সাহিত্য ইউরোপের ভাবী ভাবধারার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না।' বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে পল্ ডয়সনের জার্মান গ্রন্থখানি জে. এইচ. উড্স, সি. ভি রাঙ্কল এবং চার্লস জনষ্টন কতৃক ইংরাজীতে অনূদিত। জার্মান গ্রন্থকার উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, 'ভারতীয় প্রজ্ঞা-বৃক্ষে উপনিষদের মত সুন্দর পুষ্প ফুটে নাই এবং বেদান্ত দর্শনের মত সুমিষ্ট ফল ফলে নাই। উপনিষদের ভাবরাশি হইতে বেদান্ত

দর্শন উদ্ভূত এবং আচার্য শঙ্কর কর্তৃক বর্তমান আকারে পরিণত। অদ্যাপিও শঙ্কর-দর্শন প্রায় সকল চিন্তাশীল হিন্দুর ধর্মবিশ্বাসরূপে গৃহীত। পাশ্চাত্যে উক্ত দর্শনের বিস্তৃত অধ্যয়নও আলোচনা আবশ্যক।'

জার্মান দার্শনিক সোপেনহয়ারের মতে উপনিষদালী সর্বোচ্চ মনীষার অপূর্ব সৃষ্টি। ১৮১৮ খৃঃ তিনি লিখিয়াছেন, 'অতীত শতাব্দী-সমূহ অপেক্ষা উনবিংশ শতাব্দীর সুবর্ণ সুযোগ এবং দুর্লভ সৌভাগ্য এই যে, উপনিষাদাবলীর সাহায্যে আমরা বেদের সহিত পরিচিত হইতেছি।' 'ভাবরূপে বিশ্ব' নামক তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি ভাবাবেশে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেন, "উপনিষদাবলী সম্পূর্ণরূপে বেদের পূতভাবে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক পাঠক বা পাঠিকার হৃদয় এই সকল গ্রন্থের সযত্ন অধ্যয়ন দ্বারা বেদের ভাবে ভাবিত হইবেন। উপনিষদের প্রত্যেকটি বাক্যে গভীর অর্থ নিহিত। ইহাদের প্রত্যেকটি শ্লোক গভীর, মৌলিক, সুমহান্ ভাবধারার অনন্ত উৎস। প্রত্যেক উপনিষৎ বিশুদ্ধ, সুউচ্চ, আন্তরিক দার্শনিক আলোচনায় পরিপূর্ণ। যখন আমরা এইসকল গ্রন্থ পড়ি, তখন ভারতীয় পরিবেশে পরিবেষ্টিত এবং মুনি ঋষিগণের দিব্য ভাবে অভিভূত হই। ইহুদী ধর্মের কুসংস্কার বা অন্যান্য দার্শনিক যুক্তির শুষ্ক শৃঙ্খল তখন মন হইতে খসিয়া পড়ে। আমাদের ধর্ম এখন বা কখনো ভারত ভূমিতে মূল গাড়িতে পারিবে না। গ্যালিলির ঘটনাস্রোতে মানব জাতির আদিম প্রজ্ঞারাশি ভারত হইতে কখনো বিধৌত হইবে না; অপর পক্ষে ভারতীয় প্রজ্ঞা ইউরোপে প্রবাহিত হইয়া আমাদের জ্ঞানরাজ্যে ও চিন্তাজগতে তুমুল পরিবর্তন আনিবে।" লাহোরের দুর্গাপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি ১৮৯৮ খৃঃ ইংরাজীতে কেনোপনিষদের একটি ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেন।

উক্ত অনাড়ম্বর গ্রন্থের অনুবাদক যে মহৎ ভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমার মতে সকল হিন্দুর প্রকৃত মনোভাব রূপে গণ্য হইতে পারে। দুর্গাপ্রসাদ বলেন, 'উপনিষৎ পাঠে মানুষ ধার্মিক হয়। ভারতের এইসকল দার্শনিক গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন গ্রন্থে এত গভীর ধর্মভাব বর্ণিত হয় নাই।' আমার মতে উপনিষৎ ব্যতীত অন্য কোন শাস্ত্রে এত সুমহৎ আধ্যাত্মিক অনুভব অভিব্যক্ত হয় নাই। ওঁ তৎ সৎ।

গীতার উত্তম রহস্য

আত্মজ্ঞান আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় স্বরূপ। গীতা ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম ভাগে ধ্যান যোগের বর্ণনা করিয়াছে। এইরূপ সাধনার দ্বারা যোগী যে আত্মজ্ঞান লাভ করেন তাহার স্বরূপ কি এবং এই জ্ঞানলাভের ফলে তাঁহার ব্যবহারিক জীবন কিরূপ হয় তাহাই বর্ণনা করিতে ভগবান বলিলেন,

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

"যাঁহার আত্মা যোগযুক্ত, তিনি আত্মা সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে অবস্থিত দেখেন, তিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়। উপনিষদে আত্মার স্বরূপ যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে গীতা এখানে

তাহারই সারসংগ্রহ করিয়া দিয়াছে। এখানে ঈশোপনিষদের ভাষাও গ্রহণ করা হইয়াছে। আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে ঐ উপনিষদে বলা হইয়াছে।

যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥৬

"কিন্তু যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মাকে দেখেন এবং সর্ব্বভূতকে আত্মার মধ্যে দেখেন, তিনি কোন কিছু হইতেই সঙ্কুচিত হন না।"

কঠোপনিষদে বলা হইয়াছে,

এষ সর্ব্বেষু গূঢ়েষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥১২

"সকল জিনিষের অন্তরে গূঢ় এই আত্মা প্রকাশ পায় না—তবে সূক্ষ্মদর্শীরা একে দর্শন করেন সূক্ষ্ম ও একমুখী বুদ্ধি দিয়া।"

সেই যুগে অধ্যাত্মসাধনা সংসারত্যাগ ও সন্ন্যাসের দিকে ঝুঁকিয়াছিল—গীতা ইহারই প্রতিরোধ করিতে চাহিয়াছে, বলিয়াছে যে, আত্মাকে লাভ করিতে হইলে সংসার ছাড়িয়া যাইতে হয় না, আত্মা যে শুধু বিশ্বের অতীতেই রহিয়াছে তাহা নহে, সেটা কেবল আত্মার তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা—কিন্তু সেই একই আত্মা আবার বিশ্বে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মা রহিয়াছে, আত্মার মধ্যেই সর্ব্বভূত রহিয়াছে—অতএব আত্মার সন্ধান করিবার জন্য সংসার ছাড়িয়া, সংসারের কর্ম্ম ছাড়িয়া, বিশ্বাতীত চৈতন্যে লীন হইবার আশঙ্কা নাই। বিশ্বের সকল বস্তু সেই এক আত্মারই রূপ, সকল কর্ম্ম সেই আত্মারই অভিব্যক্তি—সকল বস্তু সকল ভাবে সকল কর্ম্মের ভিতরই আত্মাকে লাভ করিতে হইবে—ইহাই যে সর্ব্বোচ্চ অধ্যাত্ম আদর্শ তাহা দেখাইবার জন্যই গীতা এখানে ঈশা উপনিষদের ভাষাই গ্রহণ করিয়াছে। ধ্যানযোগের দ্বারা অত্যন্ত

সুখময় যে ব্রহ্মের স্পর্শলাভ করিতে হইবে—সকল সকল কর্ম্মের ভিতরই সেই স্পর্শলাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর সর্ব্বত্র রহিয়াছেন ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বম্—গীতা ঈশা উপনিষদের সুস্পষ্ট শিক্ষা পুনরায় প্রচার করিয়াছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য গীতার এই শিক্ষাকে উল্টাইয়া দিলেন।—আবার সেই সংসার ত্যাগ ও সন্ন্যাসের শিক্ষা প্রচার করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় গীতা সন্ন্যাসের প্রতিরোধ করিবার জন্য এই যে শ্লোকটি দিয়াছে, শঙ্কর এইটির ব্যাখ্যাতেই বলিয়াছেন—ইদানীং যোগস্য যৎ ফলং ব্রহ্মৈকত্বদর্শনং সর্ব্বসংসারবিচ্ছেদ কারণং তৎ প্রদর্শ্যতে।—এক্ষণে সকল সংসারের বিচ্ছেদকারণ যোগের ফল যে ব্রহ্মৈকত্বজ্ঞান তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। শঙ্কর এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ করিয়াছেন :—এই যে লক্ষ কোটি জীব এই লইয়া বিশ্বের মেলা, এ সবই মায়া, মিথ্যা, রজ্জুতে সর্পভ্রম, জগৎ কখনও হয় নাই, হইবে না—এক আত্মাই সত্য, তিনিই ব্রহ্ম,—তিনি নিষ্ক্রিয়, নিরাকার শুদ্ধসত্তা, তাঁহার ক্রিয়া নাই, তাঁহার নাম রূপে কোন বিশেষ নাই। যোগী "সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ" হন। অর্থাৎ জগতে যত বৈষম্য ও ভেদ দেখা যাইতেছে, নানা দেখা যাইতেছে, এসব তিনি মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধি করেন—সর্ব্বত্র এক নির্ব্বিশেষ আত্মা বা ব্রহ্মকেই দেখেন, আর সর্ব্বভূতকে দেখেন ব্রহ্মের উপর কল্পিত মায়ার খেলা, রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম। দার্শনিক মত হিসাবে শঙ্কর ইহা প্রচার করিতে পারেন, কিন্তু গীতার এই শ্লোকটির যে ইহাই অর্থ একথা তিনি বলিয়াছেন যেন গায়ের জোরে—কারণ ঐ শ্লোকের কথাগুলিতে এরূপ অর্থের বিন্দুমাত্র ইঙ্গিতও নাই। এতদিন ভারতবাসী গীতার শিক্ষা মনে করিয়া শঙ্করের মতবাদই গ্রহণ করিয়াছে—গীতার প্রকৃত শিক্ষা চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ঈশা উপনিষদ বা গীতা এমন কথা বলে

নাই যে সর্ব্বভূত মিথ্যা, একমাত্র আত্মাই সত্য, তাহারা বলিয়াছে সর্ব্বভূত আছে এবং সর্ব্বভূতের মধ্যে এক আত্মা বিরাজ করিতেছে। বহু ভূতের মধ্যে এক আত্মা কেমন করিয়া থাকে? সেই একই সঙ্গে আবার সর্ব্বভূত ঐ একই আত্মার মধ্যে কেমন করিয়া থাকে? জড় বস্তুর পক্ষে ইহা সম্ভব নহে—কিন্তু আত্মার পক্ষে ইহা সম্ভব, ইহা আত্মার চৈতন্য শক্তির ক্রিয়া, শঙ্কর এই চৈতন্যশক্তির ক্রিয়ার মর্ম্ম উপলব্ধি করেন নাই। তাই তিনি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন এই জগৎব্যাপার মিথ্যা মায়ার রচনা। বাস্তবে ইহার কোনই অস্তিত্ব নাই। সর্ব্বভূতের মধ্যে এক আত্মা রহিয়াছে, আর সর্ব্বভূত ঐ আত্মার মধ্যে রহিয়াছে—ইহ সম্ভব হইয়াছে এইজন্য যে ঐ এক আত্মাই সর্ব্বভূত হইয়াছে—

—সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূৎ

—ঈশা ৭

চৈতন্যের কি ক্রিয়ার দ্বারা আত্মা সর্ব্বভূত হইয়া নিজের মধ্যে সর্ব্বভূতকে ধরিয়া রহিয়াছে এবং নিজে সর্ব্বভূতের মধ্যে রহিয়াছে—উপনিষদ কোথাও তাহা ব্যাখ্যা করে নাই, সাধকদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির জন্য রাখিয়া দিয়াছে। ঈশা কেবল ইহাই বলিয়াছে যে, যে সাধক এই উপলব্ধি লাভ করিবে, সে সমস্ত শোক দুঃখ মোহ অতিক্রম করিবে—

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।

গীতাও কোন ব্যাখ্যা দেয় নাই, উপনিষদের বাক্য প্রমাণ দিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুগে মানুষ বুদ্ধি দিয়াই সব কিছু বুঝিতে চায়, নতুবা সে অধ্যাত্মসাধনার পথেই অগ্রসর হয় না—সেইজন্য শ্রীঅরবিন্দ ঐ চৈতন্যক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা দিয়াছেন তাঁহার The Life Divine গ্রন্থে। যে ক্রিয়ার দ্বারা এক আত্মা বহুভূত হন; শ্রীঅরবিন্দ

তাহাকে Supermind বা অতিমানস চৈতন্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এক ব্রহ্ম বা আত্মাই যে নিজে বহু হইয়াছেন, উপনিষদে তাহা বহু স্থানে অতি স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। "তদৈচ্ছৎ, বহুস্যাম্" —তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব। ইহাই সৃষ্টির আরম্ভ—সৃষ্টির আরম্ভে তিনি একই ছিলেন,—

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্

—ছান্দোগ্য ৬।২।১

ইদংপদবাচ্য সমস্ত জগৎ একমাত্র অদ্বিতীয় সৎরূপেই পূর্ব্বে ছিল।

তদৈক্ষত তদসৃজত তৎ সর্ব্বমভবৎ

—তৈত্তিরীয় ২।৬

বৃহদারণ্যক ১।৪।১১

ছান্দোগ্য ৬।২।৩

তিনি দর্শন করিলেন, সমস্ত সৃষ্টি করিলেন, আপনিই সমস্ত হইলেন। তিনি কি দর্শন করিলেন? তিনি ছাড়া ত দ্বিতীয় কিছু নাই—তিনি নিজেই নিজেকে দর্শন করিলেন—নিজের মধ্যে যে অনন্ত সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে তাহা দর্শন করিলেন, নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী সুসমঞ্জস ভাবে তাহার অনন্ত সত্তা হইতে, কতকগুলি সম্ভাবনা প্রকট করিলেন। ইহাই সৃষ্টি ক্রিয়া, তাঁহার এই পরিকল্পনাই Supermind বা অতিমানস। মানুষ মনে যে সঙ্কল্প করে, পরিকল্পনা করে—তাহা আপনা আপনি কার্য্যে পরিণত হয় না, অনেক সময় তাহা ফাঁকা পরিকল্পনা, কখনই কার্য্যে পরিণত হয় না, কিন্তু যে চৈতন্যের দ্বারা ভগবান্ পরিকল্পনা করেন, তাহাতে শক্তি নিহিত রহিয়াছে; তাহা একই সংগে চিৎ ও শক্তি। তাই ভগবান যেমন পরিকল্পনা করিলেন, সঙ্কল্প করিলেন, অমনই তাহা কার্য্যে পরিণত হইল—তাই শ্রীঅরবিন্দ ইহাকে

Supermind বা অতিমানস বলিয়াছেন ; ইহা মানস চৈতন্য নহে, তাহা অপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব, মানসচৈতন্য তাহারই একটি নিম্নতর ক্রিয়া। ব্রহ্ম একই সঙ্গে সৎ, চিৎ এবং আনন্দ—তাঁহার সেই চিৎ বা চৈতন্য যখন সৃজনশীল হয়, তখনই তাহা হয়, Supermind বা অতিমানসচৈতন্য। এই সৃজনশীলন অতিমানস চৈতন্যের দুইটি ক্রিয়া—সমপ্রবোধাত্মক (Comprehending consciousness) এবং (Apprehending consciousness) প্রতিবোধক চৈতন্য। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে যাহা কেন্দ্রীভূত ছিল, তাহাই প্রসারিত বা ব্যক্ত করা হইল—যাহা ছিল দেশ ও কালের অতীত, তাহাই দেশ ও কালে বিস্তৃত হইল ; এবং ইহা হইল ব্রহ্মচৈতন্যের একটি ক্রিয়া। আমাদের মনের মধ্যে যেমন নানা চিন্তা ও ভাবের খেলা চলিতেছে—ব্রহ্মচৈতন্যে তেমনই সর্ব্বভূতের প্রকাশ হইল—এই সর্ব্বভূত বাহির হইতে আসিল না, শূন্য হইতেও সৃষ্টি হইল না, যাহা ছিল ব্রহ্মের মধ্যে নিহিত, তাহাই প্রকট হইল। আমি যেমন আমার চিন্তা ও ভাবসকলকে কোন পৃথক সত্তা বলিয়া দেখি না—বাহিরের জিনিষ বলিয়া দেখি না, আমার নিজের সহিত এক করিয়া দেখি, কারণ সেসব আমার চৈতন্যেরই বিভিন্ন রূপ, আমার চৈতন্যের মধ্যেই রহিয়াছে, আমিও সেই সবের মধ্যে রহিয়াছি—বস্তুতঃ সবই আমি, আমিই সব, সেখানে বহু রহিয়াছে বটে, কিন্তু সে বহু বস্তুতঃ একই ; কারণ আমার সব চিন্তা ও ভাব আমা হইতে ভিন্ন কিছুই নহে। ব্রহ্ম তাঁহার যে চৈতন্যক্রিয়ায় এইভাবে বিশ্বজগৎ ও তাহার সকল বস্তু ও ঘটনাকে নিজের মধ্যে দেখেন—সেইটিই হইল Comprehending consciousness, সমপ্রবোধাত্মক চৈতন্য—এইটিই অতিমানস চৈতন্যের প্রথম স্বরূপ, Primary supermind, ইহার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন—

"In that specious equality of oneness, the Being is not divided and distributed ; equably self-extended, pervading its extension as one, inhabiting as one the multiplicity of forms, it is every where at once the single and equal Brahman. For this extension of the being in time and space and this pervasion and indwelling is in intimate relation with the absolute unity from which it has proceeded with that absolute indivisible, in which there is no centre or circumference but only the timeless and spaceless one. That high concentration of unity in the unextended Brahman must necessarily translate itself in the extension by this equal pervasive concentration, this indivisible comprehension of all things, this universal undistributed immanence, this unity, which no play of multiplicity can abrogate or diminish. "Brahman is in all things, all things are in Brahman, all things are in Brahman," is the triple formula of the comprehensive Supermind, a single truth of self-manifestation, in three aspects which it holds together and inseparably in its self-view as the fundamental knowledge from which it proceeds to the play of the Cosmos." (Life Divine Vol I, P. 211)

ব্রহ্ম দেখেন সমগ্র জগৎ ও সর্ব্বভূত তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, তিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে রহিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বভূত হইয়াছেন। গীতা অন্যত্র দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছে—যেমন সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল বায়ু আকাশের মধ্যে রহিয়াছে, তেমনই সর্ব্বভূত ব্রহ্মের মধ্যে রহিয়াছে এইরূপ ধারণা করিতে হইবে। ব্রহ্ম কেমন করিয়া সর্ব্বভূতের মধ্যে রহিয়াছেন? ঘটের মধ্যে আকাশ রহিয়াছে আবার এই ঘট রহিয়াছে

আকাশ মধ্যে—এইভাবে ধারণা করা যায়। বস্তুতঃ ইহা হইতেছে চৈতন্যের ক্রিয়া, স্থূল দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহা ঠিক বুঝা যায় না। তবে এই তত্ত্বের উপর একাগ্রতা অভ্যাস করিলে মনের উপর যে আবরণ রহিয়াছে তাহা খুলিয়া যায়, মন অতিমানস জ্যোতিতে আলোকিত হয়। তখন ব্রহ্মের আত্মপ্রকাশের এই ত্রয়ী সূত্র সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি করা যায়। ব্রহ্ম যেভাবে জগতের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখেন, অজ্ঞান মানবীয় মন সে ভাবে দেখিতে পায় না। আমরা দেখি আমরা স্বতন্ত্র জীব, বিশ্বের সব কিছু রহিয়াছে আমাদের বাহিরে, আমরা তাহাদের মধ্যে নাই, তাহারাও আমাদের মধ্যে নাই। শঙ্করাচার্য্য উল্লিখিত অতিমানসচৈতন্যের সন্ধান পান নাই। তিনি শুধু মানস চৈতন্যই দেখিয়াছিলেন—এবং এই চৈতন্য যে ভ্রান্তিমূলক তাহা সুস্পষ্ট। কারণ অধ্যাত্ম অনুভূতিতে দেখা যায়, ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়—কিন্তু মন সর্ব্বত্র ভেদ দেখিতেছে, অসংখ্য বিভিন্ন জীব ও বস্তু দেখিতেছে, ইহাদের মধ্যে একত্ব কোথাও দেখিতে পাইতেছে না। তাই শঙ্কর বলিতে বাধ্য হইয়াছেন, এই মন হইতেছে মায়ার খেলা; জগৎ এই মায়ার সৃষ্টি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ দেখাইয়াছেন, মন ঐ অতিমানস চৈতন্যেরই একটি রূপ ও ক্রিয়া। অতিমানস চৈতন্য কেমন করিয়া শেষে মনে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা বুঝিতে হইলে অতিমানসচৈতন্যের দ্বিতীয় ক্রিয়াটিকে দেখিতে হয়—ইহাকেই শ্রীঅরবিন্দ Apprehensive consciousness বা প্রতিবোধক চৈতন্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন—

"This faculty we find in a secondary power of the creative knowledge, its power of projecting, confronting and apprehending consciousness, in which knowledge centralises itself and stands back from its works to observe them. And when we speak of centralisation, we mean, as

distinguished from the equable concentration of consciousness, of which we have hitherto spoken, an unequal concentration in which there is the beginning of self-division—of its phenomenal appearance. First of all, the Knower holds himself concentrated in knowledge as subject and regards his force of consciousness as if continually proceeding from him into the form of himself, continually working in it, continually drawing back into himself, continually issuing forth again. From this single act of self-modification proceed all the practical distinctions upon which the relative view and the relative action of the universe is based. A practical distinction has been created between the Knower, Knowledge and the Known, between the Lord, His force and the children and we works of the Force, between the Enjoyer, the Enjoyment and the Enjoyed, between the Self, Maya and the becomings of the Self.

"Secondly, the conscious Soul concentrated in knowledge, this Purusha observing and governing the Force that has gone forth from him, his Shakti or Prakiti, repeats himself in every form of himself. He accompanies, as it were, his Force of consciousness into its works and reproduces there the act of self-division from which this apprehending consciousness is born. In each forms this Soul dwells, with his Nature and observes himself in other forms from that artificial aud practical centre of consciousness. In all it is the same Soul, the same divine Being ; the multiplication of centres is only a practical act of consciousness intended to institute a play of difference,

of mutuality, mutual knowledge, mutual shock of Force mutual enjoyment, a difference based upon essential unity, a unity realised on a practical basis of difference."

(Life Divine 1—212)

সমপ্রবোধাত্মক চেতনায় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম নিজেকে বিস্তৃত করিয়া দেখিতেছেন, সেখানে দ্রষ্টা ও দৃশ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এরূপ কোন স্পষ্ট ভেদ নাই। যেমন আমরা যখন নানা চিন্তা করি বা সুখদুঃখ বোধ করি—আমরা যে ঐসব হইতে কোন ভাবে পৃথক, এ জ্ঞান থাকে না, আমিই সুখী আমিই দুঃখী, এইরূপ অনুভব থাকে—সেখানে "আমি" জ্ঞানটাই ফুটিয়া উঠে না। যখনই অন্য কোন বস্তু বা ভাব বা মনুষ্য আমাদের সম্মুখে আসে—তখনই আমি এবং আমি ছাড়া অন্য বস্তু ঐরূপ ভেদজ্ঞান ফুটিয়া উঠে—এই ভেদ হইতেই আইসে প্রতিবোধক চেতনা এবং তাহার স্বরূপ হইতেছে দ্রষ্টা ও দৃশ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ভোক্তা ও ভোগ্য, এইরূপ প্রভেদ। সচ্চিদানন্দ একমেবাদ্বিতীয়ম্, তিনি ছাড়া আর কেহ নাই—অন্য কেহ যে তাঁহার সম্মুখে আসিবে, এমন কোন সম্ভাবনা নাই—কিন্তু তিনি নিজেকেই যেন দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ হন দ্রষ্টা, জ্ঞাতা, ভোক্তা আর এক ভাগে হন দৃশ্য, জ্ঞেয়, ভোগ্য;—একভাগে হন পুরুষ, আর একভাগে হন প্রকৃতি—এই স্বগত ভেদ হইতেই জগতের উদ্ভব, কিন্তু এই ভেদ পারমার্থিক নহে, চরম নহে—ইহা ব্যবহারিক; এক সচ্চিদানন্দ নিজেই নিজেকে আস্বাদন করিবেন বলিয়া দুই হইয়াছেন। এখন বুঝা গেল ব্রহ্মই কেমন করিয়া জগৎ হইয়াছেন। আমাদের সাধারণ চেতনা হইতেই এই স্বগতভেদের উপমা পাই। যখন আমি খুব ক্রোধ করি, তখন আমিই যেন ক্রোধস্বরূপ হইয়া পড়ি, আমি এবং আমার মধ্যে ক্রোধ, এই

দুইয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই এবং সেই ভেদের জ্ঞানও থাকে না, কিন্তু আমিই আবার—চৈতন্যের কেন্দ্রীকরণ করিয়া আমার মধ্যে ঐ ক্রোধের দ্রষ্টা হইতে পারি—দেখিতে পারি আমার মধ্যে কেমন ক্রোধের ক্রিয়া হইতেছে—তখন আমি হই ক্রোধের দ্রষ্টা এবং আমার ঐ ক্রোধই হয় দৃশ্য। ঠিক এইভাবেই এক ব্রহ্ম নিজেকে দুইভাগ করিয়া পুরুষ ও প্রকৃতি হইয়াছেন। ব্রহ্মের মধ্য হইতেই শক্তি উৎসারিত হইয়া জগতের নানা নাম-রূপের সৃষ্টি করিতেছে; ব্রহ্ম সেই শক্তির খেলাকে দেখিতেছেন, নিজের মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছেন, এই দেখা এবং এই ধরিয়া থাকাতেই তাঁহার আনন্দ —মা যেমন নিজ দেহ হইতে সন্তান প্রসব করিয়া তাহাকে বুকে করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া আনন্দ পান। ব্রহ্মেরই শক্তি ব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্মেরই নানা রূপ সৃষ্টি করিতেছে—যেমন এক বৃক্ষের মধ্যে ঐ বৃক্ষের রস সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া নানা শাখা, পল্লব, পুষ্প, ও ফল সৃষ্টি করিতেছে—সে সব ঐ বৃক্ষেরই নানা নাম ও রূপ।

প্রতিবোধক চেতনার প্রাথমিক ক্রিয়ায় এক সচ্চিদানন্দের মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতি এইরূপে ভেদজ্ঞান হইতেছে, ঐ চেতনারই দ্বিতীয় ক্রিয়ায় ঐ একই পুরুষ আবার বহু পুরুষ হইতেছেন—আকাশের এক চাঁদ যেমন অসংখ্য পুষ্করিণীতে প্রতিফলিত হইয় অসংখ্য চাঁদ হইতেছে, তেমনই এক পুরুষ প্রকৃতির অসংখ্য রূপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অসংখ্য পুরুষ হইতেছে। এই যে পুরুষ নিজেকে যেন বিভক্ত করিয়া প্রকৃতির এক একটি রূপে প্রবেশ করিতেছে, ঐ বিশিষ্ট রূপের বিকাশকে ধরিয়া রহিয়াছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে—ইহাই জীবাত্মা—ইহাই ঐ একই বিশ্বপুরুষের ব্যষ্টিগত সত্তা, 'মমৈবাংশ'। এই ভাবেই এক পুরুষ বহু দেহকে অবলম্বন করিয়া বহু পুরুষ হইতেছেন, এবং পরস্পরের

সহিত আদান-প্রদানের, সম্বন্ধের, প্রেমের আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।

কিন্তু যদিও ব্রহ্ম এইভাবে অতিমানস চৈতন্যের বিভিন্ন ক্রিয়া দ্বারা বহু হইতেছেন, তথাপি তিনি যে এক, এইসব যে একেরই বহুরূপ—এ জ্ঞান হইতে কখনও তিনি চ্যুত হন না। সমপ্রবোধাত্মক চৈতন্য বহু আছে বটে, কিন্তু ভেদজ্ঞান সেখানে স্পষ্ট হয় নাই, ঐক্যের জ্ঞানই প্রবল। প্রতিবোধক চৈতন্যে ভেদজ্ঞান ও অভেদজ্ঞান যেন সমান ভাবেই রাখিয়াছে, এক পুরুষ এক কেন্দ্র হইতে অন্যান্য কেন্দ্রে নিজকেই দেখিতেছেন, যেন নিজ হইতে ভিন্ন এইভাবে পারস্পরিক সম্বন্ধ পালন করিতেছেন। কিন্তু একত্বের জ্ঞান কখনও হারাইতেছেন না। ঐ চেতনারই এক চরম ক্রিয়ায়, ঐ ঐক্যের জ্ঞান যখন খুব পিছনে চলিয়া যায়, একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে, ভেদজ্ঞানটিই স্পষ্ট হইয়া উঠে, তখনই হয় মনের সৃষ্টি, এই মানসচৈতন্য সর্ব্বত্র ভেদই দেখে। অভেদ বা ঐক্য দেখিতে পায় না। এককে যদি বহু হইতে হয়, অথবা লীলার জন্য বহু সাজিতে হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে উপাধিস্বরূপ এই মানসচৈতন্যকে গ্রহণ করিতে হয়—এই মনের জন্যই আমরা ভগবানের সহিত এবং অন্যান্য জীবের সহিত এক হইয়াও নিজদিগকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা মনে করি—এই ভাবে ব্যষ্টিভাবটি দৃঢ় হয়। আবার স্বতন্ত্র দেহ ও প্রাণ এই ব্যষ্টিভাবকে এই ভেদজ্ঞানকে আরও বাড়াইয়া এই ব্যষ্টিভাবকে আরও দৃঢ় করিয়া দেয়—এই ভাবে বহুর খেলা একটা বাস্তব খেলায় পরিণত হয়। কিন্তু এই ব্যষ্টিভাব দৃঢ় করিতে গিয়া মন যে অহংভাবের সৃষ্টি করে—তাহাই হইতেছে সংসারে যত দুঃখ ও দ্বন্দ্বের মূল। এই অহংভাবের বশে আমরা নিজদিগকে আর সব কিছু হইতে পৃথক বলিয়া অনুভব করি।

আমাদের এই অজ্ঞান অহংভাবাত্মক মন আমাদের ব্যষ্টিভাবটিকে দৃঢ় করিয়া দিয়াছে—এখন যদি ইহা উর্দ্ধের চৈতন্যের ঐক্যভাবটি ফিরিয়া পায়, তাহা হইলেই সকল দুঃখ-দ্বন্দ্বের অবসান হইবে—প্রত্যেক মানুষই হইবে এক একটি ব্যষ্টি সচ্চিদানন্দ. এই "জড়, দেহ, প্রাণ, মনেই অধ্যাত্ম চৈতন্যের পূর্ণ" প্রকাশ হয় এবং ইহাই দিব্য জীবন—প্রকৃতি লক্ষ লক্ষ বৎসরের বিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া মানুষের দেহ, প্রাণ, মনের বিকাশ করিয়া তাহাকে দিব্য জীবনের জন্য গড়িয়া তুলিয়াছে—প্রত্যেক মানুষই হইবে সচ্চিদানন্দের এক একটি বিশিষ্ট রূপ, এই জড় জগৎই হইবে সচ্চিদানন্দের মেলা—ইহাই হইতেছে পার্থিব জীবনের নিগূঢ় রহস্য।

ইহাই সমগ্র সত্য। বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র এই সত্যেরই বিভিন্ন অংশকে ধরিয়াছে, কোথাও বিকৃত করিয়াছে, কোথাও মিশ্রিত করিয়াছে—আর সকল অধ্যাত্ম সাধনাও নানাভাবে মানুষকে এই দিব্য জীবনের পথ দেখাইয়াছে। গীতায় আমরা এই সত্যের এবং এই সাধনার একটি সমগ্র রূপ দেখিতে পাই। প্রথম ছয় অধ্যায়ে গীতা কর্ম্ম-যোগের বর্ণনা দিয়াছে, কিন্তু গীতায় কর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে কোনই বিরোধ নাই—কর্ম্ম জ্ঞানে পৌঁছাইয়া দেয়, জ্ঞানের দ্বারা কর্ম্মযোগ পূর্ণতা লাভ করে। তাই কর্ম্মযোগের শেষ অধ্যায়ে গীতা জ্ঞানযোগের বর্ণনা দিয়াছে। জ্ঞানযোগের লক্ষ্য পরমতত্ত্ব আত্মা বা ব্রহ্মকে জানা—কি পদ্ধতিতে ব্রহ্মকে জানা যায় প্রচলিত জ্ঞানযোগের অনুসরণ করিয়াই ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতা তাহার বর্ণনা দিয়াছে। রাজসিক বিক্ষোভ শান্ত করিতে হইবে, মনকে নিশ্চল করিয়া একাগ্র করিতে হইবে।

কিন্তু তৎকালে প্রচলিত জ্ঞানযোগের লক্ষ্য ছিল বিশ্বাতীত ব্রহ্মকে জানা—সেখানে পৌঁছিলে আর জগৎ থাকে না—প্রপঞ্চোপশম

শান্তং। এই জ্ঞানে নিবিষ্ট হইলে সংসার ও কর্ম্ম পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু গীতার উদ্দেশ্য হইতেছে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়—বিশ্বাতীত ব্রহ্মকে জানা অথবা এই সংসারে থাকিয়া সংসারের প্রয়োজনীয় সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করা। তাই গীতা এই ২৯ শ্লোকের অবতারণা করিয়া বলিয়াছে—শুধু বিশ্বের অতীতেই নাই, এই জগতের মধ্যেও তিনি রহিয়াছেন। তাঁহারই মধ্যে সর্ব্বভূত রহিয়াছে, তিনি সর্ব্বভূতের মধ্যে রহিয়াছেন—ব্রহ্মের এই পদটিকেও জানিতে হইবে—তাহা হইলেই হইবে সমগ্র জ্ঞান, এবং সম্যক কর্ম্ম সেই সমগ্র জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিশ্বাতীত ব্রহ্ম হইতেছে ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ—তুরীয়। কিন্তু ব্রহ্মের তৃতীয় পাদে তিনি এই জগৎকে ধরিয়া রহিয়াছেন, তিনিই এই সব জগৎ হইয়াছেন,

এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ
যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।

—মাণ্ডুক্য ৬

ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের স্থান। উপনিষদে ব্রহ্মের এই তৃতীয় পাদকে বলা হইয়াছে সুষুপ্তি স্থান। এই পাদে ব্রহ্মের যে সৃজনীশক্তি প্রকট হইয়াছে—শ্রীঅরবিন্দ তাহাকেই বলিয়াছেন Supermind বা অতি-মানস, কারণ ইহা মানস চৈতন্য হইতে উচ্চতর, ইহা অনন্ত ভেদ ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াও কখনও ঐক্য ও অদ্বৈতজ্ঞান হইতে চ্যুত হয় না। এই যে তৃতীয় পাদে ব্রহ্ম এক বহু হইয়াছেন, ব্রহ্মের একই সঙ্গে এই দুইটি আপাতবিরোধী ভাবকে বুঝাইতে গীতা অক্ষর ও ক্ষর এই দুইটি নাম ব্যবহার করিয়াছে—অক্ষররূপে তিনি এক সচ্চিদানন্দ, ক্ষররূপে তিনিই বহুভূত হইয়া আপনার সত্তাগত অনন্ত আনন্দকে

বিচিত্রভাবে উপভোগ করিতেছেন, আনন্দময়ো হ্যানন্দভুক্‌। অক্ষর পুরুষ, নির্গুণ, নিরাকার নিষ্ক্রিয়, এক, আর ক্ষরপুরুষ সগুণ, সাকার, সক্রিয়, বহুরূপধারী—এই দুইটিই পরব্রহ্মের দুইটি ভাব, তাই সেই পরব্রহ্মকে গীতা পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করিয়াছে। জীব যখন পুরুষোত্তমের ভজনা করিয়া, তাঁহার নিকট পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাঁহারই ভাব, তাঁহারই সাধর্ম্য লাভ করে—তখনই হয় তাহার চরম মুক্তি ও সিদ্ধি, তাহার অন্তরে থাকে অক্ষর পুরুষের শান্তি, নিষ্ক্রিয়তা, অদ্বৈতভাব, আর বাহিরের ব্যক্তিত্বে সে ক্ষর পুরুষেরই একটি রূপ হইয়া এই বিশ্বমাঝে তাঁহারই ইচ্ছার যন্ত্র হইয়া, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করে, তাঁহারই সাথী হইয়া বিশ্বলীলার অনন্ত আনন্দ উপভোগ করে—ইহাই গীতার সাধনা।

গীতার যে অক্ষর পুরুষ শান্ত, কূটস্থ, নিষ্ক্রিয়, এক—শঙ্কর এইটিকেই একমাত্র সত্য এবং শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন—তাঁহার মতে ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। কিন্তু ইহাকে ভিত্তি করিয়া পুরুষোত্তম যে নিজের পরা প্রকৃতিকে ধরিয়া নিজেই ক্ষররূপ গ্রহণ করিয়াছেন এবং সর্ব্বভূত হইয়াছেন—ইহা তিনি দেখেন নাই। বৌদ্ধ প্রভাবের বশে, তিনি জগৎকে মিথ্যা মায়া বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছেন। তাই ব্রহ্মের তৃতীয় পাদে যে সৃজন-ক্রিয়া রহিয়াছে, সেটাকে তিনি মিথ্যা মায়া বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মতে এক ব্রহ্ম বহুরূপ গ্রহণ করিলে, ব্রহ্মের মধ্যে পরিবর্ত্তন ও বিকার স্বীকার হয়। যাহা এইরূপ বিকারের অধীন তাহা কখনও সত্যবস্তু হইতে পারে না। অন্যপথের রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য বৈষ্ণব প্রভাবের ফলে ব্রহ্ম ও জীবকে পৃথক সত্তা বলিয়া দেখিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। ভগবানে ভক্তিই বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূলকথা। ব্রহ্ম ও জীবে ভোগ না থাকিলে ভক্তির স্থান

থাকে না, তাই ব্রহ্ম নিজেই জীব হইয়াছেন, এই তত্ত্ব তাহারা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। জীব ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্মের মধ্যে কখনও অপ্রকট অবস্থায় রহিয়াছে, কখনও তাহারই শক্তিবলে প্রকট হইতেছে—ইহাই রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। তবে রামানুজ জীব ও জগৎকে ব্রহ্মের অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, মধ্বাচার্য্য তাহাও করেন নাই। তাঁহার মতে ব্রহ্মের সহিত জীব ও জগতের কোন অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নাই। বেদান্তের মহাবাক্য—তত্ত্বমসি—তুমিই সেই—ইহা স্বীকার করিলে বলিতে হয় ব্রহ্ম ও জীব এক। তাই মধ্বাচার্য্য বলিয়াছেন—উহা লেখার ভুল, প্রকৃত প্রস্তাবে উহা হইতেছে অ-তত্ত্বমসি, অথবা ঐ বাক্যের অর্থ করিতে হইবে তস্য ত্বম অসি; অর্থাৎ জীব নিত্য কৃষ্ণদাস। ইহাই দ্বৈতবাদ। বাংলার শ্রীচৈতন্য এই সম্প্রদায়ের সাধক ছিলেন, কিন্তু তিনি এই দ্বৈতবাদকে ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মতে লীলার জন্য ব্রহ্ম ও জীবে যে ভেদ হইয়াছে ইহা মিথ্যা নহে, সত্য—অতএব দ্বৈতবাদ সত্য। কিন্তু মূল সত্তায় ব্রহ্ম ও জীব অভিন্ন। ইহাই অচিন্ত্যভেদাভেদ নামে কথিত। ভাস্কর ও নিম্বার্কের যে ভেদাভেদ-বাদ তাহার সহিত চৈতন্যের মতের কিছু পার্থক্য আছে। কারণ নিম্বার্কের মতে জীব ও জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি, শক্তিমানের সহিত শক্তির ভেদও রহিয়াছে, অভেদও রহিয়াছে, যেমন সূর্য্য এবং তাহার রশ্মি। এই মতে শেষ পর্য্যন্ত ভেদা-ভেদ থাকিয়া যায়। কিন্তু চৈতন্যের মতে পরমতত্ত্বে কোন ভেদই নাই—যিনি শক্তিমান তিনিই শক্তি—শ্রীরামকৃষ্ণও ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, "ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ—জল স্থির থাকলেও জল, হেল্লে দুল্লেও জল"। শ্রীচৈতন্যের মত ঠিক কি ছিল তাহা বলা যায় না, কারণ তিনি নিজে কোন গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই। চৈতন্যচরিতামৃতে একস্থানে তাঁহার মত

যেরূপ ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে বুঝায় যে তিনি নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ন্যায় ভেদাভেদ বাদী ছিলেন, চরমতত্ত্বে ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই—

মায়াধীশ মায়াবেশ ঈশ্বরে জীবভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর মনে করহ অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বর সনে॥

—মধ্যলীলা ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিন্তু শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীরূপ গোস্বামীর কড়চায় আমরা পূর্ণ অভেদ তত্ত্বই পাই—

রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতিহ্লাদিনীশক্তিরস্মা—
দেকত্মানাবসি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ॥
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈকমাপ্তং।
রাধাভাবদ্যুতিবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

চৈতন্য চরিতামৃতেই ইহার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে—

রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যান্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি।
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আহ্লাদিত দুঁহে হৈল এক ঠাঁই।
রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার।

—আদিলীলা ৪র্থ পরিচ্ছেদ

চৈতন্য চরিতামৃতে অন্যত্র আছে—

> ব্রহ্ম হইতে জন্ম বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
> সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
> অপাদান করণাধিকরণ কারক তিন।
> ভগবানের সবিশেষ এই তিন চিহ্ন॥
> ভগবান বহু হইতে যবে কৈল মন।
> প্রাকৃত শক্তিকে তবে কৈল বিলোকন।

পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন শ্রীঅরবিন্দ যাহাকে Apprehending consciousness বা প্রতিবোধক চৈতন্য বলিয়াছেন—ইহা তাহারই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। রাধা-প্রেমের ইহাই হইল অধ্যাত্ম ভিত্তি। ভিন্ন দেহ অবলম্বনে ভেদজ্ঞানকে দৃঢ় রাখিয়া তাহারই মধ্যে যে অভেদ ও একাত্মতার উপলব্ধি—ইহাই প্রেমের চরম স্বরূপ। প্রত্যেক জীবের ভিতর দিয়া ভগবান এই রাধাপ্রেম আস্বাদন করিবেন, তাই এই জীব-জগতের সৃষ্টি। গীতায় এই তত্ত্বের সূচনা—পরবর্তী সাধনায় ইহারই ক্রমবিকাশ।

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার কেন্দ্রশক্তি ভাগবত জীবনের অনুশীলন। অতি প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত এই একই ভাবধারা নানারূপে নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাসকে ভাস্বর করিয়া অব্যাহত বেগে বহিয়া চলিয়াছে। এই ভাবধারা কখনও সমৃদ্ধ ও পুষ্ট, কখনও ক্ষীণ ও মৃতকল্প। আমরা এক বিপ্লবের যুগসন্ধিক্ষণে উপস্থিত। নবযুগ সংগঠনের ও নব অভ্যুদয় সাধনের পথে আমাদিগকে প্রাচীনকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাচীনের সম্পৎকে ও অবদানকে আধুনিকতার আলোকে প্রদীপ্ত করিয়া লইতে হইবে।

শ্রুতি ও স্মৃতি—ইহাই আমাদের প্রগতির দুই সহায়। বেদবিদ্যা অচিন্ত্য, অপ্রমেয়, অনির্ব্বচনীয়, তাহা সাধনায় লভ্য। সেই সাধনা ও প্রকরণের পথ দেখায় স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতির নানা গ্রন্থ আছে, কিন্তু স্মৃতিকারেরা মনুকেই সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন। কি রাষ্ট্রনীতি, কি সমাজনীতি, কি আচার, কি ব্যবহার, কি ধর্ম্মসাধন—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই মনুর অবাধ অধিকার। বৃহস্পতি বলেন :

মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।
বেদার্থোপনিবদ্ধৃত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্ ॥

মহাভারত বলেন :

পুরাণং মানবো ধর্ম্মঃ সাঙ্গো বেদশ্চিকিৎসিতম্।
আজ্ঞাসিদ্ধানি চত্বারি ন হান্তব্যানি হেতুভিঃ ॥

মনুর স্মৃতি আজ্ঞাসিদ্ধ, তাঁহার মতের যাহা বিপরীত, তাহা প্রশস্ত নহে। স্মার্ত্তশিরোমণি মনুকে তাই পরস্পরের সঙ্গে অভিন্ন বলা হইয়াছে। শ্রুতি পর্য্যন্ত মনুর প্রশস্তি কীর্ত্তন করিয়াছেন।

মনুর্বৈ যৎ কিঞ্চিদবদত্তদ্ ভেষজম্।

দুঃখতাপতপ্ত মানুষকে সেই অমৃতময় ভেষজ পরিবেশন করিব। মনু বেদশাসনের প্রতিষ্ঠাতা—তিনি বৈদিক কৃষ্টির উদ্গাতা, তিনি বেদবিদ্যার পূজারী, তিনি বেদানুশাসনের আচার্য্য। এই সুকঠিন কাজের ভার একা তিনিই নিতে পারেন, কারণ তিনিই কার্য্যতত্ত্বার্থবিৎ পণ্ডিত।

মনুর শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র—মানুষের আচার ও আচরণের পদ্ধতি। কিন্তু ইহা কেবল বার্ত্তা, দণ্ড ও অর্থশাস্ত্রের ভিত্তিতেই কথিত নয়। মনু অধ্যাত্মজীবনের পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন—তাই মানবধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যাত্ম-বিদ্যারও শাস্ত্র। মানুষ নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারে যে ভাবে, মনু তাহাই বিধান করিয়াছেন। তাই মানবধর্ম্মশাস্ত্র ভাগবত জীবনের শাস্ত্র। বেদ অখিল ধর্ম্মের মূল। মনু বলেন:

সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি॥ ১২।১০০

কেবল আধ্যাত্মিক নয়, সাংসারিক সমস্ত মঙ্গল ও কল্যাণের মূল বেদ। বেদ বলিলে ঋগ্ যজুঃ সাম অথর্ব্ব বুঝায় বটে, কিন্তু তাহাদের এই সংকীর্ণ অর্থই মনু দেখেন নাই—বেদ বলিতে তিনি অনাদি ও অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার বুঝিয়াছেন। সৃষ্টিপ্রকরণ বলিতে গিয়া মনু বলিতেছেন যে, হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মা কল্পে কল্পে যে নূতন সৃষ্টি করেন, তাহাতে বেদদ্বারা তিনি সকলের নাম ও কর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট করেন।

সর্ব্বেষান্তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে॥

এখানে বেদ বলিতে অনাদি, অনন্ত, অব্যক্ত জ্ঞানশক্তি বুঝিতে হইবে। বর্ত্তমানে যে সংহিতা আমরা পাই, তাহা ভার্গব সংহিতা। মনুশিষ্য ভৃগু তাহার বক্তা—ভৃগু বলিয়াছেন—

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥

সর্ব্বজ্ঞানময় মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা জ্ঞানে প্রদীপ্ত—তাহা বেদে পরিকীর্ত্তিত।

যে কথা বলিতেছিলাম—মনু পরমাত্মজ্ঞানের প্রদর্শক। মানুষ যে-ভাবে চলিলে, যে-কর্ম্ম করিলে পরমাত্মাকে লাভ করিতে পারে, মানুষের দিব্যজন্ম লাভের জন্য যে সংস্কার ও কৃত্য প্রয়োজন, মনু তাহারই বিধান করিয়াছেন।

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।

জন্মমাত্রই মানুষ মহৎ হয় না। অভিজাত হইবার জন্য চাই সাধনা ও অনুশীলন, তপস্যা ও অধ্যবসায়। মনু মানুষকে দ্বিজ করিবার জন্য, ভাগবত করিবার জন্য, তাহার প্রাত্যহিক জীবনকে পরিমার্জ্জিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

মনু কর্ম্মের বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন :

কামাত্মতা ন প্রশস্তা ন চৈবেহাস্ত্যকামতা।
কাম্যো হি বেদাধিগমঃ কর্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ॥
সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ।
ব্রতা নিয়মধর্ম্মাশ্চ সর্ব্বে সংকল্পজাঃ স্মৃতাঃ॥
অকামস্য ক্রিয়া কাচিদ্দৃশ্যতে নেহ কর্হিচিৎ।
যদ্‌ যদ্ধি কুরুতে কিঞ্চিৎ তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্‌॥

তেষু সম্যগ্ বর্ত্তমানো গচ্ছত্যমরলোকতাম্।
যথাসংকল্পিতাংশ্চেহ সর্ব্বান্ কামান্ সমশ্নুতে ॥

স্বর্গাদি ফললাভের আশায় কর্ম্মানুষ্ঠান গর্হিত, কারণ তাহা বন্ধন ও পুনর্জন্মের কারণ। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া বেদবোধিত যজ্ঞ, দান, তপস্যা, ব্রত, হোম প্রভৃতি পালন করিলেই মানুষ ইহলোকে সর্ব্বকামনার পরিতৃপ্তি লাভ করে এবং পরলোকে অমরত্ব লাভ করে। মনুতে গীতার নিষ্কাম কর্ম্মযোগ—গীতার অনাসক্তিযোগ বীজরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই।

কর্ম্ম দুই প্রকার, প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তিমূলক। মনু প্রবৃত্তিকে দমন করিয়া নিবৃত্তির পথে যাইবার উপদেশ দিয়াছেন। কেবল মনু নহেন, গীতা, উপনিষৎ, পুরাণ, দর্শন সর্ব্বত্রই ভোগ ও ত্যাগের দ্বন্দ্বকে স্বীকার করিয়া ভাগবত-পথযাত্রীকে ত্যাগের ও বৈরাগ্যের পথে চলিবার অনুজ্ঞা দিয়াছেন। আসক্তি ও অনাসক্তির এই বিরোধের কথা আমাদের ঋষি ও কবিগণ বলিয়া ক্লান্ত হন নাই। দুঃখকে ত্যাগ করিয়া নিঃশ্রেয়স লাভের পথে তাঁহারা যে পন্থা নির্দ্দেশ করিলেন, তাহাকে যজ্ঞপন্থা বলিতে পারি।

এই যজ্ঞ কথাটি ও যজ্ঞ কল্পনাটি আমাদের পিতামহদের মহত্তম দান। সাংখ্যকার কপিল ভারতের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক—তিনি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেন, সংসার পুরুষ ওপ্রকৃতির লীলা। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, উদাসীন, প্রকৃতি সক্রিয় ও প্রসবধর্ম্মী। পুরুষ ও প্রকৃতির যে অনাদি অনন্ত ক্রীড়া তাহাই জগৎলীলা। সেই লীলার ছন্দ বারংবার আবর্ত্তন করে—তাহার গতি সরল নহে—সে-গতি বৃত্তাকার। পুনঃ পুনঃ সেই চক্রদোলার দোলে জীবনের ছন্দ বাজিতেছে। এই ছন্দকে ঋষিরা যজ্ঞচক্র বলিয়াছেন। এই যজ্ঞ-চক্রে যোগ দিবার জন্য, যাজ্ঞিক হইবার জন্য তাঁহারা বারংবার আমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

কালের সমস্ত ব্যবধান অতিক্রম করিয়া সে বজ্রনির্ঘোষ আহ্বান আজিও আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। আসুন হে ধর্ম্মবন্ধুগণ, আমরা পুনরায় যজ্ঞ আরম্ভ করি।

মনুর শাস্ত্র কেবল অধ্যাত্ম-বিদ্যা নহে—তাহা লোক-বিদ্যাও বটে। মনু প্রবৃত্তি নিবৃত্তি—দুইকেই স্বীকার করিয়া পথযাত্রার কথা বলিয়াছেন। তিনি অমৃতত্ব লাভের কথা যেমন বলিয়াছেন, তেমনই সর্ব্বকাম প্রাপ্তির কথাও বলিয়াছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মনু বলিতেছেন—

ধর্ম্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম্ম এব চ।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতিঃ॥

কেহ ধর্ম্ম ও অর্থ এই উভয়কে কামের হেতু বলিয়া পুরুষার্থ নিশ্চয় করিয়াছেন। অন্যে অর্থ ও কামকে সুখের হেতু বলিয়া শ্রেয় বলিয়া থাকেন, কেহ ধর্ম্মকেই অর্থ ও কামের হেতু বলিয়া অভীষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেহ অর্থকে শ্রেয় বলেন, কিন্তু মনু ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গকে পুরুষার্থ বলিয়া স্থিতি করিয়াছেন। প্রবৃত্তিমার্গে এই ত্রিবর্গ, নিবৃত্তিমার্গে কেবল মোক্ষ। কিন্তু প্রবৃত্তির প্রেরণাকেও সংযত ও সাধু করিবার জন্য ঋষিদের কি সুগভীর ভাবনা। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ বাধিবার পূর্ব্বে মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন :

ঊর্দ্ধবাহুর্বিরৌম্যেষ ন চ কশ্চিচ্ছৃণোতি মে।
ধর্ম্মাদর্থশ্চ কামশ্চ স কিমর্থং ন সেব্যতে॥

আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া চীৎকার করিতেছি যে, ধর্ম্মই অর্থ ও ভোগের কারণ, অতএব তোমরা কেন ধর্ম্মকে সেবা করিতেছ না, কিন্তু কেহই আমার কথা শুনিতেছে না। আজিকার নব কুরুক্ষেত্রের দিনে ব্যাসের এই বচন স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া প্রচারের প্রয়োজন। পৃথিবীর রাষ্ট্রযাত্রা

আজি ধর্ম্মকে হারাইয়াছে, তাই তাহার অর্থ ও সুখ এমনভাবে হারাইয়া গিয়াছে। যদি সুখ চাই, যদি অর্থ চাই, যদি তৃপ্তি চাই, তবে ধর্ম্মের পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

মনু নিজে দ্বাদশ অধ্যায়ে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-কল্প সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন—

সুখাভ্যুদয়িকঞ্চৈব নৈঃশ্রেয়সিকমেব চ।
প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তঞ্চ দ্বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্॥
ইহ চামুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।
নিষ্কামং জ্ঞানপূর্ব্বন্তু নিবৃত্তমুপদিশ্যতে॥
প্রবৃত্তং কর্ম্ম সংসেব্য দেবানামেতি সাম্যতাম্।
নিবৃত্তং সেবমানস্তু ভূতান্যত্যেতি পঞ্চ বৈ॥

বৈদিক কর্ম্ম দ্বিবিধ—প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ, প্রতীকোপাসনা প্রভৃতি কর্ম্ম স্বর্গাদিসুখপ্রাপ্তিকারক, কিন্তু সংসার-প্রবৃত্তির হেতু বলিয়া ইহা প্রবৃত্ত কর্ম্ম, কিন্তু মোক্ষের নিমিত্ত যে সাধন, তাহা নিবৃত্ত কর্ম্ম। প্রবৃত্ত কর্ম্মের অভ্যাসে দেবতাসমান গতি হয়, কিন্তু নিবৃত্ত কর্ম্মসাধনের ফলে মানুষ পঞ্চভূতের প্রভাব অতিক্রম করিয়া মোক্ষলাভ করে। ইহলোকে বা পরলোকে কাম্য প্রাপ্তির বাসনায় যে কর্ম্ম তাহাই প্রবৃত্ত কর্ম্ম, আর ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস কর্ম্ম সংসারনিবৃত্তির হেতু বলিয়া তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম বলে।

এই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মের পরিসমাপ্তি যে কাম, কর্ম্মপন্থায় নিম্ন শ্লোকে তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন :

সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
সমং পশ্যন্নাত্মযাজী স্বারাজ্যমধিগচ্ছতি॥

স্থাবর জঙ্গম সকল প্রাণীর মাঝেই পরমাত্মাকে দেখিবে—আমি নিজেই পরমাত্মা এই জ্ঞানে সকল ভূতকে আপন আত্মায় অবস্থিত দেখিবে এবং আত্মাকে উৎসর্গ করিয়া, আত্মসমর্পণ করিয়া যজ্ঞ করিবে, তাহা হইলে তুমি ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করিবে।

আত্মনিবেদন সর্ব্বোত্তম যোগ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞচক্রের ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে, ভগবৎ-প্রবর্ত্তিত যজ্ঞচক্র যাহারা পালন করে না, কেবল নিজের অন্ধ স্বার্থের প্রেরণায় যাহারা চলে, তাহারা ইন্দ্রিয়ারাম, তাহাদের জীবন ব্যর্থ, তাহারা বাঁচিয়াই মরিয়া থাকে।

পরোপকারের জন্য, ঈশ্বরার্থে, ত্যাগার্থে যে কর্ম্ম,সেই কর্ম্মই যজ্ঞকর্ম্ম। অনাসক্ত হইয়া যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করাই সংসারার্ণব-তরণের নৌকাস্বরূপ। পৃথিবীতে যে অন্নে জীবনধারণ করি, সে অন্ন যজ্ঞচক্রের ফলে জাত। অতএব ত্যাগ না করিয়া কেবল আত্মভোগের জন্য যে জীবনধারণ করে, সে যজ্ঞচক্র অনুবর্ত্তন করে না, ইন্দ্রিয়-সুখে ডুবিয়া থাকে, তাহার জীবন বৃথা। গীতাকার বলিতেছেন :

> যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
> ভূঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারাণাৎ ॥

যে কেবল নিজে খায়, সে পাপ ভক্ষণ করে। যে ব্যক্তি যজ্ঞাবশেষ ভক্ষণ করে, সে অমৃত ভক্ষণ করে এবং সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।

বিশ্বের মহৎ কল্যাণের জন্য আপনাকে এবং আপনার সমস্ত দ্রব্যকে উৎসর্গ করিয়া যখন আমরা স্বার্থের দিকে চাহি, তখন ত্যাগসঞ্জাত মহতী শক্তি আমাদিগকে সত্য ও ন্যায়ের পথ দেখাইয়া দেয়। আমাদিগের জীবনকে পূর্ণ করিয়া দেয়।

গীতা ও মনু একই কথা বলিয়াছেন—অনাসক্ত হইয়া পুরুষোত্তমের আশ্রিত হইয়া সর্ব্ব কর্ম্ম ভগবানে নিবেদন করিয়া আচরণ করিলেই মানুষ পরমা শান্তি লাভ করে।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির অপূর্ব্ব সমন্বয় চতুরাশ্রম ধর্ম্মে। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও যতি—এই চারি আশ্রম। চতুরাশ্রমের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত চতুর্ব্বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। এই বিভাগ সর্ব্বত্রই প্রযোজ্য—পৃথিবীর সর্ব্ব মানুষকে বৃত্তি ও গুণ অনুসারে এই চারিভাগে ভাগ করা যায়। অনেকে বলেন, এই বিভাগ কাল্পনিক—একই মানুষে বিভিন্ন গুণ ও বৃত্তির সংমিশ্রণ অনেক স্থলে হয়। তাঁহারা এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে বহু দোষের আকর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহার দোষ দেখিতে গিয়া, ইহার গুণকে আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। মনু ব্রাহ্মণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন :

ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে॥
সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎ কিঞ্চিৎ জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি॥

ব্রাহ্মণ জাতমাত্রেই অভিজাত। ধর্ম্মপালক, সর্ব্বভূতেশ্বর ব্রাহ্মণ জগতে যাহা কিছু ধন আছে, তাহাকে আপন বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ কে, মনু তাহা বিশদভাবে বলিয়াছেন; যাহার ব্রহ্মণ্য নাই, সে ব্রাহ্মণ নহে—

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥

যে বেদজ্ঞ নহে, যে ভাগবত জীবনযাপন করে না, সে ব্রাহ্মণ নহে;

যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র শ্রম করে, সে কুলের সহিত শীঘ্রই শূদ্রতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব মনুসংহিতার মতে ভারতবর্ষে আজ ব্রাহ্মণের একান্ত অসদ্ভাব হইয়াছে, সকলেই শূদ্রতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষে আজ ব্রাহ্মণ্য আদর্শের প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

মানুষের জীবনের চতুষ্পাৎ বিভাগ, তাহার দৈহিক ও আত্মিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। প্রথম আশ্রম তাহার শিক্ষার কাল—পিতামাতা ও আচার্য্যের স্নেহ-পক্ষপুটে সে বর্দ্ধিত হয়, বিকশিত হয়। এই আশ্রম তাহার ভাবী জীবনের কর্ত্তব্যের আয়োজনে নিয়োজিত। শারীর, মানস ও আত্মিক অনুশীলনে পরিপুষ্ট হইয়া সে জীবনের মহৎ ভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

দ্বিতীয় আশ্রমে সে গৃহী—তখন সে কেবল আপনাকে নিয়া ব্যাপৃত নহে। মনু নিজেই বলিয়াছেন :

এতাবানেব পুরুষো যজ্জায়াত্মা প্রজেতি হ।
বিপ্রাঃ প্রাহুস্তথা চৈতদ্ যো ভর্ত্তা সা স্মৃতাঙ্গনা ॥

পুরুষ একলা নহে—ভার্য্যা, আপনি ও অপত্য এই তিনে মিলিয়া পুরুষ। পুরুষ একাকী অর্দ্ধেক, ভার্য্যাসহ সে সম্পূর্ণ হয়। কারণ, যে ভর্ত্তা সে অঙ্গনা ভিন্ন নহে। বাজসনেয় ব্রাহ্মণও এই কথা বলিয়াছেন—

অর্দ্ধো হ বা এষ আত্মনো যজ্জায়া, তস্মাৎ যাবজ্জায়াং ন বিন্দতে, নৈতাবৎ প্রজায়তে অসর্ব্বো হি তাবদ্ভবতি, অথ যদৈব জায়াং বিন্দতেঽথ প্রজায়তে তর্হি সর্ব্বো ভবতি, তথা চৈতদ্বেদবিদো বিপ্রা বদন্তি যো ভর্ত্তা সৈব ভার্য্যা স্মৃতা।

জায়া আত্মার অর্দ্ধ—তাই যতক্ষণ জায়া গ্রহণ না করা হয়, প্রজা উৎপন্ন করা না হয়, ততক্ষণ মানুষ অপূর্ণ থাকে। যখন জায়া গ্রহণ করিয়া অপত্য উৎপাদন করে, তখনই পূর্ণ হয়, এই জন্যই বেদবিদ্‌গণ বলিয়াছেন—যিনি ভর্ত্তা, তিনিই ভার্য্যা।

ব্রহ্মচর্য্যে যে শক্তি ও বীর্য্য সঞ্চয় হইয়াছে, তাহা লইয়া গৃহী পৃথিবীর যজ্ঞচক্র পালন করিয়া জীবনকে সমৃদ্ধ ও মধুর করেন। তাঁহার আমিত্বের প্রসার হয়—দৃষ্টি বিশাল হয়। তখন মানুষ বোঝে সে একক নহে—সে একটী বৃহৎ পরিবার—যে পরিবার তুল্য নানা পরিবারের সমবায় দেশ, রাষ্ট্র ও জাতি সংগঠন করে।

তৃতীয় আশ্রম বানপ্রস্থ—তখন আমিত্বের অধিকতর প্রসার, দৃষ্টির বিশালতা দূরগামী। স্বার্থ এবং প্রয়োজন আপন নীচতা ভুলিয়া মহত্ত্বের দিকে প্রধাবিত হয়।

চতুর্থ আশ্রম যতির আশ্রম।

পুত্রের হস্তে সংসারের ভার দিয়া পঞ্চাশের পর গৃহী বনে গমন করিবেন। সেখানে—

স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্যাদ্দান্তো মৈত্রঃ সমাহিতঃ।
দাতা নিত্যধনদাতা সর্ব্বভূতানুকম্পকঃ॥

হইয়া তিনি বাস করিবেন।

সেই উদারচরিত্র বানপ্রস্থী সমস্ত জগৎকে আপন মনে করেন—এ আমার, ও অপর, এই ভাবনা লঘুচিত্ত ব্যক্তিরাই করেন; উদার হৃদয় যাঁহাদের, তাঁহারা বসুধাকে আপন বলিয়া জানেন।

বানপ্রস্থের শেষে জীবনের তৃতীয় ভাগ গত হইলে, চতুর্থে পরিব্রাজক যতি হইবেন। যতির চিত্তে বিশ্বাত্মার মহামহিমা প্রস্ফুটিত হয়।

তিনি ভূমার সঙ্গে আপনার যোগ অনুভব করেন। বৃহৎ পরিপূর্ণতার মাঝে আত্মার যোগসাধন করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। তখন তিনি

এবং যঃ সর্ব্বভূতেষু পশ্যত্যাত্মানমাত্মনা।
স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদম্॥

আত্মার দ্বারা সকল প্রাণীতে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া সর্ব্বসমতা লাভ করেন এবং ব্রহ্মসাক্ষাৎ করিয়া শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।

এই চারি আশ্রম পরস্পর নানা পরম্পরায় যুক্ত। প্রথম আশ্রমের যে সাধনা, তাহা শিক্ষার ও আত্মবিকাশের। ইহার নাম দেওয়া হইয়াছে ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচারী তিনি, যিনি ব্রহ্মেতে বিচরণ করেন—যিনি ভাগবত জীবন যাপন করেন—যিনি আপন কর্ম্মকে ঈশ্বরোদ্দেশে সমর্পণ করেন। আমাদের সেই অতীতের গুরুকুল, তাহার নিরাড়ম্বর মাধুর্য্য, তাহার তপস্যাদৃপ্ত গরিমা, হয়ত আর কোনও দিন ফিরিবে না। তথাপি নব শিক্ষা-প্রণালীর জন্য আমরা যাহারা চিন্তা করি, তাহারা মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য্যের বিধানে অনেক আলোক ও ইঙ্গিত পাইতে পারি।

ব্রহ্মচারী জ্ঞানের পথিক—তাই তিনি বেদের পাঠক। মনু বলিতেছেন :

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকাশ্চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিধ্যতি॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
বেদাদেব প্রসূয়ন্তে প্রসূতির্গুণকর্ম্মতঃ॥
বিভর্ত্তি সর্ব্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনম্।
তস্মাদেতৎ পরং মন্যে যজ্জন্তোরস্য সাধনম্॥

চাতুর্ব্বর্ণ্য, ত্রিলোক, চতুরাশ্রম, ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই বেদজাত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বেদ হইতেই জাত—তাহারা

গুণ ও কর্ম্ম হইতে প্রসূত হয়। বেদশাস্ত্র সর্ব্বভূতকে পালন করে, অতএব বেদই পরম পুরুষার্থ।

ব্রহ্মচারী তাই বেদপাঠে আত্মনিয়োগ করিবেন। তখনকার দিনে বৃত্তি বিভাগ করিয়া শিক্ষার একটি নির্দ্দিষ্ট রূপ ও পদ্ধতি দেওয়া হইয়াছিল। সকলকে একই শিক্ষা দেওয়ায় দোষও আছে, গুণও আছে। ঋষিরা পূর্ব্ব হইতে মানুষের বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া বর্ণবিভাগ করিয়াছিলেন, শিক্ষারও পদ্ধতিবিভাগ সহজ ছিল। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য কামনা করেন, সেই সব শিশুকে ৭ বৎসর তিন মাসেই উপনয়ন দেওয়া হইত। উপনীত বালক দ্বিজ, তাহার জীবনকে তখন হইতেই মহত্তম কল্যাণ ও বিরাট আদর্শের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া হইত। ব্রহ্মচর্য্যের সমস্ত বিধি ও নিষেধ, সমস্ত প্রণালী বর্ণনা এখানে সম্ভবপর নহে।

শিক্ষার প্রথম অঙ্গ ছিল শৌচ :—

উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েচ্ছৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ ॥

গুরু শিষ্যকে প্রথমে শৌচ শিক্ষা দিবেন, পরে আচার, অগ্নিকার্য্য ও সন্ধ্যা ও উপাসনা শিখাইবেন। শৌচ স্বাস্থ্যের মূল, স্নান, আচমন, যোগ, সন্ধ্যাবন্দনা সকলই শিষ্যের বিবর্দ্ধনের সহায়, তাহার ভাগবত জন্মের পরিপোষক।

বর্ত্তমানের শিক্ষায় কেবল গর্দ্দভের ভার বাড়িতেছে,—যে কোনও বিদ্যায়তনগামী ছাত্র বা ছাত্রীর পুস্তকের বোঝা দেখিলে যে-কোনও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি দুঃখ না করিয়া পারিবেন না। অথচ এই সব শিক্ষামন্দিরে শুক পাখীর মত কেবল ভাষাশিক্ষা ও নানা বিষয়ে অসম্পৃক্ত অসম্পূর্ণ জ্ঞানের হ-য-ব-র-ল গলাধঃকরণ করিয়া আমাদের বংশধরেরা, আমাদের কুমারীরা, গতস্বাস্থ্য, অসদাচারী, অভক্ত,

অকর্ম্মা, ভাববিলাসী, স্বকৃষ্টিদ্রোহী ও বিদ্রোহী হইয়া ফিরিতেছে। এই সমস্ত ক্ষতিকারক অপ্রয়োজনীয় বিদ্যার অনুশীলন বন্ধ করিয়া যদি আমরা ছাত্রদিগকে কেবলমাত্র শৌচ, আচার, অগ্নি-চর্য্যা ও সন্ধ্যাবন্দনা শিখাইতাম, তাহা হইলে দেশের প্রভূত উপকার হইত।

কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যের ইহা একান্ত বহিরঙ্গ জিনিষ।

ব্রহ্মচারী কেমন করিয়া আহার করিবেন—তাহার সম্বন্ধে মনু বলেন :

পূজয়েদশনং নিত্যমদ্যাচ্চৈতদকুৎসয়ন্ ।
দৃষ্ট্বা হৃষ্যেৎ প্রসীদেচ্চ প্রতিনন্দেচ্চ সর্ব্বশঃ।
পূজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি।
অপূজিতন্তু তদ্ভুক্তমুভয়ং নাশয়েদিদম্॥

অন্নকে পূজা করিতে হইবে—অভিনন্দন করিতে হইবে। অন্নকে দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া আনন্দিতচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে।

ব্রহ্মচারীর দ্বিতীয় শিক্ষা বিনয়। আপনারা চাণক্যের শ্লোক জানেন—

বিদ্যা দদাতি বিনয়ং বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাম্।
পাত্রত্বাদ্ ধনমাপ্নোতি ধনাদ্ধর্ম্মং ততঃ সুখম্॥

নম্রতা, শোভন শালীনতা, ভদ্রতা ও সৌজন্য শিক্ষিতের ও সংস্কৃতিমানের ভূষণ। যে জাতি যত সভ্য, যত উন্নত, যত সমৃদ্ধ, তাহার ভব্যতা তত সুন্দর, তত মনোহর। মনুর দৃষ্টি এ বিষয়ে সর্ব্বব্যাপক। তাঁহার ভব্যতার বিধানগুলি সৌজন্যহীন ভব্যতাহীন আমাদের বারংবার পাঠ করিবার প্রয়োজন আছে। জ্যেষ্ঠ ও গুণীর ও মাননীয়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে মনু বারংবার অনুজ্ঞা করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠাধিকার সম্মান ও পূজা ; কিন্তু সে পূজা গভীর দায়িত্বের সূচক।

জ্যেষ্ঠঃ কুলং বৰ্দ্ধয়তি বা পুনঃ।
জ্যেষ্ঠঃ পূজ্যতমো লোকে জ্যেষ্ঠঃ সদ্ভিরগর্হিতঃ॥

জ্যেষ্ঠ কুলপাবন, তাহার পুণ্যকর্ম্মে কনিষ্ঠেরা অনুবর্ত্তন করেন, তাঁহার পাপে বংশ বিনষ্ট হয়। তাই জ্যেষ্ঠ পূজনীয়—সাধুরা তাঁহাকে নিন্দা করেন না। জেষ্ঠ ও পূজ্যের জন্য তাই অভিবাদন।

মনু বলেন:

অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ
চত্বারি তস্য বৰ্দ্ধন্তে আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম্॥

যে তরুণ বৃদ্ধকে প্রণাম ও অভিবাদন করে, নিত্য তাহার পরমায়ু, বিদ্যা, যশ ও বল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

মনুর এই বিনয় ও শীলের বিধানগুলি সমস্ত পৰ্য্যালোচনা করিতে পারিলে, অতিশয় আনন্দ হইত; কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে তাহা সম্ভব নহে। আমি তাহার অনুপম, ভাবসুন্দর, ভাষাসুন্দর শ্লোকগুলির কয়েকটি তুলিয়া তাহাদিগের মাধুর্য্য, তাহাদিগের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য অনুধাবন করিতে অনুরোধ করি।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়ান্ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ং চ নানৃতং ব্রূয়াদেষ ধৰ্ম্মঃ সনাতনঃ॥

সত্য বলিবে, তাহা প্রিয়ভাষায় বলিবে, কখনও তাহা অপ্রিয় রূঢ় ভাষায় বলিবে না। অনৃত ও মিথ্যাকে প্রিয় করিয়া কখনও বলিবে না—ইহাই সনাতন ধৰ্ম্ম।

পরপত্নী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বদ্ধা চ যোনিতঃ।
তাং ব্রূয়াদ্ভবতীত্যেবং সুভগে ভগিনীতি চ॥

যিনি পরস্ত্রী, যিনি রক্তের সম্বন্ধে সম্পর্কিত নহেন, তাঁহাকে ভবতি বা সুভগে বা ভগিনি বলিয়া সম্বোধন করিবে।

যস্য বাঙ্মনসে শুদ্ধে সম্যগ্ গুপ্তে চ সর্ব্বদা।
স বৈ সর্ব্বমবাপ্নোতি বেদান্তোপগতং ফলম্॥

যাহার বাক্য ও মন পরিশুদ্ধ হইয়াছে, যাহার মন ও বাক্য নিষিদ্ধ বিষয় হইতে সর্ব্বদা সুরক্ষিত, সেই ব্যক্তি বেদান্ত প্রতিপাদ্য সমস্ত মোক্ষফল লাভ করেন।

নারুন্তুদঃ স্যাদার্ত্তোঽপি ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ।
যয়াঽস্যোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ॥
সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্ব্বদা॥

কোনও ব্যক্তি একান্ত পীড়িত হইলেও কাহারও মর্ম্মপীড়াদায়ক কোনও দোষ উল্লেখ করিবে না, যাহাতে পরের অনিষ্ট হয়, এমন কর্ম্ম বা চিন্তা করিবে না, যে কথা বলিলে অন্যে মনে ব্যথা পায় —এমন অস্বর্গকর মর্ম্মপীড়াকর কথা বলিবে না। ব্রাহ্মণ সম্মানকে বিষের ন্যায় মনে করিবেন এবং অবমাননাকে অমৃতের ন্যায় মনে করিয়া আকাঙ্ক্ষা করিবেন।

ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের সর্ব্বোত্তম আদর্শ ছিল—জিতেন্দ্রিয়তা, এই জন্যই প্রচলিত কথায় ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ সমার্থ বলিয়া পরিচিত।

সেবেতেমাংস্তু নিয়মান্ ব্রহ্মচারী গুরৌ বসন্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং তপোবৃদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥
নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব সমিদাধানমেব চ॥

ব্রহ্মচারী তপোবৃদ্ধির জন্য গুরুকুলে নিয়ম পালন করিবেন। তিনি ইন্দ্রিয়সংযম করিবেন। প্রতিদিন স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবেন, দেবতার অর্চ্চনা করিবেন এবং সমিধ দ্বারা সায়ং প্রাতে হোম করিবেন।

ইন্দ্রিয়সংযমের জন্য ব্রহ্মচারীর যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহার কয়েকটী শ্লোক তুলিতেছি—

অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণোরুপানচ্ছত্রধারণম্।
কামং ক্রোধং চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনম্।
দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতম্।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥
একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ কচিৎ।
কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥

ব্রহ্মচারী অভ্যঙ্গ তৈলমর্দ্দন করিবে না, নয়নে অঞ্জন প্রদান করিবে না, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবে না; কাম, ক্রোধ, লোভ, নৃত্য, গীত, বাদ্য, অক্ষাদি ক্রীড়া, লোকের সহিত বৃথা কলহ, পরনিন্দা, মিথ্যাভাষণ, কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকদিগকে অবলোকন বা আলিঙ্গন এবং পরের অনিষ্টাচরণ করিবে না। ব্রহ্মচারী একা শুইবে, কখনও রেতঃপাত করিবে না, কারণ রেতঃপাতে ব্রত নষ্ট হয়।

ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায় বীর্য্যলাভ। শরীরের কান্তি, মাসৃণ্য, দৃঢ়তা ও শক্তি সমস্তই ব্রহ্মচর্য্যসাপেক্ষ। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা ছাত্রদের ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা না দিয়া শরীরচর্চ্চা শিখাইয়া তাহাদিগকে বলবান্ করিবার চেষ্টা করিতেছি। ইহা ভস্মে ঘৃত ঢালিবার মত বৃথা হইতেছে।

ব্রহ্মচর্য্য দেশে নাই, তাই দেশ আজ ব্যাধির কবলে কবলিত,

মৃত্যুর শাপে অভিশপ্ত। মৃত্যু কেন হয়, তাহার উত্তরে মনু বলিয়াছেন :—

অনভ্যাসেন বেদানামাচারস্য চ বর্জ্জনাৎ
আলস্যাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুর্বিপ্রান্ জিঘাংসতি ॥

বেদাভ্যাস না করায়, আচার বর্জ্জনের জন্য. আলস্য, অন্নদোষ প্রভৃতির জন্য মৃত্যু মানুষের হিংসা করে।

কিন্তু কেবল দৈহিক ব্রহ্মচর্য্য হইলেই শক্তিলাভ হয় না,— মানস ব্রহ্মচর্য্য চাই। মনু শরীরচর্চ্চার বিধান দেন নাই, কারণ শিষ্যেরা গুরুগৃহে নানাবিধ গৃহকর্ম্ম করিতেন। তাহা ছাড়া, প্রাণায়াম অভ্যাসের দ্বারা তাঁহারা সর্ব্ববিধ ব্যাধি ও পীড়া দূরে রাখিতেন।

মনু বলেন :—

দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতুনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ ॥
প্রাণায়মৈর্দ্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।
প্রত্যাহারেণ সংসর্গান্ ধ্যানেনানীশ্বরান্ গুণান্ ॥

ধাতু যেমন দগ্ধ হইলে মালিন্য ত্যাগ করে, তেমনই প্রাণায়ামে প্রাণবায়ুর নিগ্রহ করিলে ইন্দ্রিয়গণের সমুদয় দোষ দগ্ধ হইয়া যায়। প্রাণায়ামের দ্বারা দোষাদি দূর করিবে, ধারণাদির দ্বারা পাপ নষ্ট করিবে, প্রত্যাহারের দ্বারা সংসর্গ ত্যাগ করিবে, ধ্যানের দ্বারা ক্রোধাদি রিপু নিবারণ করিবে।

আহারশুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে স্মৃতি ধ্রুব হয়, তাই মনু ব্রহ্মচারীর আহারের শুচিতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন।

মনুর অন্যান্য বিধানের আলোচনা করিবার স্থান নাই। যাঁহারা মনুসংহিতা পড়িবেন, তাঁহারা দেখিবেন—সেই মহাত্মা মানুষ গড়িবার

এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বিধান দিয়াছেন। এই সুমনোহর ব্রহ্মচর্য্যবিধি আমরা যদি পুনরায় গ্রহণ করিতে পারি, তাহা হইলে দেশে এক নব জাগরণ ও নব উদ্বোধন হইবে।

বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে ব্রহ্মচারী গৃহী হইয়া পুত্রোৎপাদন করিবেন। স্বামী ও স্ত্রীর যে আসন ও অধিকার মনু দিয়াছেন, তাহা সত্যই প্রশংসার বস্তু। মনু বলিতেছেন :

অন্যোন্যস্যাব্যভিচারো ভবেদামরণান্তিকঃ।
এষ ধর্ম্মঃ সমাসেন জ্ঞেয়ঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরঃ॥

স্বামী ও স্ত্রী আমরণ ধর্ম্মার্থকামবিষয়ে পরস্পর একত্র থাকিবে। ইহাই স্ত্রী ও পুরুষের পরমধর্ম্ম।

মনু সতীত্বধর্ম্মের প্রশংসা করিয়াছেন :

পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা।
সা ভর্ত্তৃলোকমাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে॥

যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে স্বামীতে অনুগত থাকেন, তিনি মৃত্যুর পর ভর্ত্তৃলোক প্রাপ্ত হন এবং সাধুলোকেরা তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করেন।

আমাদের দেশে মেয়েদের আমরা সম্মান করি না, এমন কথা শোনা যায়; কিন্তু মনু বলিতেছেন :—পতি ভার্য্যাতে প্রবেশ করিয়া জন্ম গ্রহণ করেন, তাই জায়াকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন।

মনু নারীকে বলিয়াছেন :

প্রজনার্থং মহাভাগাঃ পূজার্হা গৃহদীপ্তয়ঃ।
স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কদাচন॥

স্ত্রীরা প্রজাপ্রসূতি, তাই তাহারা মহাভাগ, তাহারা বস্ত্রালঙ্কারাদি দানে প্রতিপূজ্য। তাহারা গৃহের দীপ্তিকারণ—এমন কি, স্ত্রী ও শ্রী

উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ভেদ নাই—শ্রীহীন গৃহ যেমন শোভা পায় না, স্ত্রীহীন গৃহ তেমনই শোভা পায় না।

গৃহধর্ম্মের ভিত্তি স্বামী ও স্ত্রী—তাহাদের প্রেম ও প্রীতিতে গৃহ সমুজ্জ্বল ও সুন্দর হইবে।

কিন্তু মনুর গৃহধর্ম্ম কেবল স্বামী ও স্ত্রীর সংসার নহে, সে বৃহৎ একান্নবর্ত্তী সংসার—সেখানে নানাবিধ কর্ত্তব্য—নানাবিধ দায়, সেখানে গৃহীকে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞ করিতে হইবে।

এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ এক অতুলনীয় কল্পনা—এক মহিমাময় আদর্শ—

ঋষিযজ্ঞং দেবযজ্ঞং ভূতযজ্ঞঞ্চ সর্ব্বদা।
নৃযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞঞ্চ যথাশক্তি ন হাপয়েৎ ॥
এতানেকে মহাযজ্ঞান্ যজ্ঞশাস্ত্রবিদো জনাঃ।
অনীহমানাঃ সততমিন্দ্রিয়েষ্বেব জুহ্বতি ॥

ঋষিযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ সর্ব্বদা যথাশক্তি পালন করিবে। কখনও তাহা পরিত্যাগ করিবে না।

কোনও কোনও যজ্ঞশাস্ত্রবিদ্ ব্যক্তিরা এই পঞ্চবিধ মহাযজ্ঞের বাহ্যাড়ম্বর না করিয়া বুদ্ধিরূপ ইন্দ্রিয়েতে জ্ঞানাদির সংযমন করিয়া যজ্ঞ-সম্পাদন করেন। চুল্লী, পেষণী, সম্মার্জ্জনী, উদূখল, মুষল, ও জলকলস দ্বারা প্রতিদিন যে জীবহিংসা হয়, সেই পঞ্চপ্রকার পাপ নাশের জন্য ঋষিরা পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিধান করিয়াছেন।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ। ঋষিরা আমাদিগকে যে জ্ঞানসম্পদ্ দিয়া ঋণী করিয়াছেন, ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞের দ্বারা আমাদের সেই ঋণ পরিশোধিত হয়। অন্নাদি দ্বারা পিতৃতর্পণের নাম পিতৃযজ্ঞ, হোমের নাম দেবযজ্ঞ, অতিথিসেবাই নৃযজ্ঞ, বলির নাম ভূতযজ্ঞ। দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা এই পাঁচকে যে ব্যক্তি অন্ন না দেয়,

সে নিশ্বাস-প্রশ্বাস-বিশিষ্ট হইলেও জীবিত নহে। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞ করেন বলিয়া মনু গৃহস্থকে শ্রেষ্ঠাশ্রমী বলিয়াছেন। গৃহী স্বাধ্যায় করিয়া ঋষিগণের অর্চ্চনা করিবেন, হোমদ্বারা দেবতাদিগকে যথাবিধি অভিনন্দন করিবেন, শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃলোককে পরিতৃপ্ত করিবেন, অন্ন দ্বারা মনুষ্যদিগকে এবং বলিকর্ম্ম দ্বারা ভূতদিগকে বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিবেন।

আমরা বর্ত্তমানে যাহা কিছুর অধিকারী, তাহার জন্য আমরা পিতৃ-পিতামহগণের নিকট ঋণী, তাই—

কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্॥

হবির্দ্বারা হোম করিয়া স্বাহা মন্ত্রে নানা দেবতাগণের উদ্দেশ্যে দেবযজ্ঞ করা হইত। ভূত-যজ্ঞ সমস্ত বিশ্বভূতের কল্যাণ-স্মরণ। চরাচরের সমস্ত ভূতগণকে স্মরণ করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে ফল প্রদত্ত হইত। বিশ্বদেবতার জন্য "বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে বলি দেওয়া হইত। 'সর্ব্বাত্মভূতায় নমঃ' মন্ত্রটী পড়িয়া সকল জীবগণকে আমন্ত্রণ করা হইত। বলিক্রিয়ার মধ্যে হৃদয়ের প্রসারতা বাড়িবার ব্যবস্থা ছিল। গৃহী বলিশেষ ভূমিতে কুকুর, কুকুরোপজীবী পাপবেশ্যা কাক ও কৃমিগণকে দিবেন। মনু বলেন—

এবং যঃ সর্ব্বভূতানি ব্রাহ্মণো নিত্যমর্চ্চতি।
স গচ্ছতি পরং স্থানং তেজোমূর্ত্তিঃ পথর্জুনা॥

যে ব্রাহ্মণ প্রতিদিন অন্নদানাদির দ্বারা সর্ব্বভূতের পূজা করেন, সকল প্রাণীকে বলিপ্রদান করেন, তিনি অতি সরল আলোকময় পথে ব্রহ্মধামে গমন করেন

বলিকর্ম্মের শেষে পরিবারবর্গের ভোজনের পূর্ব্বে গৃহস্থ অতিথিগণকে ভোজন করাইবেন এবং ভিক্ষুক ও ব্রহ্মচারীকে বিধিবৎ ভিক্ষা প্রদান করিবেন। একদিন ভারতবর্ষে মানুষ বিনা সম্বলে এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারিত; কারণ তখন গৃহীর নিকট সর্ব্বদেবময় অতিথি পূজা পাইতেন। তাই ভারতবর্ষে পান্থশালা বা হোটেলের প্রয়োজন হয় নাই। কালের পরিবর্ত্তন হইতেছে, আজ কোথাও একমুষ্টি অন্ন মেলে না।

স্বয়ং গৃহাগত গৃহীকে বিধানানুসারে সৎকার করিয়া আসন, পাদ-প্রক্ষালনের জল ও যথাশক্তি অন্নব্যঞ্জন দিবে। মনু বলেন—

তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥

শয়নের জন্য তৃণ, বিশ্রামের জন্য ভূমি, পাদপ্রক্ষালনের জল ও প্রিয়-বচন, এই চারিটি জিনিষ কখনও সজ্জনের গৃহে অভাব হয় না। কিন্তু অতিথি হইতে—অকারণে পরান্নভোজন করিতে মনু বারংবার নিষেধ করিয়াছেন। অতিথি যখনই আসুন, তখনই তাহাকে ভোজন করাইতে হইবে।

ন বৈ স্বয়ং তদশ্নীয়াদতিথিং যন্ন ভোজয়েৎ।
ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং স্বর্গ্যঞ্চাতিথিপূজনম্॥

ঘৃত, দধি, প্রভৃতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য অতিথিকে না দিয়া আপনি ভোজন করিবে না। কারণ অতিথি-সেবা দ্বারা বিপুল সম্পত্তি, যশ, আয়ু ও স্বর্গলাভ হয়।

শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোক তৃপ্ত হন। তাই মনু প্রতি অমাবস্যায় শ্রাদ্ধবিধি করিয়াছেন এবং অন্ততঃ একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে বলিয়াছেন। দৈবকর্ম্ম অপেক্ষা পিতৃকর্ম্ম প্রশস্ত।

মনু যে বিস্তৃত শ্রাদ্ধবিধি বলিয়াছেন, এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাহার আলোচনা সম্ভব নহে। পিতৃলোকের নিকট তিনি যে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন, কেবল সেই আশীর্ব্বাদের কথা বলিয়াই শ্রাদ্ধকথার উপসংহার করিব :

দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি ॥

আমাদের বংশে দানশক্তিসম্পন্ন পুরুষ-সকল বর্দ্ধিত হউক, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা বেদশাস্ত্রের আলোচনা বাড়ুক, পুত্রপৌত্রাদি সন্ততি-সকল পরিবর্দ্ধিত হউক, বেদার্থের প্রতি অশ্রদ্ধা যেন আমার কুলে না হয় এবং দান করিবার জন্য যেন যথেষ্ট সম্পৎ হয়।

মনু গৃহীকে জীবন ধারণের জন্য পঞ্চ বৃত্তি অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বকালে শ্ববৃত্তিকে ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন।

ঋতামৃতাভ্যাং জীবেত্তু মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥

এক একটি করিয়া পরিত্যক্ত শস্যসংগ্রহের নাম উঞ্ছ। মঞ্জরীরূপ ধান্য সংগ্রহের নাম 'শিল'। এইরূপে উঞ্ছশীল বৃত্তিকে বলা হয় ঋত। যাচ্ঞা না করিতে যাহা উপস্থিত হয়, তাহার নাম অমৃত। যাচিত ভিক্ষাসমূহকে মরণসমান বলিয়া মৃত বলা যায়। কৃষিকর্ম্মে অনেক প্রাণীর হত্যা হয় বলিয়া তাহাকে প্রমৃত বলা হয়। এই পাঁচ উপায়ে বেদবিদ্ ভাগবতপথযাত্রী জীবন ধারণ করিবেন।

বাণিজ্য ও কুসীদে সত্যানৃত ব্যবহার করিতে হয়। বিপৎপাত হইলে তাহা দ্বারা জীবন ধারণ করিবে। কিন্তু সেবা কুকুরের কাজ; সেই শ্ববৃত্তি কখনও অবলম্বন করিবে না।

গৃহী যদি অসঞ্চয়ী হন, তবে তিনি লোকজিৎ হন। গৃহী সন্তোষের সাধনা করিবেন, কারণ—

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ ॥

সন্তোষই সুখের কারণ, অসন্তোষ দুঃখের আকর, অতএব সুখার্থী সন্তোষ অবলম্বন করিয়া প্রাণধারণ ও পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য আবশ্যক ধন ভিন্ন অধিক ধনোপার্জ্জনে বিরত হইয়া কালযাপন করিবেন।

মনু গৃহীকে শেষ উপদেশ দিতেছেন :

বেদোদিতং স্বকং কর্ম্ম নিত্যং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ।
তদ্ধি কুর্ব্বন্ যথাশক্তি প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥

প্রতিদিন অনলস হইয়া আপন আশ্রমবিহিত বেদোক্ত ও স্মার্ত্ত সমুদয় কর্ম্ম সম্পাদন করিবে, যেহেতু যথাশক্তি সেই সমুদয় কর্ম্ম করিলে আন্তরিক পবিত্রতা দ্বারা ঈশ্বরসাক্ষাৎকার হয় এবং গৃহী পরমাগতি লাভ করেন।

মনুর কথিত রাজধর্ম্ম, রাষ্ট্রনীতি, সামাজিক নীতিপ্রকরণ প্রভৃতি আলোচনা করিতে গেলে প্রবন্ধ অতিশয় দীর্ঘ হইবে বলিয়া তাহার আলোচনা হইতে বিরত হইলাম।

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রের কেবল দিগ্দর্শন করানো হইয়াছে, তাহার সমস্ত গৌরব ও গরিমা বুঝাইবার ও প্রকাশ করিবার শক্তি ও স্থান হইল না। কিন্তু যাহা বলিলাম, তাহাতেই ভারতীয় ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক গুরুর উদারতা, দৃষ্টির বিশালতা, তাঁহার অসামান্য প্রতিভা, অসাধারণ মেধা ও মনীষার পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার সম্বন্ধে কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের কথায় বলা যাইতে পারে—

Type of the wise who soar, but never roam;
True to the kindred points of heaven and home.

খণ্ডের সঙ্গে অখণ্ডের, ক্ষুদ্রের সঙ্গে বৃহতের, সসীমের সঙ্গে অসীমের, সান্তের সঙ্গে অমৃতের, গৃহপরিবেশের সঙ্গে ভাগবত জীবনের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয়, এমন সুমহান্ সামঞ্জস্য আর কোনও ধর্ম্মবেত্তা করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমানের যাঁহারা রাষ্ট্রচালক, যাঁহারা দণ্ডকর্ত্তা, যাঁহারা বিধিপ্রণেতা তাঁহাদিগের সকলকে মনুর এই আজ্ঞাসিদ্ধ ধর্ম্মবেদকে শ্রদ্ধা ও পূজা-সহকারে অধ্যয়ন ও অনুধাবন করিতে বলি। এই বিরাট মনীষা ও তপস্যা-সমৃদ্ধ অবদানকে ধ্যান, মনন ও নিদিধ্যাসন করিয়া আমরা হয়ত পুনরায় চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে সক্ষম হইব। সেই মহাভবিষ্যতের মহা অভ্যুদয় কামনা করিয়া শ্রীমৎ মহর্ষি মনুকে আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

গৌতম বুদ্ধদেবের আর্য্যঋষি-ঋণ

কোনও ব্যক্তি, সাধক, মহাপুরুষ, ঋষি বা মহামানব যে পরিবারে, সামাজিক পরিবেষ্টনীতে এবং ধর্ম্মনৈতিক আলো-বাতাসে জন্মপরিগ্রহ করেন, তাহার অনেকখানি প্রভাবই তাঁহার জীবনে ও সাধনায় পরিস্ফুট থাকে। বীজকোষে বীজের নিজস্ব একটা সম্পদ, প্রভাব, শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে। সেই শক্তিই নিজ ধারায়, নিজস্ব জন্মান্তরীণ এবং ইহ-

জীবনের সাধন-ধারায় আহরণ করে পরিবেষ্টনীর মাটি হইতে রস, খাদ্য; আলো ও বাতাস হইতে জীবিকার প্রাণ-খাদ্য। পিতৃবীজ ও মাতৃবীজের ধারা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক রাজ্যের মাটি, আলো ও বাতাসরূপে অনেকখানি ঋষিঋণও গ্রহণ করিতে হয়। "দর্শনাৎ ঋষি"। যাঁহারা আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, জগত্তত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিয়াছেন নিভৃততম, রসতম ধ্যানে, তাঁহারাই ঋষি। গোতম বুদ্ধদেবও এমন একজন্ আর্য ঋষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি। বুদ্ধদেব নিজেকে লক্ষ্য করিয়া "কেবলিনং মহেসিং" বলিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি কেবলী বা কৈবল্যপ্রাপ্ত মহর্ষি। পালি ত্রিপিটকের, সুত্তপিটকান্তর্গত 'মজ্ঝিম নিকায়ে'র 'ইসিগিলি সুত্ত'তে "মহেসি" বা মহর্ষি গোতম বুদ্ধ "অচ্চুতো" (অচ্যুত) এবং "আনন্দনন্দো উপানন্দো দ্বাদস ভারদ্বাজা অন্তিম দেহধারী" বলিয়া বুদ্ধ, মুক্ত, মহর্ষি, নন্দনন্দন অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণকেই উল্লেখ করিয়াছেন। মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তিনি একজন মহর্ষি। মজ্ঝিম নিকায়ে আছে "বুদ্ধো চ যো কারুণিকো মহেসি", বুদ্ধদেব কারুণিক মহর্ষি। মজ্ঝিম নিকায়ের উপালি সুত্তন্তে উপালি গৃহপতি, বুদ্ধদেবকে "ইসিসত্তম" (ঋষি সত্তম), "তেবেজ্জ" (ত্রিবিদ্যা-সম্পন্ন), "ব্রহ্মপত্ত" (ব্রহ্মপ্রাপ্ত), "নহাতক" (স্নাতক), "বিহিত-বেদ" (বেদজ্ঞ), "অরিয়" (আর্য্য), "ভাবিতত্ত" (ভাবিতাত্মা), "মুত্ত" (মুক্ত), "সুসমাচিত্ত", "সন্ত" (শান্ত), "উত্তম পুগগ্‌ল" (পুরুষো-ত্তম) বলিয়াছেন। ধম্মপদও গোতম বুদ্ধদেবের একটী প্রধান ধর্ম্মোপদেশ কায়, বাক্য ও মনের দ্বারা কুশল কর্ম করাকে "মগগ্‌মিসিপ্পবেদিতং" (ঋষি প্রবেদিত বা প্রদর্শিত মার্গ) বলিয়াছেন। ত্রিপিটকে বুদ্ধদেব পালি ভাষায় "ইসীনং ইসিসত্তমো" (ঋষিদিগের মধ্যে ঋষিসত্তম), "মুনি", "মহামুনি", "ইসি" (ঋষি) ও "মহেসি" (মহর্ষি) বলিয়া বহু স্থলে উক্ত হইয়াছেন। অঙ্গুত্তর নিকায়তে অন্তিমশরীরধারী "গোতম"

"বুদ্ধ"কে "মুনি" এবং "তেবিজ্জ" (ত্রিবিদ্যা-সম্পন্ন) "ব্রাহ্মণ" বলিয়াছেন। অঙ্গুত্তর নিকায়ে গোতম বুদ্ধদেব নিজেকে "ব্রাহ্মণ" এবং বেদজ্ঞ (বেদগূ) বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণো'তি ভিক্খবে তথাগতস্স' এতং অধিবচনং অরহতো সম্পা সম্বুদ্ধস্স, বেদগূ'তি ভিক্খবে তথাগতস্স এতং অধিবচনং অরহতো-সম্মা সম্বুদ্ধস্স।" বুদ্ধদেব তাঁহার প্রধান কয়েকজন শিষ্যকে (যাঁহাদের কেহ কেহ জন্মত বা জাতিত ব্রাহ্মণ ছিলেন না, যেমন ক্ষত্রিয় দেবদত্ত, আনন্দ প্রভৃতি) "এতে ভিক্খবে ব্রাহ্মণা আগচ্ছন্তি" হে ভিক্ষুগণ, এই যে সব ব্রাহ্মণেরা আসিতেছেন বলিয়া সম্বর্ধনা করেন। যথার্থ ব্রাহ্মণ, ঋষি গোতম বুদ্ধদেব এই ঋষি বা ব্রাহ্মণ ঋণ যে প্রচুর গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অসংখ্য সাক্ষ্য আমরা পালি ত্রিপিটকাদি এবং পরবর্তী বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে পাই। ধম্মপদের ২৬তম অধ্যায়ের নামই "ব্রাহ্মণ বগ্গ", ব্রাহ্মণ বর্গ। ঐ ধম্মপদে এবং অঙ্গুত্তর নিকায়ে, সংযুক্ত নিকায়ে ও সুত্ত নিপাতে গোতম বুদ্ধদেবকে মুনি, ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। ঔপনিষদিক ঋষি বা ব্রাহ্মণ ধর্মের কাছে গোতম বুদ্ধদেব প্রভূত ঋণ গ্রহণ করিয়া নিজেও যে আর্য ঋষি বা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন স্ব স্বীকৃতিতে এবং তৎকালীন প্রচলিত আর্যধর্মে ও আর্যসমাজে (কারণ তখন 'হিন্দু' নামকরণ হয় নাই) তাহাতে আদৌ সন্দেহ নাই। আর অন্যরূপ হওয়াও অস্বাভাবিক। যে বৈদিক ও ঔপনিষদিক ব্রহ্মণ্য ধর্মের ভাব, রস, আলো ও দর্শনে তাঁহার প্রাণধারা সঞ্জীবিত, বর্ধিত এবং ফলবান্ হইয়াছিল, তাহা একান্তভাবেই ভারতীয় আর্যধর্মের, আর্য-দর্শনের সাধনার ফল। ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও স্বীকার করিয়াছেন নানাভাবে। তাহার কিছু নিম্নে দিতেছি, আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রবণ ভারতীয় পণ্ডিত ও সাধকগণের অবগতির জন্য। কারণ পরপ্রত্যয়নেয়-বুদ্ধি তাঁহারা যে পাশ্চাত্য মতের খুবই সমাদর করেন।

প্রফেসার রীজ ডেভিডস্ বলেন :—"এ সম্বন্ধে প্রায় সন্দেহ নাই বলিলেই চলে যে, গোতম বোধিদ্রুম-তলে নির্বাণ লাভের পূর্বে তাঁহার অধ্যয়ন এবং তপস্যার বৎসরগুলিতে, বর্তমানে উপনিষদ্‌সমূহে রক্ষিত ধর্মবিশ্বাসসমূহের অথবা অন্ততঃ তদনুরূপ ধর্মবিশ্বাসসমূহের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাধারণ সিদ্ধান্ত তাহাদের (উপনিষদের) মধ্যে নিহিত ছিল।" রীজ ডেভিড্‌স্ আরও বলেন, "ইহা নিশ্চয়ই স্পষ্ট যে, গোতম এই সময়ের মধ্যে বা পূর্বে সেই সময়ের সমস্ত গভীরতম দর্শনের এক অত্যধিক প্রণালীবদ্ধ এবং অবিশ্রান্ত অধ্যয়নধারার ভিতর দিয়া চলিয়াছিলেন। সমস্ত প্রাচীনতম বৃত্তান্ত এই বিবৃতিতে একমত যে, আলাড় এবং উদ্দকের শিষ্যরূপে সাধন করিয়া, গোতম, আমরা যাহাকে তপস্যা বলি তাহার এক ব্যবস্থানুযায়ী প্রণালীতে, যাহার দীর্ঘতা আমাদের কাছে অজ্ঞাত, এরূপ কিছু সময় ধরিয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।" তিনি আরও বলেন, "বৌদ্ধধর্ম মুখ্যত একটী ভারতীয় ধর্মপ্রণালী ;" "মোটের উপর তিনি (বুদ্ধ) সেই সময়ের হিন্দুদিগের দ্বারা হিন্দু বলিয়াই বিবেচিত হইতেন ;" "গোতম হিন্দুরূপে জন্মিয়াছিলেন এবং প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং হিন্দুরূপেই তিনি বাঁচিয়াছিলেন এবং দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।" পণ্ডিত ম্যাক্‌স্‌মুলার বলিয়াছেন, "ইহা স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ব্যতিরেকে বুদ্ধধর্মের অস্তিত্ব নাই।" ম্যাক্‌স্‌মুলার বহু স্থানে ব্রাহ্মণ ও ঔপনিষদিক দার্শনিকদিগের নিকট বৌদ্ধদিগের প্রভূত ঋণগ্রহণ স্বীকার করিয়াছেন। যথা :—"আমি যেমন কয়েক সময়ে দেখাইয়াছি যে, বৌদ্ধেরা তাঁহাদের প্রায় সমস্ত দার্শনিক আলোচনায় ব্রাহ্মণদিগের নিকট ঋণী, তদ্রূপ ইহাও আমার মনে হয় যে, বৌদ্ধদিগের অর্ধ পৌরাণিক "সুখাবতী" অথবা সুখভূমির পরিকল্পনাও ঐ একই (ব্রাহ্মণ) মূল হইতে লওয়া

হইয়াছে।” ওয়ারেন্‌ বলেন, “নির্বাণের অনুসন্ধান বা পুনর্জন্মের দুঃখসমূহ হইতে মুক্তি গোতমের বিশেষত্ব ছিল না। তিনি যে দেশে এবং যে কালে জীবনধারণ করিয়াছিলেন, তখনকার এবং সেই দেশের উহা সাধারণ প্রচেষ্টা ছিল এবং ঐ উদ্দেশ্য লাভের জন্য নানা উপায়ও প্রচলিত ছিল। এডমাণ্ড হোলমস্‌ও বলেন, “যাহা বুদ্ধ শিখাইয়াছিলেন এবং যাহা ন্যায়ত উপনিষদের দর্শনসমূহ হইতে অনুসরণ করে (ঐ শব্দের গভীরতর অর্থে)—জীবনের এই দুই কল্পনার মধ্যে মতের মিলন এতো অধিক এবং এতো অপরিহার্য্য যে তাহাদিগকে আকস্মিক ঘটনার উপর আরোপ করা যায় না। এমন কি যে, যুগে বুদ্ধ বাঁচিয়াছিলেন তাহা হইতে যে যুগ ব্রহ্মা এবং দেবগণের, নচিকেতাগণের এবং যমের কাহিনীসমূহের জন্ম দিয়াছিল, তাহা যদি সহস্র বৎসর ধরিয়া পৃথক থাকিত, তবে বুদ্ধ কোনও না কোনও উপায়ে ঐ সমস্ত কাহিনীতে পবিত্রভাবে রক্ষিত ভাবসমূহের প্রভাবে আসিয়াছিলেন, আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা আমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে অনুভব করিতাম। কিন্তু আমরা কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যের উপরই বিশ্বাস করিতে চাহি না। আমরা জানি যে, বুদ্ধের সময়ে ভারতের আধ্যাত্মিক বায়ুমণ্ডল উপনিষদসমূহের ভাবাবলীর দ্বারা গর্ভবতী ছিল।....এই সকল ঘটনার দ্বারা প্রাপ্ত ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রমাণের সহিত পূর্বে সবিশেষ বর্ণিত আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য একমাত্র সিদ্ধান্তে দুর্নিবার শক্তিতে অঙ্গুলি নির্দেশ করে যে, বুদ্ধ উপনিষদসমূহের আদর্শ গ্রহণ করেন, উহার উন্নততম উচ্চতায় এবং ইহার পবিত্রতম আকারে এবং তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, ইহার মধ্যে যে সুস্পষ্ট ফাঁক আছে তাহা পূরণ করায় আত্মনিয়োগ করে অর্থাৎ যে সমস্ত আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ এতদিন কেবলমাত্র কয়েকজন নির্বাচিত আত্মার একমাত্র অধিকারে

ছিল, তাহা মানব জাতির দৈনিক প্রয়োজনসমূহের জন্য সহজপ্রাপ্য করেন।

এই সিদ্ধান্ত যদি সত্য হয়, তবে আমরা বুদ্ধধর্মে 'ব্রাহ্মণ্য' দর্শনের ভাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখিব না, বরং দেখিব ঐ দর্শনের প্রধান ভাবসমূহের এক শীলনৈতিক বিশদ ব্যাখ্যা।"

ঔপনিষদিক এবং বৌদ্ধগের গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায় যে, গোতম বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার সমসাময়িক 'নিগণ্ঠনাত্ত পুত্ত' (নির্গ্রন্থনাথপুত্র) মহাবীর ষড়ঙ্গ বেদ, উপনিষদ্ ও সাংখ্যযোগাদি দর্শনে অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। ইঁহারা পরস্পরে অনেক সময় নানা শাস্ত্রমত এবং ধর্মাদি আলোচনা করিতেন। আর্য জৈনধর্মপ্রবর্তক তীর্থঙ্কর মহাবীরের জীবনী-কল্পসূত্রে আছে :—মহাবীর যৌবন অনুপ্রাপ্ত হইলে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদাদি সাঙ্গোপাঙ্গ ষড়ঙ্গবেদ এবং ষষ্ঠিতন্ত্র নামক কাপিল সাংখ্য শাস্ত্রাদিতে অতি নিপুণ হইয়াছিলেন। মহাযান গ্রন্থ বুদ্ধদেবের জীবনী 'ললিত বিস্তর'-এতেও আমরা পাই যে, বোধিসত্ত্ব (বুদ্ধদেব) নির্ঘণ্ট, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, শিক্ষা, ছন্দ, যজ্ঞকল্প, জ্যোতিষ, সাংখ্য, যোগ, ক্রিয়াকল্প (পূর্ব মীমাংসা দর্শন) বৈশেষিক দর্শন, অর্থবিদ্যা, বার্হস্পত্য দর্শন (লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন বা Materialistic Philosophy) হেতুবিদ্যা (ন্যায় বা Logic) ইত্যাদিতে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। পালি সুত্তপিটকের 'দীর্ঘ নিকায়'এর 'ব্রহ্মজাল সুত্তে' গোতম বুদ্ধদেব যে শাশ্বতবাদ, নির্বাণ-বাদ, উচ্ছেদবাদ, অমরা বিক্ষেপিকা প্রভৃতি ৬২টী পৃথক্ ধর্মমতের উল্লেখ ও খণ্ডন মণ্ডন করিয়াছেন তাহাতেও পরিস্ফুট যে, গোতম বুদ্ধদেব ষড়ঙ্গবেদ উপনিষদ্, দর্শনাদিতে আর্য হিন্দুর শাস্ত্রজ্ঞ সাধক গণের ন্যায়ই বিশেষভাবে অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহার মধ্যে "সম্মতবাদী"

বা শাশ্বতবাদী শ্রমণ বা সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণেরা 'সাংখ্য' এবং "নিব্বাণ বাদা" বা নির্বাণবাদী শ্রমণ বা সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণেরা 'যোগ' মতাবলম্বী বলিয়াই বেশ বোঝা যায়। এইরূপ উহার "একচ্চ সম্পতিকা একচ্চ অসম্পতিকা" বাদী শ্রমণ ও ব্রাহ্মণেরা বেদান্ত দর্শন মতাবলম্বী এবং "অমরা বিক্ষেপিকা" বাদী শ্রমণ ও ব্রাহ্মণেরা ন্যায়মতালম্বী বলিয়া বেশ বোঝা যায়। অঙ্গুত্তর নিকায়ের "ইস্পর নিম্মান হেতু" বাদী শ্রমণ ও ব্রাহ্মণেরা প্রাচীন ঈশ্বরবাদী বৈদান্তিকগণেরই প্রতিধ্বনি। অঙ্গুত্তর নিকায়ে আছে যে বুদ্ধদেবের সমসময়ে আজীবক (দিগম্বর জৈন), "নিগণ্ঠো" (নিগ্রন্থ শ্বেতাম্বর জৈন), "মুণ্ড সাবকো" (মুণ্ডিত শ্রাবক বা দণ্ডী, হংস, পরমহংস সন্ন্যাসী), "জটিগকো" (জটী বা বানপ্রস্থাবলম্বী), "পরিব্বাজকো" (পরিব্রাজক সন্ন্যাসী) "তেদণ্ডিকা" (ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী), "গোতমকো" (নৈয়ায়িক), "দেবধর্ম্মিকো" (দেবপূজক) প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায় ছিলেন। বুদ্ধদেবের সঙ্গে এবং পরস্পরে ইহারা ধর্ম ও শাস্ত্রালোচনা যে করিতেন, তাহার উল্লেখ ত্রিপিটকে বহু স্থলে আছে। প্রোফেসর রীজ ডেভিড্‌স্ অনুরূপ সাক্ষ্য দিয়াছেন।

এই সময়কার গ্রন্থসমূহ আলোচনা করিলে বেশ বুঝা যায়—আর্যহিন্দু, আর্যবৌদ্ধ ও আর্যজৈন ধর্মে এতটা দর্শনের 'চক্ষু মিলন', সাধনার মেলবন্ধন, প্রাণের ও ভাবের বিনিময়, যথার্থ আত্মীয়তার উপঢৌকন রহিয়াছে যে, যদি তাহাদিগকে পৃথক্ বলিতেই হয়, তবে তাহা আর্য হিন্দু শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সাংখ্য, যোগী বা বৈদান্তিকের ন্যায়ই স্থানে স্থানে মতবাদে পৃথক্ হইলেও তাহা আর্য হিন্দুধর্মরূপ এক বিরাট মহাবৃক্ষেরই শাখ-প্রশাখা, অথবা এক অসীম, অনন্ত সমুদ্রেরই বিভিন্ন সাগর, নদ, নদী, আদি রূপ বিভিন্ন জলাশয়েরই নামান্তর।

আর্য হিন্দুরা জন্মান্তরবাদী, আর্য গোতম বুদ্ধ এবং বৌদ্ধেরাও জন্মান্তরবাদী। পাশ্চাত্যে ধর্মমতসমূহ এখনও এই জন্মান্তর-বাদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক ভিত্তি ধরিতে পারেন নাই। এক জড়বাদী চার্বাক বা লোকায়ত মতবাদী ব্যাতিরেকে ভারতীয় আর্য ধর্মাবলম্বী সকলেরই বিশিষ্টতা এই যে, তাঁহারা জন্মান্তরবাদী। গোতম বুদ্ধদেবের জন্মান্তরবাদিত্বও প্রমাণিত করে যে, তিনি সম্পূর্ণ আর্যহিন্দু। ত্রিপিটকের বহু স্থানে আছে যে, গোতম বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার অনেক শিষ্য-শিষ্যাগণের "পুব্বনিবাস" বা "পুব্ব জাতি জ্ঞানম্" পূর্ব জাতি বা জন্মান্তর জ্ঞান ছিল। বুদ্ধদেব নিজ মুখেই বলিতেছেন যে, তিনি পূর্বজন্মে বিদেহ মিথিলা রাজ মহাদেব ছিলেন এবং মহাদেব রূপে "চারি ব্রহ্মবিহার" ভাবনা দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। বিদেহ মিথিলারাজ "নিমিও" চারি ব্রহ্মবিহার ভাবনা সম্পতায় দ্বারা ব্রহ্মলোকে প্রাপ্ত হন এবং তাহার পুত্র "কড়ার জনক"ও সন্ন্যাস লন। এই কড়ার জনক যে মহাভারতের "কড়ার জনক" তাহাতে সন্দেহ কি? বিদেহ মিথিলারাজ জনকগণের ঔপনিষদিক ব্রহ্মবিত্তার খ্যাতি ও সাধনা গোতম বুদ্ধদেবের উপর কতখানি প্রভাব যে বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও আমরা ঐ 'মখাদের সুত্তে' পাই। একাধারে ব্রহ্মবিদ্, রাষ্ট্রবিদ্ মখাদেব জনকই যে গোতম বুদ্ধদেব হইয়াছেন এই জন্মে, ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, গোতম বুদ্ধদেব ঔপনিষদিক আর্যহিন্দু। বুদ্ধদেব নিজ মুখে আরও বলিতেছেন যে, পূর্ব এক জন্মে তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষি ছিলেন। এইকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ঋষি মহাভারত প্রণেতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মহর্ষি ছাড়া আর কে? চরিয়া পিটক আরো বলিতেছেন যে বুদ্ধদেব পূর্ব এক জন্মে "ইন্দপট্‌ঠে" (ইন্দ্রপ্রস্থে) "রাজা ধনঞ্জয়ো". রাজা ধনঞ্জয় ছিলেন। সাংখ্যযোগী ঔপনিষদিক শ্রীকৃষ্ণের ঔপনিষদিক সাংখ্যযোগ শিষ্য ধনঞ্জয়

অর্জুনের ব্রহ্মবিত্তার প্রভাবই গোতম বুদ্ধদেবের উপর এবং তাঁহার বৌদ্ধধর্মের উপর যে পড়িয়াছিল তাহা এইসব হইতে সুপরিস্ফুট। গোতম বুদ্ধদেব পূর্ব একজন্মে "মহা-গোবিন্দ ব্রাহ্মণ" ছিলেন। জন্মান্তরবাদের এই ঋষি-ঋণ প্রমাণিত করে যে, গোতম বুদ্ধদেব সম্পূর্ণ আর্য্য-হিন্দু। এই "পূর্বে নিবাণ" বা পূর্বজন্ম যিনি জানেন, তিনি ব্রাহ্মণ হন এবং গোতম বুদ্ধদেব তাহা যে জানিতেন তাহা ত্রিপিটকে নানাস্থানে নানাভাবে বলিয়াছেন। মঝ্ঝিম নিকায়ের 'ভয়ভেরবসুত্তে' গোতম বুদ্ধদেব নিজের সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, তিনি বুদ্ধত্বলাভের রাত্রির প্রথম যামে "অনেক বিহিতং পুর্ব্বেনিবানং অনুস্সরামি" অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব জন্মের বহু জন্মের কথা স্মরণ করিলাম। 'চরিয়া পিটক'এ গোতম বুদ্ধদেবের ৩৪টি পূর্ব পূর্ব জন্মের বিবরণ আছে। এই জন্মান্তরবাদ আর্যহিন্দুর বিশেষত্ব। গোতম বুদ্ধদেব তাহা সম্পূর্ণ মানিয়া লওয়ায় তাঁহার আর্যহিন্দুত্ব প্রমাণিত হয়। এই জন্মান্তরবাদ ভারতীয় আর্য-ঋষি, মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, রাজর্ষিগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং "মহেসি" বা মহর্ষি গোতম বুদ্ধদেবও তাহা কেবল স্বীকার করেন নাই, বুদ্ধত্বলাভের রাত্রিতে প্রথম যামে তাহাই তাঁহার বুদ্ধত্বের প্রথম সাক্ষাৎকার।

গোতম বুদ্ধদেবের ঋষিঋণ আমাদিগকে সাক্ষ্য দেয় যে, গোতম বুদ্ধদেব তাঁহার সর্বপ্রধান ধর্মমতসমূহের জন্য প্রাচীন আর্য সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণ বুদ্ধ সিদ্ধ মহাত্মাদিগের নিকট ঋণী। গোতম বুদ্ধদেবের ধর্মের মূল "চত্বারি অরিয় সচ্চানি" বা চারি আর্য সত্য এবং "অরিয়ো অট্ঠঙ্গিকো মগ্‌গো" বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এই চারি আর্য সত্য হইতেছে :—(১) দুঃখজ্ঞান (২) দুঃখোদয় বা দুঃখের কারণ জ্ঞান (৩) দুঃখের নিরোধ জ্ঞান এবং (৪) দুঃখ নিরোধের উপায় বা

পথের জ্ঞান। এই চারি আর্য সত্যকে বুদ্ধদেব "ব্রহ্মযান" বা ধর্মযান" বলিয়াছেন। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হইতেছে:—(১) "সম্মা দিট্‌ঠি" (সম্যক্ দৃষ্টি) (২) "সম্মা সংকপ্পো" (সম্যক্ সংকল্প), (৩) "সম্মা বাচা" (সম্যক্ বাক্য) (৪) "সম্মা কম্মন্তো" (সম্যক্ কর্মান্ত বা ব্যবসায়), (৫) "সম্মা আজীবো" (সম্যক আজীব বা জীবিকা). (৬). "সম্মা বায়ামো" (সম্যক্ ব্যায়াম বা চেষ্টা, (৭) "সম্মা সতি" (সম্যক্ স্মৃতি), ও (৮) "সম্মা সমাধি" (সম্যক্ সমাধি) এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে গোতম বুদ্ধদেব "ব্রহ্মচরিয়ং বা ব্রহ্মচর্য বলিয়াছেন। এই আর্য ব্রহ্মচর্য বৈদিক বা ঔপনিষদিক পারিভাষিক শব্দ বা technical term। চিত্তের পরম একাগ্রতা-রূপ সমাধিকেও তিনি বলিয়াছেন, "অরিয়ো সম্মা সমাধি স উপনিসো ইতিপি" অর্থাৎ:— স উপনিষ আর্য সম্যক্ সমাধি। গোতম বুদ্ধদেবের পূর্বে অতীত-কালেও কুলপুত্রগণ ঐ চারি আর্যসত্য সম্যক্ জ্ঞানের জন্য প্রব্রজিত বা সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। সংযুক্ত নিকায়েই আছে:—"অতীতকালে যে সব কুলপুত্রগণ গৃহত্যাগ-পূর্বক সম্যক্ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই চারি আর্য সত্যের যথাভূত জ্ঞানের জন্য তাহা করিয়াছিলেম।" সংযুক্ত আরও বলেন, "যে সব শ্রমণেরা বা ব্রাহ্মণের অতীতকালে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহারা সকলই এই চারি আর্যসত্যে অভিসম্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। প্রাচীন শ্রমণ বা সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত এই দুঃখ-নিরোধের চারি আর্যসত্য গোতম বুদ্ধদেব ঋষিঋণরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার সাধনায় শক্তি দিয়াছিলেন। পাতঞ্জল যোগদর্শন এই দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের হান, ত্যাগ বা নিরোধ এবং দুঃখ হানের বা ত্যাগের উপায় পরিষ্কৃতভাবেই বলিয়াছেন। গোতম বুদ্ধদেবের ধর্ম্মমতের

চারি আর্যসত্য, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, চারি ব্রহ্মবিহার, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, শ্রদ্ধা-বীর্য-স্মৃতি-সমাধি-প্রজ্ঞারূপ পঞ্চবল, অষ্ট বা নব সমাপত্তি বা বিমোক্ষ এবং নির্বাণ যে গোতম বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক শ্রমণ বা সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহা গোতম বুদ্ধদেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা-রূপ "চারি ব্রহ্মবিহার" অবৌদ্ধ অন্য তীর্থিক পরিব্রাজকদের মধ্যেও যে প্রচলিত ছিল, তাহা সংযুক্ত নিকায়ে আছে। এই মৈত্রী, করুণা, মুদিতা উপেক্ষা, ভাবনা "পাতঞ্জল যোগদর্শনম্"তেও আছে। শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা-ভাবনা যে গোতম বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ববর্তী কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে ছিল তাহার সাক্ষ্য সংযুক্ত নিকায় দিয়াছেন। সেই সময় "সহক" ভিক্ষু ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া, শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাভাবনা করিয়া এবং কামে বিরাগ করিয়া মরণান্তে ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন এবং "ব্রহ্ম সহম্পতি" বা ব্রহ্মা স্বয়ংপতি নামে খ্যাত হন। উপশমগামী ও সম্বোধগামী শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞাভাবনাকে গোতম বুদ্ধদেব "অনুত্তরং যোগক্ষেমং" বলিয়াছেন। পাতঞ্জল যোগদর্শনও বলিয়াছেন, "শ্রদ্ধা. বীর্য, স্মৃতি, সমাধি এবং প্রজ্ঞা এই উপায়ের দ্বারা বিবেকার্থী যোগীদের নির্বীজ সমাধি নিষ্পন্ন হইয়া কৈবল্য সিদ্ধ হয়।" গোতম বুদ্ধদেবের নিজস্ব বলিয়া অনেকের নিকট প্রখ্যাপিত যে "পটিচ্চ সমুপ্পাদ" বা প্রতীত্যসমুৎপাদ, তাহাও গোতম বুদ্ধদেবের বহু পূর্বে সম্যক্ সম্বুদ্ধ "বিপস্সী"র সাক্ষাৎ কৃত ধর্ম যে ছিল তাহা গোতম বুদ্ধদেব স্বয়ং বলিয়াছেন। এই প্রতীত্য সমুৎপাদ গোতম বুদ্ধদেব ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গোতমের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন কিনা তাহা বিশেষভাবে বিবেচ্য। ন্যায়-দর্শন যে গোতম বুদ্ধদেবের পূর্বেও ছিল এবং গোতম বুদ্ধদেব যে তাহা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহা

'ললিত বিস্তর'ও স্বীকার করিয়াছেন। গোতমীয় ন্যায় দর্শনম্ এ আছে যে দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি (ধর্মাধর্ম), দোষ, মিথ্যা জ্ঞানসমূহের উত্তরোত্তর ত্যাগে ও তদনন্তর ত্যাগে অপবর্গ, নিঃশ্রেয়স বা দুঃখমুক্তি হয়। উভয়ের এই সাদৃশ্য এবং ন্যায়দর্শন যে গোতম বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী তাহা পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন :—"বুদ্ধ প্রচারিত এই ক্রমিক অবস্থা-সমূহের শৃঙ্খল এত অধিক ভাষ্যসমূহের বিষয়ভূত হইয়াছে যে, তাহার কোনটিই সন্তোষজনক নহে। গোতমের (ন্যায় দর্শনকার) শৃঙ্খল গৌতমের (বুদ্ধের) শৃঙ্খল হইতে সংক্ষিপ্ততর, কিন্তু তাহাদের সাধারণ সাদৃশ্য কদাচিৎ ভুল হইতে পারে। এই দুইয়ের মধ্যে কে পূর্বতন গোতম অথবা গৌতম এ প্রশ্ন আজিও বিতর্কযুক্ত, কিন্তু আমাদের সূত্রসমূহের (ষোড়শ দ্রব্য) রচনাকাল যে সময়েই হউক না কেন, বুদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের পূর্বে একটা ন্যায়দর্শন পরিষ্কৃতভাবেই ছিল। যম, নিয়ম বা দশশীল, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধির এবং যোগ, নির্বাণ বা মোক্ষের প্রাচীনত্ব এবং ঋষি-পরম্পরা-গতত্ব বুদ্ধদেব স্বয়ংই নানাস্থানে স্বীকার করিয়াছেন। রীজ ডেভিড্স্-পত্নীও (Mrs. Rhys Davids) বলিয়াছেন, "সমাপত্তিগুলি বিভিন্নস্তরের আত্ম-একাগ্রতা-সমূহ। ধ্যানগুলিকে এবং সমাধির বিভিন্ন রূপগুলিকে অন্তর্গত করে ; ইহার সকলগুলিই বুদ্ধের পরবর্তী এবং ইহাদের সবগুলিকেই বুদ্ধধর্ম ও কৃষ্টির অঙ্গরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে।"

পালি ত্রিপিটকের বহুস্থলেই আমরা পাই যে, গোতম বুদ্ধদেব বহু ধর্মপ্রচারক ও সাধক, মহাপুরুষের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে নানা "আরামে" বা "বনে" নানা ধর্মপ্রসঙ্গ এবং নির্বাণ বা মোক্ষ বা আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচনা করিতেন। এইরূপে বহু ধর্মা-বলম্বীর একত্রিত সমাবেশের ফলে সকল ধর্মাবলম্বীকেই অন্যান্য বহু

ধর্মমতের অনেক সারাংশ এবং সনাতন সাধনার মনোবিজ্ঞানের অনেকাংশই ঋণ গ্রহণ করিতে হইত। যে ভাবধারা, যে মনোবিজ্ঞান, যে অধ্যাত্মবিদ্যার সহিত সেই সেই যুগের কোনও সমাজ বা রাষ্ট্র-সংস্থা আদৌ পরিচিত নহে, তাহা তৎকালীন ব্যক্তিবর্গের চিত্তপটে স্থান পায় না। মানুষের অন্তর্নিহিত সুপ্ত সনাতন ব্রহ্মবিদ্যা বা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের সহিত সামঞ্জস্য আনয়ন করিতে না পারিলে তাহা সভ্য-সমাজে পরিত্যক্তই থাকে। কোনও মহাপুরুষ বা মহামানবের আবির্ভাবকালে তাঁহার ভাবধারা ও অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা ও ঈশ্বরীয় আদর্শ তৎকালীন মানব-সমাজের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞেয় ছিল, দুর্বোধ্য ছিল, তৎকালীন মানব-সমাজকে এরূপ মূর্খ, অজ্ঞ, অপদার্থ মনে করিবার দাম্ভিকতা ও অহং-কেন্দ্রিক অভিমান মূর্খ ও পাপিষ্ঠদেরই থাকে। বেণাবনে কেহ মুক্তা ছড়াইতে আসে না। বানরের গলায় কেহ মুক্তার হার দোলাইয়া দেয় না। কোনও মহাভাবুক, পরম দার্শনিক, চিন্তানায়ক ও ধর্মনায়ক যখন যে সমাজ ও রাষ্ট্র-সংস্থার বিশাল কোলে ব্রহ্মবীজ ও মানববীজরূপে আবির্ভূত হন, তখন তাঁহার রস-সংগ্রহের ঋষিঋণ সে দেশের মাটীর মা-টীর কোল ভরিয়াই প্রচুর সম্ভারে সঞ্চিত থাকে। রসলেশ-শূন্য মরু-প্রান্তরে কোন্ মহাপাদপ জন্মগ্রহণ করিয়া বিপুলায়তন হইবার স্পর্ধা রাখে? মরুভূমিতেও মরূদ্যানের রসাল জলাশয়ের ধারেই তাহাদের আবির্ভাব ও বিস্তার হয়। বোধিদ্রুম গোতম ও বুদ্ধদেবও ভারতীয় আর্য-ঋষিঋণের প্রাণখাদ্যে, ভারতীয় আর্য-সমাজ ও রাষ্ট্র-সংস্থার ভাস্বর আলো, অফুরন্ত, মুক্ত বাতাস, আর উর্বর, অজস্র রসে রসাল মাটীরস-ধারায় পরি-পুষ্ট হইয়াই এত লক্ষ লক্ষ ভারতীর আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন। তখনকার সমাজের বায়ুমণ্ডল ও আবহাওয়া যদি এই মহাভাব-ধারা গ্রহণের সম্পূর্ণ উপযুক্ত না হইত, তবে গোতম বুদ্ধদেবের ধর্ম, শুষ্কভারতের

মরুপ্রান্তরে বীজেই শুকাইয়া মরিয়া যাইত। মহাপুরুষের বা মহামানবের মহিমাকে অতিরঞ্জিত করিবার ভক্ত-কবি-প্রতিভা মানব-সমাজ বা মানব-গোষ্ঠীকে হেয় করিয়া যে দুষ্ট বায়ুমণ্ডল-বেষ্টনী রচনা করিতে গিয়াছেন, তাহাতে মহর্ষি, মহামানব বা মহাপুরুষের আবির্ভাব নিরর্থক ও অপপ্রয়োগ হয়। আর ইতিহাসও তাহা সমর্থন করে না। গোতম বুদ্ধধর্ম যে ভারতীয় আর্য দার্শনিক আবহাওয়ায় ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রাণখাদ্যে পরিপুষ্ট হইয়া বহুলোক-কল্যাণে, "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" ব্রতী হইয়াছিল, তাহার পৈতৃক ঋষিঋণ বংশানুক্রমিক ধারায় নিহিত ছিল ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার ব্রহ্মবীজে, মনোবীজে, ভারতীয় আর্য আধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের শুক্রকীটে বা বীজকোষে। যে মানব-বীজ-কণিকা-কোষে (human germ-cellএ) ভবিষ্যৎ সম্যক্ সম্বুদ্ধের জীবন-বীজ সুপ্ত ছিল, সে মানববীজ-কণিকা ভারতীয় সাধনায়, ভারতীয় আর্য ব্রহ্মবিদ্যায়, মধুবিদ্যায় ভরপুর ছিল। সেই সুপ্ত ব্রহ্মবীজকে তপস্যার বিপুল বিভায় সম্যক্ প্রস্ফুটিত ও বিকশিত করার মহাসাধনাই গোতম বুদ্ধদেবের বিশিষ্টতা। সেই নির্বাণ যোগ বা মোক্ষ-সাধনার প্রাণকথা, অমৃত-বাণী, বেদমন্ত্র গোতম বুদ্ধদেব শিখিয়াছিলেন দুই প্রধান গুরু বা আচার্যের নিকট হইতে। সাংখ্য গুরু আড়ার কালাম এবং যোগী গুরু রুদ্রক রামপুত্রের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রতিভাবান্ মহাশিষ্য গোতম বুদ্ধদেব কতখানি রসধারা, আলো জল বায়ু যে আহরণ করিয়াছিলেন জীবন-কোষে, প্রাণ-বৃন্তে—তাহার ইতিহাস, সাধন-তত্ত্ব ও ধর্ম-বিজ্ঞান আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সাংখ্য-যোগী শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় শ্রীগোতম বুদ্ধদেব সনাতন আর্য সাংখ্যযোগ-ধর্ম সাধনার এক অভিনব অভিব্যক্তি, এক দীপ্ত পরিণতি, এক পরম অমৃত-ফল, "অরহত্ত ফলম্"।

"যে মুনি স্বীয় পূর্বনিবাস বা পূর্বজাতি বা জন্ম জ্ঞাত হন এবং স্বর্গ ও নরক দিব্যদৃষ্টিতে দেখেন, যাঁহার জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, যিনি কার্যনিষ্ঠাপ্রাপ্ত, অভিজ্ঞা-সম্পন্ন, যাঁহার সমস্ত ব্যবসায়ের অবসান বা সাধ্য-সাধনের শেষ হইয়াছে, তাঁহাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলি"। (ধম্মপদ।৪১) "ত্রিবিদ্যা-সম্পন্ন, অসম্মূঢ়-বিহারী, সেই অন্তিম শরীরধারী গোতম বুদ্ধকে নমস্কার করে, যিনি স্বীয় পূর্ব জন্ম সব জানেন, স্বর্গ নরক দিব্য দৃষ্টিতে দেখেন, যাঁহার জন্ম ক্ষয় হইয়াছে, যিনি কার্যনিষ্ঠাপ্রাপ্ত অভিজ্ঞা-সম্পন্ন এই ত্রিবিদ্যায় যিনি ত্রিবিদ্য ব্রাহ্মণ হন" (সুত্তনিপাত ৩।৯।৫৪) সেই মুনি, ব্রাহ্মণ, গোতম বুদ্ধদেবের ব্রহ্মবিদ্যার ব্রাহ্মণসাধনার আর্যধারার প্রাণকথা আর্যহিন্দুমাত্রেরই স্মরণীয়।

ওঁ শান্তি ওম্

বুদ্ধের অবদান

কাল নিরবধি--আকাশের মত নিঃসীম ও নিরালম্ব। তথাপি মানুষের প্রয়োজনে তাহাকে আমরা ভাগ করি—তাহাকে ছেদ করিয়া কাল্পনিক যুগ, শতাব্দী ও বর্ষ রচনা করি। মানুষের জীবন-সমুদ্রে মাঝে মাঝে আবর্ত্ত আসে—চারিদিক হইতে জলস্রোত একমুখী হইয়া সঙ্কট সৃষ্টি করে—ইহাকেই বলি যুগসন্ধি।

আজ আমরা এমনই যুগসন্ধিক্ষণে। ইতিহাসের চলার পথে নানা ভাবের ও নানা স্রোতের সংঘর্ষ বাধিয়াছে। দুঃখতমসা-গভীর এই

নিশীথ রাত্রি শেষ কথা নয়—ইহার শেষে আছে নব আশারুণ-দীপ্ত সমুজ্জ্বল প্রভাত। সে প্রভাতের বর্ণরাগ আপনা-আপনি ফুটিয়া উঠিবে না—তাহার জন্য চাই মানুষের সাধনা; তাহার জন্য চাই নব দৃষ্টিভঙ্গী, নব প্রচেষ্টা।

এই সাধনা আশাময় সাধনা—তাহার লক্ষ্য ভাবী কালে তাহার আশাপ্রদীপ্ত ভবিষ্যৎ। কিন্তু ভবিষ্যৎ ত অবিচ্ছিন্ন নয়; অতীত ও বর্ত্তমানের সঙ্গে তাহার অচ্ছেদ্য নাড়ীর যোগ। এই যুগসন্ধিক্ষণে তাই অতীতের আর এক যুগসন্ধিক্ষণের কথা বলিব।

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শকও এমনই পরিবর্ত্তনের যুগ—এমনই বিপ্লবক্ষুব্ধ চাঞ্চল্যের কাল। তখনকার যে-সব দেশে মানুষ সভ্যতার আলোক পাইয়াছিল, সর্ব্বত্র একই ভাবে নব জাগরণের উদ্বোধন হইয়াছিল।

চীনে কংফুচে ও লাউৎজু, পারস্তে জরথুস্ত্র, গ্রীসে পিথাগোরাস, ভারতবর্ষে বুদ্ধ ও মহাবীর এই বিরাট বিবর্ত্তনের জয়স্তম্ভ। ইতিহাস চলার ইতিহাস। সে চলার রেখাচিত্রে সাধারণ মানুষ পায় না স্থান—যাহারা মহামানব তাঁহারাই কেবল দাগ রাখিয়া যান।

বৈশাখী পূর্ণিমা পুণ্য তিথি—এই তিথিতেই বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধের বোধিলাভ এবং পরিনির্ব্বাণ। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পৃথিবীর এই মহত্তম ঐতিহাসিক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। সেই মহাপুরুষের অবদানের কথা আলোচনা করিয়া তাঁহার শ্রদ্ধাতর্পণ করিব এবং তাঁহার বাণী যে পথ নির্দ্দেশ করে তাহার ইঙ্গিত করিব।

'ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে'র কবি জয়দেব তাঁহার দশাবতার-স্তোত্রে বুদ্ধকে প্রণাম করিয়া লিখিয়াছেন—

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয় দর্শিতপশুঘাতম্
কেশব ধৃতবানসি বুদ্ধশরীরং
জয় জগদীশ হরে।

কিন্তু অবতারে পরিণত হইলে কি হইবে, বুদ্ধ তাঁহার আপন দেশে আজ বিস্মৃত—তাঁহার ভাব ও বাণী সর্ব্বগ্রাসী হিন্দুধর্ম্মের কবলে কবলিত। হিন্দুধর্ম্মকে গালি দিতেছি না—হিন্দুধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক, সমুদার; সে আলিঙ্গন করিতে গিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে, ইহা তাহার জীবনীশক্তির চিহ্ন। কিন্তু ইহা একান্ত পরিতাপের বিষয় যে, বুদ্ধের বুদ্ধিদীপ্ত জ্ঞানশিখা আমাদের জীবনে অতি স্বল্পালোক বিস্তার করিতেছে।

মানুষের চলার ইতিহাস প্রগতির ইতিহাস। কিন্তু সে প্রগতি রৈখিক নয়, বৃত্তাকার। উত্থান ও পতন, বৃদ্ধি ও অবসাদের ছন্দে তাহা দোদুল। বৈদিক সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনকালের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাহার গৌরবময় চূড়া আজিও অপরাজেয় মহত্বে দৃপ্ত। বেদ ও উপনিষদের ছত্রে ছত্রে অমৃতের বাণী, বীর্য্য ও বলের প্রার্থনা, আনন্দ ও অভয়ের জয়গান। বৈদিক ঋষির কণ্ঠে কল্যাণ ও বরাভয়ের মন্ত্র উদ্গীত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শাশ্বত গতির যে চমৎকার বর্ণনা পাই, তাহারই প্রতিধ্বনি আধুনিক পাশ্চাত্য প্রগতিবাদী দার্শনিকদের গ্রন্থে দেখিতে পাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই চলার মন্ত্র আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। এই অপূর্ব্ব শ্লোকের স্বচ্ছন্দ বঙ্গানুবাদ দিতেছি—

শ্রান্ত যে জন পন্থা চলি, শ্রী যে তারই নানা,
ইক্ষ্বাকুসুত রোহিত ওগো, এই ত চিরশ্রুতি;
রইলে শুয়ে শ্রেষ্ঠ জাত লভে পাপের হানা;
ইন্দ্রসখা পান্থজনের বলছে চরৈবেতি।

জঙ্ঘাযুগল পুষ্পিত তার যে জন চলে পথে,
ফলগ্রহি আত্মা যে তার বৃহৎ নেয় লুঠি,
পলায় যে তার পাপের বোঝা চড়ি মৃত্যুরথে
পথে চলার শ্রমে হত, চল পথে ছুটি।
যে জন বসে, ভাগ্য যে তার রয় ত বসে বসে ;
উচ্চশিরে যে রয়, সে রয় উন্নতিরি রথে।
যে জন রয় শয়নসুখে ভাগ্য তাহার খসে,
যে চলে তার ভাগ্য বাড়ে, চল চল পথে।
কলি কোথায় ? যে রয় শুয়ে আছে তারই কাছে,
যে জেগেছে জীবনে তার দ্বাপর জাগে হাসি,
যে উঠেছে সে চলেছে ত্রেতাযুগের পাছে,
যে চলেছে সে সত্যযুগে, বাজাও চলার বাঁশী।
যে চলে সে পেয়েছে অমৃতময় মধু ;
যে চলেছে স্বাদু ডুমুর খায় সে হাসি হাসি।
চেয়ে দেখ দীপ্ত সূর্য্য আকাশপথের বঁধু
তন্দ্রাবিহীন চলছে শুধু, বাজাও চলার বাঁশী।

কিন্তু এই আনন্দময় আশাময় যুগ বেশী দিন রহিল না। বিকার আসিল—সাধনা প্রাণহীন কর্ম্মকাণ্ডে পরিণত হইল, যজ্ঞ ও মন্ত্র মানুষের হৃদয়কে শুষ্ক করিল। জাতিভেদ, কুসংস্কার, পশুবলি এই প্রাণবন্ত সভ্যতার মাঝে নির্জ্জীবতা ও মৃত্যুর ক্লেদ আনিল। আড়ম্বর, ক্রিয়াবাহুল্য, অনুষ্ঠানের নির্ম্মম ভার মানব-চিত্তকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। গীতাতেও পার্থসারথি ইহার নিন্দা করিয়াছেন—

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥

এই বিদ্রোহী যুগের শ্রেষ্ঠতম সত্যানুসন্ধিৎসু তথাগত বুদ্ধ। তাহার অমর জীবনের কথা সকলে জানেন, তথাপি সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিব।

হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু নগরে গণতান্ত্রিত নায়ক রাজা শুদ্ধোদনের নয়নমণি হইয়া সিদ্ধার্থ জন্মগ্রহণ করেন। মানুষের যাহা বাঞ্ছিত, তাহা সবই তাহার ছিল। স্নেহময় পিতা, অনিন্দ্যসুন্দরী বধূ প্রেমময়ী গোপা, নবজাত পুত্র, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও সম্পদ্। কিন্তু যে অতৃপ্তি যুগে যুগে মানুষকে পাগল করিয়া তোলে, সেই অতৃপ্তি তাঁহাকে পাইয়া বসিল। অনিত্য সংসারে তিনি নিত্য সুখের সন্ধানের জন্য ব্যাকুল হইলেন। এই সুগভীর ব্যাকুলতা তাঁহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিল। মহানিষ্ক্রমণ কাব্য হইতে তুলিতেছি—আদরিণী গোপার অভিমানভরা বাক্যের উত্তরে সিদ্ধার্থ বলিতেছেন—

'নহে অভিমান ওরে আদরিণী গোপা!
এই জীবনের অনিত্য চঞ্চল খেলা
যত ভাবি, তত ভাবি, না হেরি উপায়,
যে মাধুরী অঙ্গে তব বিলায় লাবণ্য
একদিন জরা আসি করিবে কাতর
ক্ষীণ হবে একে একে সুষমা চন্দ্রমা,
সে ভাবনা করেছে ব্যাকুল। পথহারা
পথিকের মত, নিরুদ্দেশ ভাবনায়
আমি মুহ্যমান।

গোপা—ভুলে যাও প্রিয়তম !

সিদ্ধার্থ— ভুলিতে পারি না,

ঘুরে ফিরে এ ভাবনা রহে বক্ষ চাপি,

বেদনায় যেন মোর না চলে নিঃশ্বাস।

হে সহধর্ম্মিণী !

হও সাথী সত্যকার, দেহ মুক্তি মোরে

প্রেমের বন্ধন হতে।

গোপা— কি বলিছ প্রিয়তম ?

সিদ্ধার্থ— আমারে বিদায় দেহ, আমি যাব দূরে

সন্ন্যাস গ্রহণ করি। করিব সন্ধান,

যে সত্য আজিও হায় পায় নি মানব,

আমি তার করিব সন্ধান। তপস্যায়

সে সত্য করিব উদ্বোধন—দেহ তুমি

অনুমতি, দেহ প্রিয়তমে !

বিদায়ের এই অশ্রু হয়তো প্রয়োজন ছিল। বড় কঠিন ত্যাগ না করিলে সত্য হয়তো আমাদের জীবনে প্রাণবন্ত হইয়া ওঠে না। সংসারে লক্ষ লক্ষ গোপা জন্ম ও মৃত্যু, আধি ও ব্যাধির কবলে কবলিত। তাহাদের দুঃখকাল শেষ করিতে মহাপুরুষ বুদ্ধকে প্রেমের সুগভীর বন্ধন ত্যাগ করিতে হইল। শুদ্ধোদন যখন বাধা সৃষ্টি করিলেন, তখন সিদ্ধার্থ চারিটি বর চাহিলেন—

দেহ মোরে ব্যাধিহীন চির সুস্থ দেহ,

দেহ মোরে জরাহীন অমর যৌবন,

দেহ পিতা মৃত্যুহীন অনন্ত আনন্দ,

দেহ মোরে সুখময় অক্ষয় অমৃত।

পিতা এই প্রার্থনা পূরণ করিতে পারেন না। উত্তর করেন

অসম্ভব প্রার্থনা পূরণ,
সৃষ্টির বিধাতা যিনি নাহি শক্তি তাঁরো
পূরাতে বাসনা তব।

সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসের অনুমতি লাভের সুযোগ পাইলেন, কহিলেন—

তবে দেহ অনুমতি
আমি যাব, নাহি জানি কোথা কোন্ দেশে,
সত্যের করিব অন্বেষণ—তপস্যায়
অমৃতের করিব সন্ধান—যদি পিতা
ব্যর্থ হই, নাহি ক্ষতি, যদি সত্য পাই,
ধরণীর দুঃখধারা করিব নিঃশেষ।

এই মহাভাবে ভাবুক সিদ্ধার্থ মহানিষ্ক্রমণ করিয়া পরম মঙ্গলময় বোধি লাভের জন্য বাহির হইলেন। রাজগৃহে নৃপতি বিম্বিসার তাঁহাকে আপন রাজ্য প্রদান করিতে চাহিলেন, তাহার উত্তরে সিদ্ধার্থ বিষসম অনন্তদোষ কামের প্রতি আপন অনাসক্তি জানাইয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি নানা সন্ন্যাসীর আশ্রমে তাঁহাদের সাধনপদ্ধতি পর্য্যবেক্ষণ করিলেন। বৈশালীর আরাড় কালাম নামক সুপণ্ডিত ঋষির নিকট এবং শৈলগুহার রামপুত্র রুদ্রকের নিকট তিনি শাস্ত্রাধ্যয়ন ও যোগাভ্যাস করেন। এই পণ্ডিতেরা তাহার ক্ষুধা মিটাইতে পারিলেন না—রুদ্রকের পঞ্চ শিষ্য কৌণ্ডিল্য, অশ্বজিৎ, ভদ্রীয়, বামন ও মহানামের সঙ্গে তিনি উরুবিল্ল গ্রামে নৈরঞ্জনা নদীতীরে দুশ্চর কৃচ্ছ্রসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥

বুদ্ধদেবের চিত্তেও এই মহৎ সত্য জাগরূক হইল—তিনিও আপন মনে বলিলেন—

"পথ অন্যে কে দেখাইবে? আপন পথ আপনি না দেখিলে অন্যে দেখাইবে কে?"

আত্মসামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কঠোর সাধনায় ছয় বৎসর কাটাইলেন। দেহ কঙ্কালসার হইল, অনাহারে, অনিদ্রায় তাহার অলোকসামান্য রূপলাবণ্য ঝরিয়া গেল; কিন্তু যে নির্ব্বাণ লাভের জন্য সাধনা, যে বাসনা জয়ের জন্য তপস্যা, তাহার কিছুই হইল না। স্নান করিয়া পুণ্যবতী শ্রেষ্ঠি-দুহিতা সুজাতার দত্ত পরমান্ন গ্রহণ করিয়া নবীন উৎসাহে সত্যলাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

নিয়মিত পানহার আরম্ভ করায় কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পঞ্চশিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। কিন্তু তাঁহার সংকল্প বিচলিত হইল না, বরং নবীন আগ্রহে তিনি বলিলেন—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধি বহুকল্পদুর্ল্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চালিষ্যতে॥"

এই সাধন-সমরে সিদ্ধার্থ ও মারের যে প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, বৌদ্ধশাস্ত্রে তাহার চমৎকার বর্ণনা আছে। মূর্ত্তিমান কাম মার তাঁহাকে বলিল, "দুর্গম দুষ্কর দুঃসম্ভব বোধিলাভে তোমার প্রয়োজন কি? তুমি বাঁচিবার চেষ্টা কর, জীবিত থাকাই তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।"

সিদ্ধার্থ পুণ্য ও জীবন লাভের এই আহ্বান উপেক্ষা করিয়া মারের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া বলিলেন—

"কামা তে পঠমা সেনা দুতিয়া অরতি বুচ্চতি।
ততিয়া খুপ্পিপাসা তে, চতুত্থী তন্হা পবুচ্চতি॥
পঞ্চমী থীনমিদ্ধন্তে ছট্‌ঠা ভীরূপ বুচ্চতি।
সপ্তমী বিচিকিচ্ছা তে মক্‌খো থম্ভো তে অট্‌ঠমো॥
লাভো সিলোকো সক্কারো মিছো লদ্ধো চয়োরসো।
যো চত্তানং সমুক্কংসে পরে চ অবজানতি॥
এষা নমুচি তে সেনা কন্‌হস্সাভিপ্প্‌হায়ণী।
ন তং অস্থরো জিনাতি জেত্বা চ লভতে স্থখং॥"

মারের এই পরিচয় দিয়া সিদ্ধার্থ স্পর্দ্ধার সহিত বলিলেন :—

হে পাপিষ্ঠ মার! প্রমত্ত জনের বন্ধু!
মৃত্যু শ্রেয় পরাজিত জীবনের চেয়ে।
আম্রপাত্র ঝরে যথা প্রস্তর-আঘাতে,
চূর্ণিব সেনানী তব প্রজ্ঞাবলে তথা।
সংকল্প করিয়া বশ, স্মৃতি প্রতিষ্ঠিত,
প্রচারিব দেশে দেশে নূতন বিনয়।
অপ্রমত্ত ধ্যানরত শিষ্য হবে যারা
অশোক অমৃত-লোকে স্থান পাবে তারা।

মার পরাজিত হইয়া গৌতমকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সিদ্ধার্থ আবার ধ্যাননিমগ্ন হইলেন। একোনপঞ্চাশৎ দিনে রজনীর প্রথম যামে এক শুভ মুহূর্ত্তে সিদ্ধার্থের পূর্ব্বজন্ম জ্ঞান হইল। তাহার পর ধীরে ধীরে কমলের বিকাশের মত তাঁহার হৃদয়ে প্রতীত্য-সমুৎপাদ তত্ত্ব প্রতিভাত হইল।

সত্যলাভে তাঁহার হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, তিনি আনন্দে গাহিয়া উঠিলেন—

"অনেকজাতিসংসারং সন্ধ্যা বিস্সং অনির্ব্বিসং
সহকারকং গবেসন্তে দুক্খ জাতি পুনপ্পুনং।
সহকার দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বং তে ফাসুকা ভগ্গা গহকুচং বিসংখিতং।
বিসঙ্খার গতং চিত্তং তনহানং যয়মজ্‌ঝগা॥"

তোমার সন্ধানে ফিরি, হে গৃহকারক,
কত জন্ম-জন্মান্তর কত যে সংসার,
ঘুরিয়াছি নাহি শেষ। জন্ম-দুঃখময়,
চিনেছি তোমায় আজি। আর না পারিবে
করিতে নির্ম্মাণ গৃহ; ভেঙ্গেছি সকল
গৃহস্তম্ভ, পার্শ্বদণ্ড। গিয়েছে বাসনা;
মুক্ত চিত্ত মোর তৃষ্ণায় করেছে ক্ষয়।

*বুদ্ধদেব ৩৫ বৎসর বয়সে বোধি লাভ করেন, তাঁহার অশীতিবর্ষ পর্য্যন্ত তিনি নবধর্ম্ম প্রচারে কালাতিপাত করেন। দিনের পর দিন তাঁহার অমৃতময়ী বাণী মন্দাকিনীর ধারার ন্যায় মানুষের চিত্তভূমি উর্ব্বর ও সতেজ করিয়াছিল। বৌদ্ধ ত্রিপিটক ও জাতকে এই সব অপূর্ব্ব আলাপন সংগৃহীত আছে। সাহিত্যরস-রসিক, ভাবুক, শ্রদ্ধাবান্ তাহাতে অক্ষয় আনন্দ লাভ করিবেন।

বুদ্ধের জীবন ও অবদান আলোচনা করিবার সময় আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রের কথা ভুলিলে চলিবে না। অতি পুরাতন কালে বৈদিক যুগে যে সংস্কৃতি রূপ নিয়াছিল, নানা পরিবর্ত্তনের মাঝেও তাহার ধারা আজিও অব্যাহত আছে। কালের ও অবস্থার পরিবেশ

অনুসারে তাহাতে মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে তাই ভারতীয় সভ্যতা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। বুদ্ধদেব নূতনত্বের দাবী করেন নাই—তিনি পূর্ব্বতনের প্রতিষ্ঠার জন্যই আসিয়াছিলেন। যাহা ম্লান ও যাহা দূষিত হইয়াছিল, তাহাকে পরিবর্জ্জন করিয়া তিনি ভারতীয় চিন্তার সমুজ্জ্বল নূতন রূপ দিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবকে তাই ব্রহ্মণ্য ধর্ম্মের বিরোধী বলিয়া প্রচার করিলে আমরা ভুল করিব। মাঝে মাঝে যে-সব সংস্কারক আসিয়া ভারতীয় আর্য্য ধর্ম্মকে উজ্জীবিত করিয়াছেন, বুদ্ধদেব তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার সাধনা ও বাণীতে তাই পূর্ব্বতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। এই সম্বন্ধে পণ্ডিত রিজ ডেভিড্‌স যাহা বলিয়াছেন তাহা উল্লেখযোগ্য :—

"There was not much in the Metaphysics and Psychology of Goutama which cannot be found in one or other of the orthodox systems and a great deal of his morality could be collected from earlier or later Hindu books. Such originality as Goutama professed lay in the way in which he adopted, enlarged, ennobled and systematized that which had already been well said by others, in the way in which he carried out to their logical conclusion principles of equity and justice already acknowledged by some of the most prominent Hindu thinkers. The difference between him and other teachers lay chiefly in his deep earnestness and in his broad public spirit and philanthrophy."

সত্য চিরন্তন, সত্য সার্ব্বভৌমিক। মহৎ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহা নূতন রূপ নেয়—তাহাতেই মহাপুরুষের বৈশিষ্ট্য। বুদ্ধ আপনার

সাধনায় ভারতীয় সংস্কৃতির যে নব রূপ দিলেন, দেশের অচলায়তন ছাড়াইয়া তাহা নব নব রাষ্ট্রে পল্লবিত ও কুসুমিত হইয়া উঠিল। সেই ধর্ম্ম আজ পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ধর্ম্ম।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য তাহার এই সর্ব্বভৌমিক রূপ। আন্তর্জাতিকতা এবং বিশ্ববোধ আধুনিক মনোভাব। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার হইলেও বিশ্বমানবতার প্রসার যথোচিত হইতেছে না। মানুষ আজিও স্বাদেশিকতার আড়াল তুলিয়া রণতাণ্ডবে মত্ত হইতেছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কিন্তু বুদ্ধ যে দীপ জ্বালিলেন, সে দীপ কোনও বিশেষ জাতির, বিশেষ দেশের নয়। ইহুদীরা ভাবিত—তাহারা ঈশ্বরের প্রিয়পুত্র; তাহাদের জন্যই ধর্ম্ম বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু বুদ্ধ তাঁহার বাণী নির্ব্বাচিত কোনও দল বা জাতির জন্য করেন নাই; তাঁহার শিক্ষা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বভৌম। মহারাজ প্রিয়দর্শী অশোক বুদ্ধের বাণীকে দেশ-দেশান্তরে পাঠাইবার বিশেষ চেষ্টা করেন। বিবেকানন্দ যেমন রামকৃষ্ণের ভাবধারাকে প্রবাহিত ও ব্যাপ্ত করিয়াছেন, মহারাজ অশোকও তেমনই বুদ্ধের অবদানকে বিশ্বজনীন করিয়াছেন। বুদ্ধ ভাব, অশোক ক্রিয়া, বুদ্ধ তেজ, অশোক প্রকাশ। মনস্বী এইচ, জি, ওয়েলস অশোককে পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম নরপতি বলিয়া অর্ঘ্য দিয়াছেন। সে অর্ঘ্য তাঁহার প্রাপ্য। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় বারাণসীর নিকট সারনাথের মৃগদাব নামক উদ্যানে তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করেন। বর্ষা ঋতু তিনি ধর্ম্মালোচনায় কাটাইলেন। বর্ষান্তে তিনি শিষ্যদের নবধর্ম্মের পতাকা হস্তে বাহির হইতে বলিলেন—

"প্রিয় ভিক্ষুগণ।

পেয়েছ যে ধর্ম্মসুধা কল্যাণ-উজ্জ্বল,
আদিতে কল্যাণ যার, অন্তেতে কল্যাণ,

মধ্যেও কল্যাণ জ্যোতি,
লহ সেই ধর্ম্ম
দেশ-দেশান্তর,
বহুজন-হিত লাগি।
যাও অনুকম্পা-ভরে
করহ প্রচার
বহুজনে দিতে সুখ
নির্ব্বাণের বাণী।
কামনার ধূলি-জাল
করে নি আচ্ছন্ন
মনশ্চক্ষু যাহাদের,
তারা অনায়াসে
করিবে প্রত্যক্ষ
নব সত্য তোমাদের।
অমৃতের স্বাদ লভি
প্রবৃত্তির দাস
হবে যাত্রী আশান্বিত
নির্ব্বাণ-পথের।
যাও সবে যাও
প্রদীপ্ত উৎসাহভরে
মানুষের ঘরে ঘরে
করহ প্রচার
নব পরিত্রাণ-বাণী।"

ভিক্ষুরা প্রভুর আদেশ পালন করিলেন। বুদ্ধের ধর্ম্ম তাই সর্ব্ব-মানবের পবিত্র উত্তরাধিকার—তাঁহার সাধনরত্ন প্রতি মানবের অমূল্য সম্পদ। জগৎ জুড়িয়া যেখানে যে আর্ত্ত আছে, যেখানে যে পীড়িত আছে, তাহার জন্যই এই অমৃতের প্রস্রবণ চির উন্মুক্ত। আর্ত্ত পীড়িত ভয়ার্ত্ত মানবকে তথাগত গুরুর মত উপদেশ দেন না, বন্ধুর মত আলিঙ্গন করেন। তাঁহার বাণী—

"অত্ত-দীপা বিহরথ অত্তশরণা অনঞ্ঞশরণা।
ধম্মদীপা ধম্মশরণা অনঞ্ঞ-শরণা।"

আপনাকেই আপনার দীপ হইতে হইবে, আপনার দ্বারাই ভবনদী পার হইতে হইবে—অনন্যশরণ হইয়া ধর্ম্মকে দীপ করিয়া সত্য লাভ করিতে হইবে।

বুদ্ধ তাই পূজা চান না—তিনি শুধু পথপ্রদর্শক। নিজে যে অমৃত-পথের সন্ধান পাইয়াছেন, সর্ব্বমানবের জন্য তাহার নির্দ্দেশ দিয়া গিয়াছেন—উত্তর-যাত্রীরা তাঁহার আবিষ্কারের ফল লাভ করুক, এইমাত্র তাঁহার বাসনা।

তথাগত তত্ত্বের জালে মানুষকে ব্যাকুল করেন না—তিনি মানুষকে সরল সহজ আত্মোৎকর্ষসাধনের পন্থা দেখান। যে যে পরিবেশে আছে, সে সেই পরিবেশে থাকুক, তাহাতে ক্ষতি নাই—সে বুদ্ধের নির্দ্দিষ্ট পন্থা অনুসরণ করিলেই বৌদ্ধ। বুদ্ধপন্থী হইতে তাই বিচিত্র ও বিভিন্ন মানুষের কোনও বাধাই লাগে না। বৌদ্ধধর্ম্মের দ্বার অবারিত, পীড়িত ও তাপিত নর ও নারী যখন খুশী বুদ্ধের শরণ লইয়া আত্মোৎকর্ষসাধন করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারিবে।

বুদ্ধের দ্বিতীয় অবদান তাঁহার যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, যখন বিজ্ঞান মানুষের জীবনে আজিকার মত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, সেই প্রাচীনকালে বুদ্ধ আপন ধর্ম্মকে নিরঙ্কুশ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। বৃহস্পতির বচন অবশ্য আছে—

> কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
> যুক্তিহীনে বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥

কিন্তু সত্যকার জীবনে আমরা শাস্ত্র ও আচার একমাত্র প্রমাণ বলিয়া মানি। বুদ্ধদেব কিন্তু তারস্বরে বলিলেন যে, তাঁহার কথা যেন কেহ অবিচারে মানিয়া না লয়, সকলে যেন তাঁহার ধর্ম্মকে পরীক্ষা করিয়া লয়।

"হে নির্ব্বাণ-পথযাত্রী!

যে ধর্ম্মে আহ্বান করি তোমা সবাকারে,
চির অনবদ্য তাহা মঙ্গল-নিদান,

সুধীজন মানে তারে প্রশস্ত উদার।
এস হে মানব, হে তাপিত আর্ত্ত বন্ধু,
এস মোর কাছে, আমি দিব সুধাধারা;
বলিব না কোনো দুর্জ্ঞেয় রহস্য-কথা;
জানাব না পুরাতন সেকালের বাণী;
চাহিব না বিশ্বাসের মূঢ় ভক্তি, বন্ধু;
বলিব যা দেখে নিও নিজ চক্ষু দিয়া,
বুদ্ধি দিয়া বিচারিয়া করিও গ্রহণ;
বুঝিবে সুফল তার প্রত্যক্ষ প্রমাণে।
জানে না আড়াল কোনো মোর বাণী প্রিয়!
সে যে ঋজু, সুপ্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট সরল।"

এই কারণেই বুদ্ধের বাণী আধুনিক বুদ্ধিজীবী মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। বুদ্ধের সহিত আর একজন মহাপুরুষের তুলনা হয়—তিনি পার্থ-সারথি শ্রীকৃষ্ণ। উভয়েই বেদের প্রাধান্যকে অস্বীকার করেন এবং ধর্ম্মকে আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। শ্রীকৃষ্ণ কেবল কর্ম্মকাণ্ডের নিন্দা ও অসারতা প্রদর্শন করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মকে জীবনপথের আলো করিয়া তোলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ ও গীতা অপরাজেয় গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত। বুদ্ধদেব বেদের কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই অস্বীকার করেন। যে আত্মতত্ত্ব উপনিষদের চরম অবদান, সেই আত্মতত্ত্বকে তিনি অস্বীকার করিয়া অনাত্মবাদের উপর আপন ধর্ম্মকে দাঁড় করান। বেদবিরোধী বলিয়া বুদ্ধ তাই নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হন এবং কালক্রমে আপন দেশ হইতে তাহার ধর্ম্ম নিঃশেষ হইয়া যায়।

কিন্তু প্রকৃতভাবে দেখিলে গীতার শিক্ষা ও বুদ্ধের শিক্ষায় বিশেষ প্রভেদ নাই। গীতার 'অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্র করুণ এবচ'

শ্লোকের সহিত বুদ্ধের মুদিতা, মৈত্রী ও করুণার চমৎকার সাদৃশ্য আছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—তুমি নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের উদ্ধার সাধন করিবে; বুদ্ধও বলিয়াছেন—তুমহেহি কিচ্চং আতপ্পং—তোমাকেই উদ্যমের সহিত তপস্যা করিতে হইবে। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মের আদর্শ আর বুদ্ধের নীতির মধ্যে বহুল সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বুদ্ধ কোন বিষয়ে আপোষ করেন নাই—তাঁহার নির্ম্মল প্রজ্ঞায় সত্যের যে রূপ ফুটিয়াছে, তাহাকে তিনি নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়াছেন। এই নির্ভীক ঋজুতা, এই সত্যানুসন্ধিৎসু তিগ্মতা, এই বৈজ্ঞানিক মনোভাব তাঁহার শিক্ষাকে বর্ত্তমানের মানুষের এত প্রিয় করিয়া তুলিয়াছে।

বুদ্ধের তৃতীয় বিশেষত্ব—তাঁহার অনন্যসুলভ প্রাঞ্জলতা। তিনি সাধককে তত্ত্বের দুর্গম গহনে পথ হারাইতে বারণ করিয়া কল্যাণ ও মঙ্গলের জীবনবৃত্ত অনুসরণ করিতে বারংবার বলিয়াছেন। দার্শনিক কচ্‌কচি তিনি ভালবাসিতেন না। যাহা অনির্ব্বচনীয় চরম সত্য, তাহা মানুষ কোনও দিন বাক্যে বলিতে পারে না, জীবনের এক বিশেষ শুভ মুহূর্ত্তে সত্যজ্যোতি মানুষের হৃদয়ে আপনা-আপনি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তাহা যতদিন না হয়, ততদিন এই সমস্ত অব্যক্ত দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব লইয়া অপ্রতিষ্ঠ তর্ক করিয়া লাভ নাই। নির্ব্বাণের শান্তি মানুষের কাম্য—অনির্ব্বচনীয় রহস্য লইয়া কালক্ষেপ করা অযথা অপব্যয়, সে বরং মানুষকে ভ্রান্ত করে।

মঝ্‌ঝিমনিকায় সুত্তে তিনি একটি চমৎকার উপমা দিয়াছেন—একজনের দেহে বিষাক্ত তীর লাগিয়াছে, সে যদি তৎক্ষণাৎ তীর না উঠাইয়া তীর-নির্ম্মাতা কে, কে তাহার নিক্ষেপকারী, কি তাহার উদ্দেশ্য, এইসব বিষয় লইয়া আলোচনা করে, সে যেমন অর্ব্বাচীনের

মত কাজ করে, তেমনই আধিব্যাধি-শোকতাপে জর্জ্জর মানুষ যদি নির্ব্বাণের পথ সন্ধান না করিয়া পৃথিবী ও আত্মা লইয়া গভীর তত্ত্বানুশীলন করে, তবে সে মূর্খতারই পরিচয় দিবে।

বুদ্ধের দৃষ্টি প্রাগ্‌ম্যাটিক। তিনি যে চারি আর্য্যসত্যের সন্ধান পান—দুঃখ, দুঃখ-সমুদয়, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ-নিরোধ-মার্গ—এই সত্য কার্য্যকরী। ইহার আলোচনা ও অনুশীলনে মানুষের সত্যকার উপকার হয়।

দুঃখের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে আমরা সকলেই নিসংশয়। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক, তাপ, প্রিয়বিয়োগ, অপ্রিয়-সংযোগ আমাদের সকলেরই জীবনে ঘটিতেছে। এই দুঃখই মানুষকে দার্শনিক করিয়া তোলে। প্রতীত্যসমুৎপাদ নামক মতবাদের দ্বারা বুদ্ধ দুঃখের কারণ নির্ণয় করিলেন। প্রতীত্যসমুৎপাদ এক কথায় ল' অব কজেসান (Law of causation)। দুঃখ-বিদ্যমানতার মূল জন্ম। মানুষের যদি জন্ম না হইত, তাহা হইলে তাহাকে কোনরূপ দুঃখ পোহাইতে হইত না। জন্মের কারণ কি? ভব। ভব শব্দের অর্থ জন্মিবার ইচ্ছা—আসক্তি। অনুরাগরূপ উপাদান হইতেই জন্মিবার প্রবৃত্তি হয়। তৃষ্ণা এই উপাদান সৃষ্টি করে। কিন্তু তৃষ্ণা হয় কেন? কারণ পূর্ব্বে সেই সব কামনার বিষয় আমরা উপভোগ করিয়াছি—ইহারই সংজ্ঞাশব্দ বেদনা। তৃষ্ণার কারণ বেদনা—বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বা স্পর্শ হইতেই বেদনা হয়। সংযোগের মূল ষড়েন্দ্রিয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মন—এই ষড়ায়তন নামরূপের উপর অবস্থিত আমাদের দেহ-মন। নামরূপ—বিজ্ঞানই তাহার মূল—সংস্কার হইতে বিজ্ঞান উৎপন্ন, অবিদ্যাই সংস্কারের কারণ। এই দ্বাদশ হেতুই মানুষের জন্মের ধারাবাহিক পরম্পরা, ইহাকেই চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান বলে।

বুদ্ধ বুঝিলেন অবিদ্যাই দুঃখোৎপত্তির কারণ। অবিদ্যার যদি তিরোধান হয়, তাহা হইলেই দুঃখ-নিরোধ হইতে পারে। এই দুঃখ-নিরোধের নামই নির্ব্বাণ এবং দুঃখনিরোধের পথ বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গ—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত, সম্যক্ জীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি। এই চতুরার্য্যসত্যের জ্ঞানলাভ সাধনার প্রথম স্তর। নির্ব্বাণপথযাত্রী দুঃখ কি, দুঃখের কারণ কি, দুঃখ-নিরোধ কি এবং তাহার রাজ্য কি, এই বিষয়ে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া সাধনা আরম্ভ করিবে। এই জ্ঞান লাভ করিয়া অহিংসা, নৈষ্ক্রাম্য অব্যাপদ এই তিন বিষয়ে গভীর সংকল্প করিতে হইবে। সাধক আসক্তি ত্যাগ করিয়া অহিংস জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিবে।

চতুর্ব্বিধ মিথ্যা ত্যাগকে সম্যক্ বাক্ বলে। সত্যগোপন ও মিথ্যা-প্রচার প্রথম; একজনের কথা অন্যকে বলিয়া তাহার ক্রোধ উৎপাদন পিশুনতা, উহা দ্বিতীয়; পরুষ বাক্য তৃতীয়; অলীক কথায় মনস্তুষ্টি-সম্পাদন চতুর্থ। এই চারি প্রকার মিথ্যা বাক্য পরিবর্জ্জন করিতে হইবে।

প্রাণিহত্যায় বিরতি, পরস্বাপহরণে নিবৃত্তি ও ব্রহ্মচর্য্যকে সম্যক্ কর্ম্ম বলে। যে সাধক, সে সদুপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে—দগ্ধোদরের জন্য সে যেন অসদুপায় অবলম্বন না করে।

পাপনাশ, পাপ যাহাতে না হয় তাহার চেষ্টা, পুণ্য উৎপাদন এবং পুণ্যবর্জ্জনকে সম্যক্ ব্যয়াম বলে। সত্য জানিয়া যে নির্ব্বাণ-পথে চলিয়াছে, বারংবার তাহার পদস্খলন হইতে পারে। আত্মজয়ের জন্য তাই তাহাকে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিতে হইবে।

সাধককে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তাহার শরীর শরীরমাত্র, তাহার বেদনা বেদনামাত্র, তাহার চিত্ত চিত্তমাত্র,

তাহার ধর্ম্ম ধর্ম্মমাত্র। সাধক কখনও যেন ভ্রমবশে দেহকে আত্মা বা বিষয়কে আত্মীয় বলিয়া না দেখেন। সম্যক্ সমাধি, চতুর্ব্বিধ ধ্যান, বিতর্ক বা বিচার দ্বারা অনাসক্ত হইয়া মানুষ ধ্যানের আনন্দ লাভ করে। তাহার পর স্তরে স্তরে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও শীল লাভ করে।

ইহা বুদ্ধের বিশ্বাসলাভের মার্গ—জ্ঞান, আচরণ ও ধ্যানকে সুসঙ্গত ও সুসমঞ্জস করিয়া মানুষ এই পথে কল্যাণ, পূর্ণ প্রজ্ঞা ও চিরশান্তি লাভ করে। বুদ্ধধর্ম্মকে অনেকে শূন্যতার সাধন বলিয়া ভুল করেন।

বুদ্ধ নিবৃত্তি-মার্গের উপদেষ্টা, কিন্তু এই নিবৃত্তি-মার্গ সাধককে জড় ও অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবে না, বরং তাহাকে বীর্য্যবান্ অনলস কর্ম্মী করিবে। বুদ্ধের চতুর্থ বিশেষত্ব তাহার সেবাধর্ম্ম।

বৌদ্ধসাধনায় শীলপালন নির্ব্বাণলাভের পন্থা। এই সুখকর শীলগুলি চরিত্রকে দ্রঢ়িষ্ট ও বলিষ্ঠ করিয়া তোলে। তাই আজীবন শীল পালন করিতে হইবে। বুদ্ধদেবের এই শীলসাধন এক অভিনব জিনিষ। মানুষ ইহলোক ও পরলোকের সুখকামনায় যে-সব যজ্ঞ, পূজা, ব্রত ও পার্ব্বণ করে, বুদ্ধ তাহাদিগকে নিষ্ফল বলিয়াছেন। তিনি সংযম, ইন্দ্রিয়জয় ও চরিত্রগঠনের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। কিন্তু চরিত্র শুধু Puritanism নয়—শুষ্ক বৈরাগ্য নয়, ইহা প্রেমময় দয়া-দাক্ষিণ্য-মৈত্রীমূলক কল্যাণব্রত। বৌদ্ধসাধক চিত্তকে কখনও অনাবৃত রাখিবেন না; তাঁহাকে সর্ব্বদা মঙ্গলভাবনা দ্বারা চিত্তকে পুণ্য ও পবিত্র রাখিতে হইবে।

বৌদ্ধসাধকের ভাবনার পঞ্চবিধ ভাগ—মৈত্রী, মুদিতা, করুণা, উপেক্ষা ও অশুভা। প্রথম অনুশীলন আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের মঙ্গলকামনা—স্থাবর-জঙ্গম চরাচরের মৈত্রীভাবনা—যেখানে যত প্রাণী আছে, তাহারা সকলেই যেন ক্লেশ, পীড়া ও অসৎ আকাঙ্ক্ষার কবল হইতে মুক্তিলা-

করে। দ্বিতীয় অনুশীলন—করুণা-ভাবনা, জীবের দুঃখনিবৃত্তির অনুধ্যান। সংসারে যে দুঃখদারিদ্র্য দেখি তাহাতে আমাদের চিত্ত ব্যাকুল হয়। সেই ব্যাকুলতাকে মানিয়া দুঃখ-মোচনের চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে করিতে হইবে। তৃতীয় অনুশীলন—মুদিতা-ভাবনা। সাধকের চিত্তে আসিবে আনন্দের উৎস, যে আনন্দে তাহার দৃষ্টি খুলিবে। সেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সাধক ভাবিবেন—পৃথিবীর সকলেই সমুন্নতির সৌভাগ্য লাভ করুক, সকলেই শ্রী ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা অল্প হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃহৎ হইতে বৃহত্তর বিষয়ে প্রয়োগ করিতে হইবে। ধীরে ধীরে দৃষ্টির প্রসার হইবে। সাধক পল্লী, রাষ্ট্র প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবকে এবং বিশ্বজগৎকে ভালবাসিতে শিখিবেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম অনুশীল আত্মসম্পর্কীয়—এই দেহকে কৃমিকীট-সঙ্কুল জানিয়া সাধক দেহপ্রীতি ভুলিয়া সৌভাগ্যের প্রতি বিতৃষ্ণ হইবেন এবং উপেক্ষা-ভাবনায় সকলের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইবেন। উপেক্ষা-ভাবনায় কাহাকেও প্রিয় কাহাকেও অপ্রিয় এই বোধ থাকিবে না—উপেক্ষা কামনা-পরিশূন্য অবস্থা। বৌদ্ধেরা উপেক্ষা-ভাবকেও সর্ব্বোচ্চ ভাব বলেন। উপেক্ষা-ভাবের সহিত গীতার স্থিতধী মুনির অবস্থা তুলনীয়।

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

গীতার এই শ্লোকের সহিত উপেক্ষা ভাব অনুরূপ বলিয়া মনে হইবে।

গীতার অনুশাসন আর বুদ্ধানুশাসন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যতই পড়া যায়, ততই উহাদের সৌসাদৃশ্য বিস্ময়কর-ভাবে পাঠককে অনুপ্রাণিত করে। উভয় সাধনাই মানুষকে নিরাসক্ত নির্ব্বাসনা হইতে বারংবার

উপদেশ দিয়াছে। উরগবগ্‌গে মৈত্রীসূত্রে ব্রহ্মবিষয়ের যে বর্ণনা পাই, তাহা পড়িলে মনে হইবে যেন গীতা পড়িতেছি :—

শান্তিকামী নর,
কর্ত্তব্যকুশল হবে, বিনীত সরল,
অভাব অল্পই তার, নাহি অভিমান,
অল্পেই সন্তুষ্ট রবে, না রবে ভাবনা,
জিতেন্দ্রিয়, বিবেচক, পাপহীন সদা,
অপ্রগল্‌ভ, অনাসক্ত, করুণা-বিহ্বল।
সব জীব হোক সুখী, হোক্ নিরাপদ—
সবল দুর্ব্বল কিংবা ছোট বড় যারা,
দৃষ্ট কি অদৃষ্ট, দূরে বা নিকটে যারা,
ভূতকালে ভাবীকালে যেথা যত প্রাণী
হোক্ সবে সুখী— এ হবে ভাবনা তার।
করে না বঞ্চনা কারে, নাহি জানে ঘৃণা,
ক্রোধে কভু নাহি করে অহিত চিন্তন।
পুত্রের জীবন যথা নিজ আয়ু দামে
রক্ষেন জননী, সর্ব্ব প্রাণী প্রতি তথা
রাখিবে অমেয় প্রীতি চিত্তে নিরন্তর।
বৈরশূন্য বাধাশূন্য ছড়াবে চৌদিকে
ঊর্দ্ধে নীচে দশ দিশি সর্ব্বক্ষণ ধরি
চলিতে বসিতে কিংবা শয়নে স্বপনে
মৈত্রীর মঙ্গল-চিন্তা হবে ধ্যান তার।

যিনি নিরাসক্তভাবে 'উস্‌সুকেসু মনুসথেসু বিহরাম অনুস্‌সুক'

—সেই সাধককে আমরা দুর্ব্বল, ভীরু, নিষ্কর্ম্মা বলিয়া যেন ভুল না করি।

ইংলণ্ডের বর্ত্তমান কালের চিন্তাশীল লেখক আলডুস্ হাক্স্লি তাঁর 'লক্ষ্য ও পথ' নামক অতিসুন্দর পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"The idealman is the non-attached man. Non-attached to his bodily sensations and lusts. Non-attached to his craving for power and professions. Non-attached to the objects of those various desires. Non-attached to his anger and hatred, non-attached to his exclusive loves. Non-attached to wealth, fame, social position. Non-attached even to science, art, education, philanthrophy... Non-attachment is negative only in name. The practice of non-attachment entails the practice of all the virtues·······Non-attachment imposes upon those who would practise it, the adoption of an intensely positive attitude towards the world."

বুদ্ধের পঞ্চম অবদান—এই intensely positive attitude towards the world. আত্মতত্ত্বের গহন বনে পথ হারাইয়া এই সুন্দর পৃথিবীর প্রতি এবং পৃথিবীর সুন্দর জীবন-যাত্রার প্রতি অনেকে বিমুখ হইয়া পড়িতেছিল। বুদ্ধের প্রেমের ধর্ম্ম, সেবার বাণী এবং কল্যাণব্রত মানুষের দৃষ্টি ফিরাইল। মানুষ এই জগতের জীবনকে পুণ্য, পবিত্র, শুদ্ধ, মধুর ও সুন্দর করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইল। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের ফল তৎকালীন সংস্কৃতিতে দেখিতে পাই।

বুদ্ধের আগমনে দেশে যে নব বন্যা আসিল, তাহাতে চারিদিকে আনন্দ ও শিল্প প্রকট হইল। কাব্যরস উজ্জ্বল হইল—বৌদ্ধগয়ায় ও সাহিত্যে তাহার পরিচয়। অজন্তার চিত্রকলায় এবং নানা মন্দির, ও স্তূপে যে ভাস্কর্য্য আপন ঐশ্বর্য্য ও ছন্দ বিকশিত করিল, তাহাই বৌদ্ধ-সাধনার জীবন-প্রীতির পরিচায়ক।

বুদ্ধের জ্ঞানমূলক প্রেমকে এবং তাঁর নির্দ্ধারিত নির্ব্বাণকে অনেকে ভুল করেন। নির্ব্বাণ শূন্যতা নয়—ইহা নাস্তিকের জয়গান নয়। নির্ব্বাণ কামনায় অগ্নি জ্বালায়; নির্ব্বাণ অস্তিত্বের আনন্দের ধ্বংস নহে—নির্ব্বাণ নেগেটিভ নয়, পজিটিভ; তাহা অনির্ব্বচনীয় আনন্দময় প্রাপ্তি। তৃষ্ণার যে অনলশিখা প্রতিনিয়ত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, নির্ব্বাণ তাহারই ক্ষয়। কর্ম্মবন্ধনই তৃষ্ণার মূল—জন্ম-জরা-মরণ-পথ-প্রবর্ত্তক সেই কর্ম্মবন্ধনের ক্ষয়ই নির্ব্বাণ। মিলিন্দ প্রশ্নে গ্রীক রাজা মিলিন্দের সঙ্গে বৌদ্ধভিক্ষু নাগসেনের যে চমৎকার আলাপ আছে, কৌতূহলী তাহাতে নির্ব্বাণের সুমীমাংসা দেখিতে পাইবেন।

নাগসেন বলেন—"নির্ব্বাণ সুখময়, শান্তিময়, আনন্দনিলয়, আনন্দপ্রদ এক পরম পবিত্র অবস্থা। কেহ অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইতেছে, সহসা তাহাকে কেহ মুক্তি দিল—তখন তাহার যে অবস্থা, নির্ব্বাণের আনন্দও সেইরূপ। অজ্ঞান, অহঙ্কার প্রভৃতি অগ্নিশিখা তাহাকে ঘিরিয়াছিল, তাহা হইতে সে উদ্ধার পাইল। কেহ মলিন ক্লিন্ন পচনশীল গর্ত্তে আছে, সে মুক্ত হইলে যে শুচিসুন্দর ভাব অনুভব করে, নির্ব্বাণে তাহাই হয়। আক্রান্ত ব্যক্তি মুক্ত হইলে যে নির্ভাবনা পায়, নির্ব্বাণ সেইরূপ অভয় দেয়।"

নাগসেনের এই অনুপম সংলাপ হইতে আমরা জানিতে পারি, নির্ব্বাণ শূন্যতা নয়।

নির্ব্বাণ পবিত্র আনন্দময় অন্তরের অনুভূতি, অবিদ্যা ও তৃষ্ণা-পরিশূন্য অবস্থা। নির্ব্বাণের আনন্দ অবিমিশ্র—ক্লেশমুক্ত কমলসদৃশ নির্লিপ্ত অবস্থা, বিপদহীন, বিভীষিকা-হীন, শান্তিময় অনুপম অনির্ব্বচনীয় অবস্থা।

নির্ব্বাণ-পথ জীবনকে অস্বীকার করে না—জীবনকে নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে বলে। অহং-বোধের মধ্য দিয়া যখন জগৎ দেখি, তখন পাই কেবল ব্যথা ও বেদনা; যখন প্রেমের মাঝ দিয়া দেখি, তখন তাহাকে সুন্দর ও মধুর দেখি। ভিক্ষুগণকে উপদেশে বুদ্ধ বলেন।

যো তস্সা এব তণহায় আসেস বিরাগ নিরোধো
চাগো পটিনিস্সগগো মুত্তি অনালয়ো ॥

তৃষ্ণার যে নিরোধ, বিরাগ বা বিসর্জ্জন তাহাই মুক্তি, তাহাই দুঃখ-নিরোধ। এই কামনার নিরোধ হইলেই আমরা মর্ত্ত্যেই অমৃত লাভ করিতে পারি।

এই অমৃত-জীবনের জন্য বুদ্ধের শীল, বুদ্ধের নীতি ও কল্যাণব্রত। আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক জল্পনা অনেক হইয়াছে, আমাদের দেশে দীনতম লোকও অনেক দার্শনিক সত্য জানে, কিন্তু তাহার ফল ব্যর্থ হইয়াছে। এই আধ্যাত্মিকতা আমাদিগকে পতনের গভীর অন্ধকার হইতে রক্ষা করে নাই, কারণ দার্শনিকতা মানুষকে বড় করে না, বড় করে চরিত্র।

আমরা চরিত্রহীন, তাই আমাদের এই বিরাট অধঃপতন। দার্শনিক বিজ্ঞান ত্যাগ করিয়া আমরা যেন বুদ্ধের অনুশাসন পালন করি:—

সর্ব্ব পাপস্স অকরণং কুশলস্স্ উপসম্পদা।
সচিত্ত পরিয়োদসং এতং বুদ্ধান সাসনং ॥

আমরা যেন সর্ব্বপ্রকার পাপকে বর্জ্জন করি, কুশল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি এবং চিত্তকে পরিনির্ম্মল করি। তার্কিকতা এবং দার্শনিকতা শেষ হউক, দেশে বাড়ুক নির্ম্মল মেধা, জাগুক বুদ্ধিদীপ্ত চরিত্রবল। পৃথিবীর যেখানে যে মানুষ আছে, চরিত্রের মাধুর্য্য সকলে বোঝে, সকলে তাহার অনুসরণ করে। ভাবী বিশ্বমানবতার যুগে বুদ্ধ-কথিত এই চরিত্রবলই মানবের প্রধানতম কাম্য হইবে আশা করা যায়।

বুদ্ধের ষষ্ঠ অবদান—তাঁহার কর্ম্মতত্ত্ব। ইহা প্রতীত্যসমুৎপাদের অংশ। দৃশ্যমান বিশ্বচরাচর অচিরস্থায়ী। যাহা দেখিতেছি, তাহা কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত; যেখানে কারণ আছে সেখানে কার্য্য ঘটিবে, সেই কার্য্য কারণ হইয়া নূতন ফল প্রসব করিবে, এইভাবে পৃথিবীর অবিচ্ছিন্ন কর্ম্মপ্রবাহ চলিয়াছে। কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলার কেহই নিয়ামক নাই, ইহা স্বতঃ পরিচালিত; যখনই কোনও কিছু ঘটিতেছে, তাহার ফল কিছু ফলিতেছে। কোনও কিছুই নিরপেক্ষ নহে, সকলেই আপেক্ষিক। সংসারে দৈব বা অকস্মাৎ বলিয়া কিছু নাই—সকলই এক চিরন্তন শৃঙ্খলায় নিবদ্ধ।

অঙ্গুত্তরনিকায়ে পাই, "যে কাজ করিবে তাহারই ফল পাইবে। কর্ম্মে আমার অধিকার, কর্ম্মেই আমার উত্তরাধিকার, কর্ম্মদ্বারাই আমার জন্মস্থান নির্দ্ধারণ, কর্ম্ম দ্বারাই আমার জাতি, কর্ম্ম দ্বারাই আমার আশ্রয়।"

কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, তাহার হাত হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। কিন্তু এই কর্ম্মবাদ fatalism নয়। বুদ্ধ মানবাত্মাকে কর্ম্মের চেয়ে প্রাধান্য দিয়াছেন। এই শাশ্বত প্রবাহ মানুষের প্রজ্ঞার সাহায্যে শেষ হইতে পারে। কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করিয়া

মানুষ অসাংক্রা[illegible] হইতে পারে। চক্র যেমন বাহকের পদাঙ্ক অনুসরণ করে,[illegible]ও তেমনিই কর্ত্তার পদানুসরণ করে।

মানুষই [illegible]পন চেষ্টায় আপন অদৃষ্ট গড়িয়া তুলিতে পারে, আপন শক্তিতেই [illegible]খল ভাঙ্গিয়া মুক্তির বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। [illegible]রে প্রদীপ থাকিলে যেমন সমস্ত অন্ধকার তিরোহিত হয়, [illegible]মনই প্রজ্ঞার উদয়ে সকল অবিদ্যার শেষ হয়—মানুষ শাশ্বত শা[illegible] অধিগত করে।

কর্ম্মই নিয়ামক শক্তি—কর্ম্মই জগৎলীলার নটরাজ। তাহার [illegible]রতিক্রম্য দুর্ব্বার রথচক্র বহিয়া চলিয়াছে। আত্মচেষ্টা-বলে আত্ম-শক্তিতে তাহার গতি কমাইতে হইবে। আত্মশক্তিহীন হইয়া সেই কাজ করিতে হইবে. যে কাজ করিলে লোকের অনুতাপ করিতে হইবে না এবং যাহার ফল আনন্দিত ও প্রফুল্ল-মনে গ্রহণ করিতে পারা যায়। আসক্তির বন্ধনই সকলের চেয়ে দৃঢ়। সে বন্ধন খুলিবার জন্য চাই জ্ঞান-কঠিন বজ্র, মুদিতামধুর কল্যাণব্রত, দৈবীমধুর আনন্দ।

বুদ্ধের সপ্তম ও শ্রেষ্ঠ অবদান—তাঁহার অপূর্ব্ব জীবন। ধর্ম্ম ও দর্শন যখন কেবল বাঙ্ময়, তখন তাহার প্রভাব থাকে না। যখন তাহা সাধনায় চিন্ময় হইয়া উঠে, তখনই তাহা ব্যাপক ও প্রভাবশালী হয়।

বুদ্ধের যে অকলঙ্ক জীবন-বৃত্ত বৌদ্ধসাহিত্যে আমরা পাই, তাহার মাধুর্য্যের সহিত তুলনা করা যায় এমন জীবন দুর্লভ। তিনি আপন অলৌকিক প্রতিভায় যে মহান্ সত্যকে লাভ করিয়াছিলেন, তাহা কেবল তত্ত্বমাত্র হইয়া রহে নাই। নিজের জীবনে তিনি এইসব নির্জ্জীব সত্যকে আপন সাধনায় প্রাণবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাইতো পথভ্রষ্ট আর্ত্ত আমরা তাঁহার সত্যকে কেবল দর্শন বলিয়া ক্ষান্ত

হইতে পারি না। তাঁহার বাণীতে হৃদয়ের খাদ্য
তোলে। তাঁহার চরিত্র-চিত্র বিশ্বমানবের ধ্যানের বস্তু
ও কালোত্তর মহাপুরুষ ছিলেন।

আজ বিজ্ঞান যখন মানবসভ্যতাকে ঐশ্বর্য্যময় করিয়া তু
গিরি, মরু যখন দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান গড়িতে পারিতেছে না, দে
যখন সন্নিকট হইয়া উঠিয়াছে, এইতো তথাগতের মৈত্রীভাবনা
এইতো বুদ্ধের কল্যাণব্রত উদ্‌যাপনের শুভ অবসর। আজই
বিশ্বে মহোৎসব আয়োজনের কাল—আজই ক্ষুৎক্ষাম আর্ত্ত ও পী
লক্ষ লক্ষ মানব কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া গাহিবে—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি।

হে মহাপুরুষ, এই পরম শুভদিনে বিশ্বমানব আমরা তোমার শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি, তুমি আমাদের অপূর্ণ জীবনকে পূর্ণ ও পুণ্য কর।

বৈশাখী পূর্ণিমায় তোমার পুনরাবির্ভাব যাচ্ঞা করি। মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আজ একান্ত বিপন্ন। আজ ক্রোধ ও লোভের উদ্যত খড়্গ পৃথিবীতে বিভীষিকা প্রচার করিতেছে। আজ মৈত্রী, মুদিতা, করুণা বিসর্জ্জিত। এই ঘন তমসার দিনে তোমার দশ পারমিতা লইয়া তুমি অভিশপ্ত মানবজাতিকে উদ্ধার কর। তুমি মৈত্রীবলে যে অমৃতত্ব জয় করিয়াছিলে, করুণাবলে যে অমৃতরস পান করিয়াছিলে, মুদিতাবলে জয়লাভ করিয়া যে সুধাকলস আহরণ করিয়াছিলে, তুমি যে প্রদীপ্ত জ্ঞানরূপ কঠিন বজ্রে অবিদ্যাকে ছিন্ন করিয়াছিলে, তাহা লইয়া আমাদের মধ্যে পুনরায় অভ্যুত্থান্ কর।

ফিরে এস ফিরে এস, হে মহামানব !
আন তব বীরবাণী, শিক্ষা অভিনব।
মৈত্রীর পতাকা হাতে জ্ঞান-শিখা চোখে
ফিরে এস দুঃখদগ্ধ হীন মর্ত্ত্যলোকে।
দূর কর জিঘাংসার এ রণ-তাণ্ডব,
আন প্রীতি, আন প্রেম, হে মহামানব—
হিংসার অনল জ্বলে, জ্বলে তৃষ্ণাজ্বালা,
লোলুপ বাসনা আনে দুঃখ ক্লেশমালা।
আজ এস অমিতাভ, হে গুরু মহান্
অনির্ব্বাণ চিতাগ্নির করহ নির্ব্বাণ,
ধৌত কর ভস্মরাশি অমৃত ধারায়,
ফিরুক আনন্দোৎসব এ জীর্ণ কারায়।

ভারতের সৌরধর্ম্ম

নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানীরা বলেন, ধর্ম্মের জন্ম ভয় থেকে। মানব-সভ্যতার শৈশবে আদিম মানুষের মনের গঠনও ছিল শিশুর মতন। জড় প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিগুলির প্রচণ্ডতা, মানুষের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাদের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্য—এবং সর্ব্বোপরি সেগুলির অন্তর্নিহিত রহস্য—যা ছিল তদানীন্তন মানুষের জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য,—আদিম নরগোষ্ঠীর মনে জাগাত ভয়, বিস্ময় ও আতঙ্ক। এই-সকল প্রাকৃতিক ঘটনা ও শক্তিগুলি আয়ত্তে না থাকায়, মানুষকে জীবনযাত্রায় পদে পদে এদের বশ্যতা স্বীকার করতে, এদের বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হ'ত। তাই অসীম শক্তিধর প্রকৃতির মুখোমুখী দাঁড়িয়ে মানুষের নিজেকে মনে হত একান্ত অসহায় ও দুর্ব্বল—প্রকৃতির আক্রমণকে সে গণ্য করত জীবনযাত্রার প্রচণ্ডতম বাধা ও বিপদ বলে। এই মহৎ ভয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সৃষ্টি। অধ্যাপক ম্যারেটের ভাষায়—Psychologically regarded······the function of religion is to restore men's confidence when it is shaken by crisis. Men do not seek crisis; they would always run away from it if they could. Crisis seeks them······Religion is the facing of the unknown."

প্রাকৃতিক শক্তিগুলির প্রতি ভয় ও বিস্ময়পূর্ণ মনোভাব থেকে ধর্ম্মের জন্ম বলেই, প্রকৃতি-পূজা কোনও না কোনও আকারে জগতের আদিম ধর্ম্মগুলির মধ্যে অনেকখানি স্থান অধিকার করে

আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর ধরণটা এক। অগ্নি, জল, বায়ু, মেঘ, বজ্র প্রভৃতি বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র প্রকাশমান। সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়মের এই মূর্ত্ত রূপগুলিতে দেবত্ব আরোপ প্রাচীন প্রকৃতি-উপাসনার বিশেষত্ব। আকাশচারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীও মানুষের এই সর্ব্বগ্রাসী ভক্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় নি। তাদের আলো, উত্তাপ ও জ্যোতির্ম্ময় রূপ জীবনযাত্রার নিত্যসহচর এবং কল্পনার সহজ সঞ্চরণক্ষেত্র। গ্রহনক্ষত্রাদির মধ্যে আকৃতি, জ্যোতি ও উত্তাপ-হেতু সূর্য্যই মানুষের কল্পনাকে সর্ব্বাধিক নাড়া দিয়েছিল। তাই প্রাচীন নভোবিহারী দেবমণ্ডলীর মধ্যে সূর্য্যের স্থান সর্ব্বোচ্চ।

পৃথিবীর আদিম ধর্ম্মগুলির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে—সূর্য্যপূজা সর্ব্বাধিক ব্যাপক প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসগুলির অন্যতম। ফ্রেজার, টাইলার, ক্রলি, ল্যাং মুর প্রভৃতি নৃতত্ত্ববিদ্ ও মানব-সংস্কৃতির ঐতিহাসিকগণ এই বিষয়ে অনেক আলোচনা করেছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে সে-সকল প্রসঙ্গ অবান্তর। এই প্রবন্ধে আমরা কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রচলিত সূর্য্যপূজা ও সৌরধর্ম্ম-সম্পর্কে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলব। অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর তাঁর Vaishnavism, Saivism and Minor Religious Systems নামক বিখ্যাত গ্রন্থে দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, ভারতবর্ষে প্রচলিত সূর্য্যপূজা ও সৌরধর্ম্মকে দুটি বিশিষ্ট শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমটি হল, বৈদিক যুগ থেকে প্রচলিত আর্য্য ভাষাভাষিগণ-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত সূর্য্যপূজার ঐতিহ্য। পরবর্ত্তী কালে এরই সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছিল ইরাণ থেকে আগত বিদেশী ম্যাজাই পুরোহিত-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আনীত সূর্য্য উপাসনার নূতন রূপ ও পদ্ধতি। অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের মতে ভারতের সৌরধর্ম্মে

শেষ পর্য্যন্ত এই দুটি ধারার সম্মিলন ঘটেছিল, যদিও মূলতঃ এই পূজাপদ্ধতিদ্বয় ছিল পরস্পরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তাঁর ভাষায় ইরাণ থেকে আগত সূর্য্যের নূতন উপাসনাপ্রণালী "was accepted by the mass of the Hindus as a general worship of the sun and the feelings which it evoked could not have been different from those which the indigenous worship gave rise to." দুটি সম্পূর্ণ পৃথক মতবাদ কি করে লোকমানসে এইভাবে এক হ'য়ে গেল, ভাণ্ডারকর তার বিশেষ কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেন নি। তা ছাড়াও ভারতে প্রচলিত সৌরধর্ম্ম সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত স্তর-বিভাগের একটি গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে। এদেশের আর্য্যপূর্ব্ব যুগ ও বেদপূর্ব্ব সভ্যতাকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। অথচ ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আর্য্যপূর্ব্ব যুগের দান অসীম। ভারতের বেদপূর্ব্ব অনার্য্য কৃষ্টিতে সূর্য্যপূজা ও সৌরধর্ম্মের যথেষ্ট বিকাশ লক্ষ্য করা যায়—যদিও পরবর্ত্তী কালের সৌরধর্ম্মের সঙ্গে তার যোগসূত্র আজও সঠিকভাবে নিরূপিত হয় নি। সুতরাং অনার্য্য সূর্য্যোপাসনাকে ভারতীয় সৌরধর্ম্মের আদিম স্তর হিসাবে গণ্য করাই উচিত। তা যদি করা যায়, তবে ভাণ্ডারকর-কৃত স্তর-বিভাগকে খানিকটা সংশোধন করে নেওয়া প্রয়োজন হ'য়ে পড়ে। ভারতবর্ষের সৌরধর্ম্মকে বিশ্লেষণ করলে প্রকৃতপক্ষে তিনটি পৃথক ধারা বা স্তর চোখে পড়ছে, যথা :—

(১) আর্য্যপূর্ব্ব আদিম স্তর।

(২) বৈদিক স্তর।

(৩) বিদেশাগত ইরাণীয় বা পারসীক স্তর।

আমরা যথাক্রমে এই তিনটি ধারার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

দুঃখের বিষয়ে ভারতের আর্য্যপূর্ব্ব যুগের প্রচলিত সৌরধর্ম্মের

কোনও ধারাবাহিক সুসম্বদ্ধ ও বিস্তারিত বিবরণ আজ আর পাবার উপায় নেই। কেননা এই যুগের প্রায় কোনও লিখিত ঐতিহাসিক দলিল দস্তাবেজ আজও পাওয়া যায় নি, আর যাও বা কিছু কিছু পাওয়া গিয়েছে তার সন্তোষজনক পাঠোদ্ধার হয় নি। তাই এই সময়কার ধর্ম্ম ও সমাজের প্রকৃত চিত্রটি যে কি—সে সম্পর্কে পণ্ডিতেরা আজও নিঃসংশয়, হ'তে পারেন নি। প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology) এবং নৃতত্ত্ব (Anthropology),—এই দুইএর সাক্ষ্যের উপরই এই যুগ সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিকে প্রধানতঃ নির্ভর করতে হ'বে। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার আজ পর্য্যন্ত আর্য্যপূর্ব্ব যুগের সৌরধর্ম্ম সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট খবর আমাদের দিয়েছে বলে জানা নেই। সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত মোহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্পাতে যে বিরাট সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে—তা আর্য্যপূর্ব্ব যুগের বলে অধিকাংশ পণ্ডিতের মত। এই সব স্থানে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হয়েছে—বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত তা কেউ সন্তোষজনক ভাবে পড়তে পারেন নি। সুতরাং এ সভ্যতার যারা স্রষ্টা তাদের ধর্ম্মমত ও ধর্ম্ম বিশ্বাস আজও আমাদের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। আবিষ্কৃত উপকরণের সাহায্যে পণ্ডিতেরা অনুমান করেছেন যে ভারতে পরবর্ত্তীকালে শৈব ও শাক্ত ধর্ম্ম, লিঙ্গপূজা এবং যোগ-দর্শন—মূলতঃ এই আর্য্যপূর্ব্ব সভ্যতারই দান; এসবের আদি রূপ এই যুগেই বিকাশলাভ করেছিল। সূর্য্যোপাসনা সম্পর্কে তেমন কোনও প্রমাণ আজও পাওয়া যায় নি। তবে এ বিষয়ে একেবারে জোর করে বলবার সময় এখনও আসে নি। কেননা এখানকার আবিষ্কৃত লিপিগুলি এখন পর্য্যন্ত অপঠিত। সেগুলির পাঠোদ্ধার হ'বার পরে যখন এই যুগের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির পূর্ণতর পরিচয় আমরা লাভ করব তখন হয়তো নিশ্চিত

ভাবে বলা চলবে—এই সভ্যতার স্রষ্টারা সূর্য্যোপাসনাকে তাদের ধর্ম্মে স্থান দিয়েছিলেন কিনা। ভারতে আর্য্যপূর্ব্ব যুগে যে সকল নৃগোষ্ঠী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করেছিল তাদের বর্ত্তমান শাখা-প্রশাখাগুলির (race groups) প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস ও ধর্ম্মমত আলোচনা করলে এই বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া সম্ভব। অবশ্য এ ক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন এই হ'তে পারে যে, বিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত আচার বিচার ও ধর্ম্মানুষ্ঠান লক্ষ্য করলে, তিন চার হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার সমাজ ও ধর্ম্মমত সম্পর্কে অনুমান করা কতদূর সম্ভব। কোনও প্রগতিশীল গোষ্ঠী সম্পর্কে এই আপত্তি নিশ্চয় খাটে। কিন্তু ভারত-বর্ষের আদিম আর্য্যপূর্ব্ব অধিবাসিবৃন্দের বর্ত্তমান শাখা প্রশাখাগুলির (যাদের ভেরিয়ার এলুইন বলেছেন, "aboriginals" এবং বর্ত্তমান রাজনীতির ভাষায় যাদের নাম 'আদিবাসী') উপর ঐতিহাসিক প্রগতি বিশেষ কোনও রেখাপাত করতে পারে নি এবং এরা এদের আদিম গোষ্ঠী-জীবনের প্রধান ধারাগুলিকে আজ পর্য্যন্ত প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে। এদের জীবনযাত্রায় অকৃত্রিম আদিমতা আজও বিরাজমান। তাই এদের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত আলোচনায় মোটামুটি আমরা লাভবান্ হ'তে পারি। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র এবং বিশেষ করে পূর্ব্ব ও উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠানের একটি বিশেষ অঙ্গ হিসাবে সূর্য্যপূজার ব্যাপক প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়।[১] উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের পার্ব্বত্য অঞ্চলের

১। এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters (Vol. xi Pp 87—94)-এ প্রকাশিত শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দাসের Sun-worship amongst the aboriginal tribes of Eastern India নামক সুলিখিত প্রবন্ধ পঠিতব্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধের এই অংশটি উক্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনার উপর ভিত্তি করেই লেখা।

আদিম অধিবাসিবৃন্দ সর্ব্বোচ্চ দেবতা জ্ঞানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সূর্য্যকে পূজা করে থাকে। উড়িষ্যার ভুঁইয়া ও জুয়াংদের ভিতর সূর্য্যদেব সৃষ্টিকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা হিসাবে পূজিত হ'ন। তাদের ভাষায় সূর্য্যদেবের নাম "বোরম্"। কোনও কোনও অঞ্চলের খাড়িয়া আদিবাসীদের মধ্যেও এই প্রথার প্রচলন আছে। লোহরডাগা ও কেঁওঝড়ের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের আদিম গোষ্ঠী "হো"দের মধ্যে "সিং বোংগা" বা "ওটে বোরম্" নামে সূর্য্যকে পূজা করবার রেওয়াজ বর্ত্তমান। এই দেবতা তাদের গোষ্ঠীর পূজনীয়দের মধ্যে প্রধানতম এবং তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিশ্বের সমস্ত প্রাণশক্তির উৎস। ছোটনাগপুরের "মুণ্ডা"দের মধ্যেও এই "সিং বোংগা" গোষ্ঠীর প্রধানতম উপাস্য দেবতা বলে বিবেচিত হয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছত্রিশগড়ের "সাঁওতাল"গোষ্ঠীর অনুসৃত ধর্ম্মমতে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে এই "সিং বোংগা" সর্ব্বপ্রধান দেবতা। এক্ষেত্রে তাঁর অপর একটি নাম "চন্দো"। "খারোওয়ার সাঁওতাল"দের মধ্যে তাঁর আর একটি প্রচলিত নাম "রাম-চন্দো"। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ছত্রিশগড় প্রভৃতি অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক ওরাওঁ আদিবাসীদের মধ্যেও দেখা যায়—সূর্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশক্তিমান দেবতা। এই গোষ্ঠীর ধর্ম্মে—সূর্য্যদেবের নাম "ধর্ম্মেশ"। রাজমহল পার্ব্বত্য অঞ্চলের "মালে" এবং রামগড় পার্ব্বত্য অঞ্চলের "মাল-পাহাড়িয়া" আদিবাসিগণও সূর্য্যোপাসক। এদের মধ্যে প্রথম গোষ্ঠীর ধর্ম্মমতে সূর্য্যদেবের নাম "ধর্ম্মের গোসাই" এবং দ্বিতীয় গোষ্ঠীর ধর্ম্মমতে শুধু "গোসাই"। মধ্যভারত, উড়িষ্যা, বিহার, বাংলার কতক অঞ্চল, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে সুবিস্তীর্ণ "গন্দ" গোষ্ঠীর মধ্যেও সূর্য্যপূজার যথেষ্ট প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এদের দেবমণ্ডলীতেও সূর্য্যের স্থান সর্ব্বোচ্চ এবং এখানে সূর্য্যদেবকে

যে নূতন নাম গ্রহণ করতে হয়েছে, তা হ'ল "বুরা দেও" বা "বড় দেও" বা "বড়িয়াল পেন"। মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, ছত্রিশগড় প্রভৃতি অঞ্চলের "কন্দ"গণও ব্যাপকভাবে সূর্য্যের উপাসক। তাদের মতেও সূর্য্য বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বোচ্চ দেবতা—স্রষ্টা, স্বয়ম্ভূ এবং সর্ব্বমঙ্গলের উৎপত্তিস্থল। তারা সূর্য্যের নামকরণ করেছে "বুরা পেন্ন্" বা "বেল্লা পেন্ন্"। বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলের (অবশ্য উড়িষ্যাতে এদের সংখ্যা নগণ্য) "বিরহোর", বিহার ও ছত্রিশগড়ের "অসুর" এবং মধ্যভারত ও যুক্তপ্রদেশের "কোরোয়া" প্রভৃতি আরও কতকগুলি উপজাতি, ধর্ম্মমতে মূলতঃ সৌর ভারতের পূর্ব্বসীমান্তে আসাম অঞ্চলের আদিবাসিগণের মধ্যেও সূর্য্য-পূজার প্রচলন লক্ষ্যণীয়। আসামী নাগা-সম্প্রদায়, গারো পর্ব্বত অঞ্চলের "গারো"গণ, মণিপুরবাসী "মেইথি"গণ, "মিকির", "মাও" এবং "কুইরেংগ্ নাগা"গণের মধ্যেও সূর্য্যদেব পূজা পেয়ে থাকেন। কিন্তু এই সকল গোষ্ঠীর পরিকল্পিত ধর্ম্মমত ও দেবমণ্ডলীতে তাঁর স্থান পূর্ব্ববর্ণিত গোষ্ঠীধর্ম্মগুলিতে লব্ধ স্থান অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন। এক্ষেত্রে সূর্য্যকে শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বশক্তিমান রূপে কল্পনা করা হয়নি; বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর চরিত্রে কোপনতা ও তস্করবৃত্তি প্রভৃতি দোষও আরোপিত হ'তে দেখা যায়। দৃষ্টান্ত আর বাড়ানোর স্থান নেই। যে নিদর্শনগুলি এ পর্য্যন্ত দেওয়া হ'ল, আমাদের বক্তব্য বুঝবার পক্ষে সেগুলিই যথেষ্ট। দেখা যাচ্ছে—এ যাবৎ বর্ণিত আদিম গোষ্ঠিগুলি সূর্য্যকে মোটামুটি দুটি নামে অভিহিত করেছে—"সিং বোংগা" ও "বোরম্"। প্রথম নামটির কোনও রূপভেদ নেই, কিন্তু দ্বিতীয়টির অনেকগুলি বিভিন্ন রূপ দেখা যায়—যদিও সে'সবের মূল এক, যথা—বেরো, বেদো, বিরু, বেল্লা, বড়িয়াল, ইত্যাদি। আদিম আর্য্যপূর্ব্ব যুগের গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে প্রচলিত সৌরধর্ম্মের প্রথম ও প্রধান বিশেষত্ব হ'ল—

ঐতে সূর্য্যের কোনও মূর্ত্তি বা প্রতীকের ব্যবহার নেই। সাধারণতঃ জঙ্গল কেটে খানিকটা জমি সাফ করবার পরে সেখানে একটি বেদী নির্ম্মাণ করা হয়। বেদী-নির্ম্মাণের পদ্ধতি গোষ্ঠীভেদে বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। উড়িষ্যার ভুঁইয়ারা—"দেওতা সারা" নামক পবিত্র বৃক্ষের কাণ্ডকেই বেদীরূপে ব্যবহার করে। সাঁওতালেরা সাধারণতঃ ফাঁকা জায়গায় পূজানুষ্ঠান করে থাকে, যাতে সূর্য্যকিরণ এসে অর্ঘ্যের উপর পড়তে পারে। "খাড়িয়া" এবং "কোরোয়া"গণ—উন্মুক্ত প্রান্তরে একটি উইএর ঢিবিকে বেদী হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। "মাল পাহাড়িয়া"-গণ গৃহপ্রাঙ্গণের কতকটা মার্জ্জিত ও পরিস্কৃত অংশে পিত্তলের জলপূর্ণ পাত্রের উপর আম্রপল্লব স্থাপন করে সূর্য্যার্চ্চনা করে থাকে। রাজমহল পর্ব্বতের প্রান্তবাসিগণের সূর্য্যপূজায় পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক মত্তাবস্থায় আনীত বৃক্ষসমূহের অর্চ্চনা করা হয়। সম্ভবতঃ বৃক্ষগুলিকেই সূর্য্যের বাহন বা প্রতীক কল্পনা করার রীতি এই গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান। "মালে"গণের মধ্যে গ্রামের প্রতি গৃহের সম্মুখে সূর্য্যের প্রতীক হিসাবে একটি দণ্ড প্রোথিত করা হয় এবং সূর্য্যপূজায় সেই দণ্ডগুলিরই অর্চ্চনা করা হয়ে থাকে। সিংভূম অঞ্চলের "গন্দ"দের মধ্যে পুরুষগণ কর্ত্তৃক বনের মধ্যে বৃক্ষমূলে সূর্য্যদেবের বেদী নির্ম্মাণ করবার রেওয়াজ আছে। পরে সেই বেদীর উপরে সূর্য্যের প্রতীক স্থাপন করে তার অর্চ্চনা করা হয়ে থাকে। থারওয়ার সাঁওতাল সমাজের মেয়েরা প্রতি দিবস প্রত্যুষে গৃহপ্রাঙ্গণে গোময়ের দ্বারা এক-একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত রচনা করে রাখে—ঐগুলিকে সূর্য্যের প্রতীক মনে করা হয়। অপর কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হয়ে গোপনে এই প্রতীক রচনা করার নিয়ম আছে। সন্ধ্যায় ঐ প্রতীকের নিকট

দীপ জ্বেলে—সেই প্রদীপ হাতে একে একে চারটি দিকে মুখ ফিরিয়ে সূর্য্যার্চ্চনা করবার প্রথা এই গোষ্ঠীর নারীদের ভিতর বর্ত্তমান। সূর্য্যদেবের নিকট পশুবলি-দান—উপরে বর্ণিত আদিম উপজাতিগুলির ধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। লক্ষ্য করবার বিষয়, গরু মহিষ মুর্গী ছাগল প্রভৃতি বলি দেওয়ার রেওয়াজ সাধারণভাবে থাকলেও এই ব্যাপারে এদের বিশেষ ঝোঁক হ'ল শ্বেতবর্ণের পশু বা পক্ষীর উপর। সাদা মোরগ বা পায়রা বলি হিসাবে—ভূঁইয়া, হো; মুণ্ডা, মাড-নাগা, মিকির প্রভৃতিদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। আদিম অধিবাসিগণের পালিত সৌরধর্ম্মের মোটামুটি তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে ব্যতীত অন্য সর্ব্বত্র সূর্য্যকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর সর্ব্বোচ্চ দেবতা মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ'লেও ইনি সর্ব্বত্র সর্ব্বশক্তিমান্ নন। অন্যান্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও অল্প-শক্তিমান অনিষ্টকারী দেবতা বা উপদেবতার চক্রান্ত নষ্ট করবার ক্ষমতা সূর্য্যদেবের নেই। দ্বিতীয়তঃ দেখা যায়, প্রায় সর্ব্বত্র সূর্য্যপূজার নিমিত্ত একটি পরিচ্ছন্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের প্রয়োজন হয়। পূজানুষ্ঠান এইখানেই হ'য়ে থাকে। তৃতীয়তঃ সূর্য্যের পূজায় বলি হিসাবে ব্যাপকভাবে শ্বেত পশুর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় সৌরধর্ম্মের আদিম স্তরের যে আংশিক পরিচয় দেওয়া হ'ল, তা সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ। সূর্য্যপূজার পরবর্ত্তী স্তরগুলির সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা বা তাদের উপর এর পরোক্ষ বা অপরোক্ষ কোনও প্রভাব পড়েছে কিনা, তা আমরা আজও সঠিক জানি না। বিষয়টি পূর্ণতর ও সূক্ষ্মতর গবেষণার অপেক্ষা রাখে। তবে ভারতে নানাস্থানে প্রচলিত লৌকিক ধর্ম্মের নানা স্তরে সূর্য্যপূজার

যে সকল রূপ আমরা লক্ষ্য করি—সে সবের মধ্যে আর্য্যপূর্ব্ব সৌরধর্ম্মের কিছু কিছু মিশেল থাকা আশ্চর্য্য নয়। বাঙ্গলা দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত "সূর্য্যব্রত", "তপাব্রত", "ইতুপূজা" প্রভৃতি লৌকিক ব্রত ও পূজানুষ্ঠানের উপর আদিম সৌরধর্ম্মের প্রভাব থাকা যে সম্ভব, শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দাস তা লক্ষ্য করেছেন। সূর্য্যপূজায় সূর্য্যকে অর্পিত নৈবেদ্য সুমার্জ্জিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রাখবার আদিম পদ্ধতির সঙ্গে বাঙ্গলার উক্ত অনুষ্ঠানগুলি উপলক্ষ্যে জনসাধারণের সূর্য্যকে অর্ঘ্যদান প্রণালীর সাদৃশ্য আছে।

স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী গ্রামে প্রাপ্ত সূর্য্যদেব-সম্পর্কীয় একটি লৌকিক ছড়া প্রকাশ করেছেন (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪-৬৭)। এই গান বা ছড়াটি যে জাতীয় মনোভাবের প্রকাশক, সেই মনোভাবের মূলে আদিম সৌরধর্ম্মের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। বাঙ্গলা সাহিত্যে যে কয়েক শ্রেণীরমঙ্গল-কাব্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যে গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল প্রভৃতির সঙ্গে সূর্য্যমঙ্গল কাব্যও রচিত হ'তে দেখা দেখা যায় (আশুতোষ ভট্টাচার্য্য—বাঙ্গলা মঙ্গল-কাব্যের ইতিহাস, পৃঃ ২৮-২৯)। মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে আর্য্য ও অনার্য্য প্রভাব পরস্পর কতখানি মিশে রয়েছে, সে বিচার বর্ত্তমান ক্ষুদ্র-পরিসর প্রবন্ধে করা সম্ভব নয়। তবে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হ'বে না যে, সূর্য্যমঙ্গল কাব্যগুলির উপর অনার্য্য সৌরধর্ম্মের প্রভাব কিছু পরিমাণে কার্য্যকরী হ'য়েছিল। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে, বাঙলার গ্রামীণ সংস্কৃতির বিশিষ্ট দেবতা ধর্ম্মঠাকুর যে সূর্য্যদেব, কোনও কোনও পণ্ডিত এই ধরণের অনুমান করেছেন (দ্রষ্টব্য—"রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গল—সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত সংস্করণ, ভূমিকা ; সুকুমার সেন—বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড)।

এই সকল অনুমানের সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য বাঙলা দেশ ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লৌকিক ধর্ম্ম ও ব্রতাদির আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে গভীরতর গবেষণার প্রয়োজন আছে। আদিম সৌরধর্ম্মের প্রসঙ্গ শেষ করবার পুর্ব্বে বলে রাখা ভাল যে, ভারতের আর্য্যপূর্ব্ব যুগের অধিবাসি-বৃন্দের যে কটি নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞানসম্মত-স্তর আজ পর্য্যন্ত পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন, তাদের মধ্যে প্রধানতঃ নেগ্রিটো, প্রটো-অষ্ট্রলয়েড এবং মঙ্গোল এই কটি জাতির মধ্যেই সূর্য্য পূজার প্রচলন সর্ব্বাধিক। এতক্ষণ যে-সকল উপজাতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির অধিকাংশই এই তিনটি স্তরের অন্তর্ভুক্ত—যেমন আঙ্গামী নাগা (নেগ্রিটো), ওঁরাও, মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল (প্রটো-অষ্ট্রলয়েড), গারো, মেইথি, মিকির, মাও কুইরেংগ-নাগা (মঙ্গোল), ইত্যাদি।

ভারতে সৌরধর্ম্মের দ্বিতীয় পর্ব্ব হিসাবে বৈদিক আর্য্য-সভ্যতার যুগে সূর্য্যোপাসনার উৎপত্তি, পরিণতি ও বিকাশ আমাদের আলোচ্য। জগতের নানা দেশে বিস্তারিত আর্য্য-ভাষাভাষী গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার মধ্যে সূর্য্য পূজা এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, অনেক পণ্ডিত একথা পর্য্যন্ত বলেন যে, সূর্য্য মূলতঃ আর্য্য ধর্ম্মেরই দেবতা। Schmidt-এর মতে "There is no doubt that the sun in myth and cult alike, is primitive Aryan." (The Origin and Growth of Religion p. 47)। এই মত অবশ্য অত্যন্ত একপেশে, সন্দেহ নেই। তবে একথা জোর করেই বলা চলে যে, সূর্য্য পূজার ধারাবাহিক ইতিহাস আমরা আজ পর্য্যন্ত যেটুকু জান্‌তে পেরেছি তার মধ্যে আর্য্য-ভাষাভাষিগণের দানই সর্ব্বাধিক। পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রাচীন আর্য্যধর্ম্মে সূর্য্যদেবের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় ভাষায় সংস্কৃত ইত্যাদিতে "সূর্য্য," গ্রীকে "হেলিয়স্" লাটিনে "সল্", প্রাচীন পারসীকে "হ্বরে

ক্‌হ্রেত" স্লাভনিকে, "সন্‌সে" (solnce) প্রভৃতি নানা নামে আকাশচারী এই দেবতাটি আর্য্যগণের ইউরোপ-এসিয়া-স্থিত নানা শাখার পূজা পেয়ে এসেছেন (প্রাচীন ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্য জাতির বিভিন্ন শাখার মধ্যে প্রচলিত সৌরধর্ম্ম ও সূর্য্যদেবতার সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবরণীর জন্ম দ্রষ্টব্য Schroeder—Arische Religion Vol. II, pp. ৪ ff)। সুতরাং বৈদিক আর্য্যভারতের সূর্য্যপূজা সম্পর্কিত আলোচনার বেলায় আমাদের এই বৃহত্তর আর্য্য সৌরধর্ম্মের পটভূমিকা বিস্মৃত হ'লে চলবে না। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে কোন সময়ে এসে উপনীত হন, এই প্রশ্নের নানা জনে নানা উত্তর দিয়েছেন। মোটামুটি, অধিকাংশ পণ্ডিতের মত এই যে, আর্য্য অভিযান ভারতবর্ষে ঘটেছিল খৃষ্টজন্মের ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে। ভারতে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে আগমন-পথে তাঁরা তাঁদের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতির যে চিহ্ন রেখে এসেছিলেন তাতে তাঁদের মধ্যে সৌরধর্ম্মের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। পশ্চিম এসিয়ায় বোঘাজ কুই নামক স্থানে প্রাপ্ত খোদিত লিপিতে ইন্দ্র বরুণ মিত্র, নাসত্য প্রভৃতি বেদোক্ত ভারতীয় আর্য্যগণপূজিত দেবতার নাম পাওয়া গিয়াছে। এঁদের মধ্যে "মিত্র" সৌরদেবতা। ১৮০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ থেকে ১২০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত বেবিলনের কাস্‌সাইটগণের মধ্যে অর্চ্চিত দেবমণ্ডলীতে, Shuriash (বৈদিক "সূর্য্যঃ") Moruttash, (বৈদিক "মরুতঃ"), Indara (বৈদিক "ইন্দ্রঃ") প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতে আসবার পথে এসিয়া মাইনর, মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে বেদপূর্ব্ব যুগের আর্য্যগণ তাদের সংস্কৃতির প্রভাব ভালভাবেই বিস্তার করতে পেরেছিল। সূর্য্যকে দেবতারূপে অর্চ্চনা করবার প্রথা তখন থেকেই তাদের মধ্যে প্রচলিত। ভারতে রচিত বৈদিক-সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদে, আগন্তুক

আর্য্যগণের যে সকল সূর্য্যস্তুতি স্থান পেয়েছে তার কিছু উপরে কথিং বেদপূর্ব্ব যুগে, এশিয়া মাইনর, মেসোপটেমিয়া বা ইরাণে রচিত হওয় অসম্ভব নয়। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে ভারতীয় আর্য্যগণের ধর্ম্মবিশ্বাং ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের যে চিত্র পাওয়া যায় তার থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মা হয় যে, আর্য্যগণ মূলতঃ প্রকৃতি-পূজক ছিলেন—বিশ্বপ্রকৃতির বিভিং শক্তিসমূহের বিচিত্র প্রকাশগুলির উপর দেবত্ব আরোপ করে সেগুলিং অর্চ্চনা করা ছিল তাঁদের বিশেষত্ব। সুতরাং তাঁদের কল্পিং দেবলোকে গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে, মানুষের দৃষ্টিতে আকৃতি ও জ্যোতিতে শ্রেষ্ঠ, সূর্য্যের স্থান যথেষ্ট উচ্চ ছিল। বৈদিক সাহিত্যেং রচয়িতৃবৃন্দের কল্পনাকে সূর্য্য এত বিভিন্নভাবে আলোড়িত ও বিমোহিত করেছিল যে, সূর্য্যকে তাঁরা নানা বিচিত্র নামে ও ভাবে বর্ণনা ও স্তুতি করে গিয়েছেন। বেদোক্ত সৌরদেবমণ্ডলীর মধ্যে—সূর্য্য, সবিতৃ পূষণ্, বিষ্ণু, মিত্র, বিবস্বত আদিত্যগণ এবং উষস্—প্রধান অনেকের মতে অশ্বিনদ্বয়ের কল্পনার মূলেও সূর্য্যপূজার প্রেরণা ছিল কিন্তু এমত তর্কাতীত-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সৌরদেবতাগণেং ভিতর বৈদিক সাহিত্যে "সূর্য্য" সর্ব্বাধিক স্পষ্ট-কল্পিত। সাধারণভাবে সূর্য্য বলতে আমাদের চিরপরিচিত জ্যোতিষ্কটিকে বোঝালেও, বেদে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে, সূর্য্যের গোলক বা মণ্ডল সম্পর্কেও "সূর্য্য" শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের ভাষায় "Since his name designates the orb of the sun as well, Surya is the most concrete of the solar deities, his connection with the luminary, never being lost sight of." (Vedic Mythology, p. 30) অধ্যাপক ম্যাক্‌ডোনেলের কথার প্রতিধ্বনি করে অধ্যাপক কীথও বলেছেন, বৈদিক সৌরদেবমণ্ডলীর মধ্যে

"Sūrya represents the concrete aspect of the sun" (The Religion and Philosophy of the Vedas and the Upanishads, Book I, Pt. II, p. 105). বৈদিক সাহিত্যে সূর্য্যের যে বর্ণনা দৃষ্ট হয়, তার মধ্যে উক্ত দেবতার কয়েকটি বিশিষ্ট স্বরূপ ফুটে উঠেছে। প্রথমতঃ সূর্য্য হ'চ্ছেন সর্ব্বদ্রষ্টা, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীর সমস্ত পাপপুণ্য তিনি অবলোকন করেন (ঋগ্বেদ ১।৫০।৭ ; ১০।৩৭।১ ; ১।৫০।২ ; ৪।১৩।৩ ইত্যাদি।) সূর্য্যের এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ও দ্রষ্টাস্বরূপের উপর এত বেশী জোর দেওয়া হয়েছে যে, অথর্ব্ব বেদে (৫।২৪।৯) তাঁকে "চক্ষুসমূহের অধিপতি" অর্থাৎ সমগ্র দৃষ্টি ও সন্ধানীশক্তির উৎস বলে অভিহিত করতেও রচয়িতার আটকায়নি। তিনি অন্ধকার দূর করে সমস্ত জগৎকে তাঁর তীব্র দ্যুতি দ্বারা উদ্ভাসিত করেন (ঋগ্বেদ ১০।৩৭।৪ ; ৭।৬৩।১)। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, যে সূর্য্যের জ্যোতির্ম্ময় রূপ অন্ধকার বিনাশ করে বিশ্বভুবন আলোকিত করবার ক্ষমতা-দর্শনে বেদ রচয়িতৃবৃন্দের মনে পরম দ্রষ্টা রূপে তাঁকে কল্পনা করবার প্রেরণা এসেছিল। দ্বিতীয়তঃ, সূর্য্য হ'লেন আয়ুবৃদ্ধিকারী, রোগ, ব্যাধি ও দুঃস্বপ্নের হন্তা। ঋগ্বেদে বলা হ'য়েছে (১০।৩৭।৪), "হে সূর্য্যদেব ! যে জ্যোতির দ্বারা তুমি অন্ধকার নষ্ট কর, এবং যে কিরণের দ্বারা সমস্ত বিশ্বজগৎ প্রকাশ কর, তাহার দ্বারা আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার দরিদ্রতা নষ্ট কর, আমাদিগের পাপ, রোগ ও দুঃস্বপ্ন দূর কর।" (শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কৃত অনুবাদ)। ঐ বেদে আরও দেখা যায় হৃদরোগ ও হরিমাণ রোগ আরোগ্য করবার জন্য সূর্য্যের নিকট প্রার্থনা জানান হ'চ্ছে (১।৫০।৯-১৩)। সূর্য্যের আরোগ্যকারী বা রোগহর স্বরূপের উপর ভারতের পরবর্ত্তী-কালের সূর্য্যোপাসকগণ খুব বেশী জোর দিয়েছিলেন। সূর্য্যপূজার তৃতীয় স্তর আলোচনাকালে সে প্রসঙ্গ

পুনরায় উত্থাপিত হবে। তৃতীয়তঃ, সূর্য্যদেবকে সর্ব্বস্রষ্টা বা বিশ্বকর্ম্মা বলে অভিহিত করা হ'য়েছে (ঋগ্বেদ ১০।১৭০।৪) এবং আরও বলা হ'য়েছে যে, তিনি দেবগণের পুরোহিত (ঋগ্বেদ ৮।৯০।১২)। চতুর্থতঃ, সূর্য্যকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থাবর-জঙ্গম সব কিছুর পালক বা আত্মা বলে বর্ণনা করা হ'য়েছে। সম্ভবতঃ "সূর্য্য" সম্পর্কে বৈদিক সাহিত্যে এইটি সর্ব্বাধিক মহীয়সী কল্পনা (দ্রষ্টব্য—ঋগ্বেদ ১।১১৫।১; ৭।৬০।২)। এ ছাড়াও দেখা যায়, সূর্য্য সম্পর্কে প্রচুর খুঁটিনাটি বর্ণনা বৈদিক সাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। তিনি সপ্তাশ্ব-বাহিত রথে গগন-পথে চলেন, বরুণ আদিত্যগণ, মিত্র, আর্য্যমন্ প্রভৃতি দেবগণ তাঁর চলার পথ প্রস্তুত করেন। পূষণ হ'লেন তাঁর দূত, উষস্ তাঁর পত্নী। কথনও তাঁকে আকাশ-বিহারী পক্ষীরূপে কল্পনা করা হয়েছে, কথনও বা তিনি প্রমত্ত বৃষের সঙ্গে তুলিত হয়েছেন, কথনও বা তিনি বর্ণিত হয়েছেন উষস্ কর্ত্তৃক আনীত শুভ্র জ্যোতির্ম্ময় অশ্বরূপে। বৈদিক সাহিত্যে সাধারণভাবে সূর্য্যকে সর্ব্বশক্তিমান-রূপে কল্পনা করা হলেও—দুটি-একটি স্থানে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। কথমও কখনও তাঁকে সাধারণ জড়পদার্থের অধিক আর কিছু মনে করা হয় নি; যেমন বলা হ'য়েছে তিনি আকাশে দোদুল্যমান মুক্তা-বিশেষ (ঋগ্বেদ ৭।৬৩।৪) বা প্রস্তরখণ্ডমাত্র (ঋগ্বেদ ৫।৪৭।৩, শতপথ ব্রাহ্মণ ৬।১।২।৩)। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ইন্দ্রের নিকট সূর্য্যের পরাজয়ের কাহিনী দৃষ্ট হয় (১০।৪৩।৫) এবং চতুর্থ মণ্ডলে ইন্দ্র-কর্ত্তৃক তাঁর চক্র অপহরণের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় (৪।৩০।৪)। বৈদিক সাহিত্যের সূর্য্যের স্তুতি ও বর্ণনা-সংবলিত উপরে উল্লিখিত অংশগুলির মূল, সানুবাদ, উদ্ধৃত করবার স্থান বর্ত্তমান প্রবন্ধে নেই; কৌতূহলী পাঠক অধ্যাপক ম্যাকডোনেল কৃত Vedic Mythology গ্রন্থের ৩০-৩২ পৃষ্ঠায় এই সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ও উল্লেখ পাবেন।

দেবতা হিসাবে বৈদিক সাহিত্যে সূর্য্য যেমন স্পষ্ট—সবিতৃ বা সবিতা ততটা নন। তাঁর স্তুতি ও বর্ণনার মধ্যে স্বর্ণোজ্জ্বল দেহবর্ণের উল্লেখ প্রায়ই দেখা যায় (ঋগ্বেদ ১।৩৫।৮-১০; ৬।৭১।১; ৭।৪৫।২ ইত্যাদি)। তিনি দুঃখহর ও পাপঘ্ন। জগতের প্রসূতি ও অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তিরূপে তিনি উচ্ছ্বসিত ভক্তির অর্ঘ্য পেয়েছেন—বৈদিক ঋষিগণের নিকট হ'তে। এই সবিতার স্তুতি হিসাবেই আমরা বৈদিক সাহিত্যের সুবিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্রটি পেয়েছি—যা আজও হিন্দুর ধর্ম্মজীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। মন্ত্রটি হ'ল (ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০) "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ, তৎ সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গোদেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ," অর্থাৎ "সর্ব্বলোক-প্রকাশক সেই সবিতার বরণীয় শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিসকল প্রেরণ করিতেছেন।" সকল দিক আলোচনা করলে মনে হয় বিশ্বের প্রসবিতা ও সমস্ত প্রাণশক্তি ও গতির উদ্বোধক হিসাবে সূর্য্যের যে বিশিষ্ট স্বরূপ, বৈদিক সাহিত্যে তাকেই সবিতা বলে অর্চ্চনা করা হ'য়েছে। কিন্তু বৈদিক কল্পনাতে সূর্য্যের মূর্ত্তি যেমন সুস্পষ্ট-রূপে কল্পিত, সবিতার ক্ষেত্রে তা' নয়। শেষোক্ত পূজনীয়ের কল্পনার মধ্যে ধোঁয়াটে অস্পষ্টতার অস্তিত্ব রয়েছে। সূর্য্যের সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য। সৌর দেবতাগণের মধ্যে বৈদিক সাহিত্যে সূর্য্য ও সবিতার পরেই পূষণের স্থান। পূষণ হ'লেন সর্ব্বোপরি পথের সাথী ও পশুরক্ষক। পথের নির্দ্দেশ পাবার জন্য, পথে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হ'তে রক্ষা পাবার জন্য তার কাছে প্রার্থনা জানানো হ'য়েছে (ঋগ্বেদ ১০।৫৯।৭; ৬।৫৪।৯)। তিনি পথিকৃৎ ও দুর্গম পথের একমাত্র সঙ্গী, সহায় ও অধীশ্বর (ঋগ্বেদ ৬।৫৩।১)। পথহারাদের তিনি শরণস্থল, পথে হারানো দ্রব্যাদির তিনিই উদ্ধারকর্ত্তা। উপরন্তু তিনি গো-যূথের

রক্ষক (ঋগ্বেদ ৬।৫৪।৫-৬, ৬।৫৮।২, ১০।২৬।৩), সোজা পথে তাদের চালন করেন (ঋগ্বেদ ৬।৫৩।৯)। তিনি স্বয়ং হলকর্ষণে অংশ গ্রহণ করতেও পরাঙ্মুখ নন (ঋগ্বেদ ৪।৫৭।৭)। অশ্ব ও মেষগণও তাঁর যত্ন ও মনোযোগ থেকে বঞ্চিত নয়, পশুমাত্রেই তাঁর নিকট পবিত্র (ঋগ্বেদ ১।৫।১-২)। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ ও সূত্র-সাহিত্যের যুগেও পূষণের উপরে বর্ণিত স্বরূপগুলির প্রাধান্য প্রায় অক্ষুণ্ণ ছিল। উপনিষদের যুগেও পূষণের প্রাধান্য একেবারে লুপ্ত হয় নি—কেন না ঈশোপনিষদে তাঁকে সত্য ও বিশ্বাত্মার আচ্ছাদক ও আধার হিসাবে বর্ণনা করা হ'য়েছে (ঈশোপনিষৎ ১৫-১৬)। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে সূর্য্যের মধ্যস্থিত বিশ্বপ্রাণীর হিতকারী শক্তিই পশুরক্ষক ও কৃষিকার্য্যের অধীশ্বর দেবতার রূপ গ্রহণ করে পূষণ নামে অর্চ্চিত হয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য-ম্যাক্‌ডোনেল Vedic Mythology p-37)। পৌরাণিক দেবলোকে ও ধর্ম্মমতে বিষ্ণু অন্যতম প্রধান দেবতা হ'লেও প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে তাঁর স্থান তেমন উচ্চ নয়। সেখানে তাঁর বিশেষ কোনও স্বতন্ত্র সত্তা নেই—তিনি সূর্য্যের একটি অংশ বা স্বরূপ মাত্র। বৈদিক বিষ্ণুর বর্ণনার মধ্যে যা সর্ব্বাধিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হ'চ্ছে তাঁর গতিশীলতা। তাঁর তিনবার পদক্ষেপের কাহিনী একাধিকবার বৈদিক গাথায় উল্লিখিত হ'য়েছে। সাধারণভাবেও তাঁকে "উরুগায়" বা "উরুক্রম" (অর্থাৎ দ্রুতগামী) বলে অভিহিত করা হ'য়েছে। তিনটি পদক্ষেপের দ্বারা বিষ্ণু ভূলোক ও দ্যুলোক অতিক্রম করেন—এর প্রথম দুটি পদক্ষেপ মানুষের দৃষ্টিগোচর হ'লেও, তৃতীয়টি পর্য্যন্ত চর্ম্মচক্ষু পৌঁছায় না (ঋগ্বেদ ১।১৫৫।৫, ৭।৯৯।২)। আকাশে প্রতিষ্ঠাপিত চক্ষুর ন্যায় বিষ্ণুর সর্ব্বোচ্চ পদটি কেবলমাত্র উদারচেতা তত্ত্বজ্ঞগণই সর্ব্বদা দর্শন করে থাকেন ("তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব

চক্ষুরাততম্‌"—ঋগ্বেদ ১৷২২৷২০)। বিষ্ণুর এই তিনটি পদেই বিশ্ব-চরাচরের সকল প্রাণীর বাস এবং এইগুলি উজ্জ্বল ও মধুতে পরিপূর্ণ। বিষ্ণু স্বয়ং সর্ব্বোচ্চ পদের অধিবাসী (ঋগ্বেদ ৩৷৫৫৷১০)। বিষ্ণুর তিনবার পদক্ষেপ যে সূর্য্যের গতিপথের রূপক এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অনেকের মতে এই তিনটি পদের দ্বারা যথাক্রমে উদীয়মান, মাধ্যন্দিন ও অস্তগামী, সূর্য্যের এই তিন রূপকে বোঝায়; আবার কেউ বা বলেন, সেগুলির দ্বারা স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল, ত্রিভুবনের মধ্য দিয়ে সূর্য্যের গতিপথকে বোঝায়। দুঃস্থ মানুষের পরিত্রাণের জন্যই বিষ্ণুর এই পরিক্রমণ (ঋগ্বেদ ৬৷৪৯৷১৩)। তিনি উপকারী দাতা ও ত্রিভুবনের পালন-কর্ত্তা (ঋগ্বেদ ১৷১৫৪৷৪)। পরবর্ত্তী কালে সম্প্রদায় বিশেষের ও সাধারণভাবে হিন্দুধর্ম্মের অন্যতম প্রধান আরাধ্য দেবতা হিসাবে বিষ্ণুর যে বিশিষ্ট লক্ষণগুলি দেখা যায়, বৈদিক সাহিত্যে তার কিছু কিছু গোড়াপত্তন সুরু হ'য়েছিল। পৌরাণিক বিষ্ণুর প্রধান অস্ত্র চক্র, সূর্য্যগোলকের প্রতীক। তাঁর বাহন গরুড়ের কল্পনা ঋগ্বেদেই লক্ষ্য করা যায় এবং তাঁর বক্ষোদেশের কৌস্তুভমণির কল্পনাও কারও কারও মতে সূর্য্য থেকেই উৎপত্তি লাভ করেছে (Macdonell—Vedic Mythology p- 39)। ঋগ্বেদে বলা হ'য়েছে প্রাণিগণের স্থানসঙ্কুলানের জন্য ত্রিভুবনকে সম্প্রসারিত করবার উদ্দেশ্যে তিনি পদক্ষেপ করেন (৬৷৬৯৷৫-৬)। এই কল্পনার মধ্যে ভবিষ্যতের বামন অবতারের বীজ লুকিয়ে রয়েছে বলে মনে হয়। ব্রাহ্মণগুলির যুগে দেখা যায়, বিষ্ণুর বামনরূপে অসুরগণকে ছলনা করে ত্রিভুবন জয়ের কাহিনী প্রচলিত হ'য়ে গিয়েছে (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২৷১৷৩৷১; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ১৷৬৷১৷৫)। এর থেকে পৌরাণিক যুগের বামন ও বলিরাজের কাহিনীর দূরত্ব একধাপ মাত্র। ঋগ্বেদে বিষ্ণু কর্তৃক ইন্দ্র দ্বারা অনুরুদ্ধ হ'য়ে বরাহ-রূপী

বৃত্রের শত মহিষ অপসারণের কাহিনী পাওয়া যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে এমুষ নামক বরাহের জল থেকে পৃথিবী উদ্ধারের কাহিনী বর্ণিত হ'য়েছে (১৪।১।২।১১)। তৈত্তিরীয় সংহিতাতে উক্ত বরাহকে প্রজাপতি রূপে কল্পিত হ'তে দেখা যায় (৭।১।৫।১)। এই বরাহের কাহিনী পৌরাণিক বিষ্ণুর বরাহ-অবতার কল্পনার ভিত্তি। পৌরাণিক বিষ্ণুর মৎস্য ও কূর্ম্ম-অবতারের কল্পনার বীজও বৈদিক সাহিত্যে লুকিয়ে আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে বর্ণিত বন্যার কাহিনীতে দেখা যায়, এক অতিকায় মৎস্য মনুকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করে (১।৮।১।১)। প্রজননার্থে প্রজাপতির কূর্ম্মরূপ ধারণ করে জলতলে বিচরণের কাহিনীও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৭।৫।১।৫ ; তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১।২৩।৩)। অনুমান হয় উক্ত কাহিনীদ্বয় মৎস্য ও কূর্ম্মাবতার কল্পনার জনক। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বৈদিক সৌরদেবতা বিষ্ণুর মধ্যে পরবর্ত্তী যুগের সুপরিচিত ও সুপ্রসিদ্ধ পৌরাণিক বিষ্ণুর পূর্ব্বাভাষ নানা ভাবে বর্ত্তমান রয়েছে। বৈদিক দেবতা "বিবস্বৎ" বেদোক্ত সৌরদেবমণ্ডলীতে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানের অধিকারী। সূর্য্যের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পর্কে কোনও সন্দেহ নেই। কেউ কেউ তাঁকে সূর্য্যের উদীয়মান স্বরূপ বলে মনে করেন। যজুর্ব্বেদে (বাজসনেয়ি সংহিতা ৮।৫, মৈত্রায়নী সংহিতা ১।৬।১২) তাঁকে বলা হ'য়েছে আদিত্য। পরবর্ত্তী সংস্কৃত সাহিত্যে "বিবস্বৎ" সূর্য্যেরই একটি নাম হিসাবে প্রযুক্ত হ'য়েছে (দ্রষ্টব্য—হেমচন্দ্রের অভিধান-চিন্তামণি, দেবকাণ্ড ১০, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত সংস্করণ পৃঃ ২৩)। সৌরদেবতা "মিত্র" বেদে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বরুণের সঙ্গে যুক্তভাবে অর্চ্চিত হ'য়েছেন। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে তাঁর সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তাতে তিনি যে সৌরদেবতা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। তাঁর আদেশবাণী উচ্চারণ করে তিনি সকলকে

একত্র করেন (ঋগ্বেদ ৩।৫৯।১)। স্বর্গ-মর্ত্ত্যের ভার তিনি বহন করেন, সূর্য্যের গতিপথ তিনি নির্দ্দিষ্ট করেন। বেদের ব্রাহ্মণ অংশে বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় মিত্র দিবসের দেবতা এবং বরুণ রাত্রির দেবতা হিসাবে কল্পিত হ'য়েছেন। পণ্ডিতগণের মতে বৈদিক মিত্র আবেস্তার বর্ণিত ইরাণীয় এক সৌরদেবতা মিথ্রের সগোত্র। "মিথ্র" এবং "মিত্র," এই দুই নামের সাদৃশ্য এদের এক উৎপত্তিস্থলের কথা মনে করিয়ে দেয়। অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের মতে প্রকৃতির মঙ্গলকারী শক্তি হিসাবে সূর্য্যের বিশেষ স্বরূপকেই বৈদিক ঋষিরা "মিত্র" নাম দিয়েছেন (Vedic Mythology, p. 30)। উষস্ বা উষা—জাতিতে স্ত্রী এবং সূর্য্যের সঙ্গে অভিন্ন না হলেও সূর্য্যের সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সূর্য্যোদয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশের রক্তিম শোভা দেবত্বে উন্নীত হয়ে উষস্ আখ্যা পেয়েছিল। মনোহারিত্ব ও কবিত্বের দিক দিয়ে এর বর্ণনা ও কল্পনার তুলনা ধর্ম্মসাহিত্যে বিরল। ম্যাকডোনেলের ভাষায় "Uṣas is the most graceful creation of Vedic poetry and there is no more charming figure in the descriptive religious lyrics of any other literature." (Vedic Mythology, p. 46) উষা সূর্য্যের পত্নী,সূর্য্য তাঁর প্রেমিক; প্রেমিক যেমন প্রিয়াকে অনুসরণ করেন তেমনি সূর্য্য তাঁকে অনুসরণ করেন (ঋগ্বেদ ৭।৭৫।৫, ১।১১৫।২)। আবার সূর্য্যের প্রসূতি জননীরূপেও তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে। তিনি স্বর্গের কন্যা, স্বর্গের প্রিয়া। সুসজ্জিত উজ্জ্বল তেজস্বী অশ্ব-বাহিত রথে আরোহণ করে তিনি পথ চলেন। তিনি অন্ধকার-বিনাশিনী, স্বর্গদ্বারোন্মোচনকারিণী, দুঃস্বপ্ন ও অপদেবতাসমূহের হন্ত্রী। তিনি বিশ্বচরাচরকে নিদ্রা হ'তে জাগরিত করেন—সর্ব্বত্র প্রাণসঞ্চার করেন। প্রভাত ও সূর্য্যের মধ্যে স্বাভাবিক

ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ উষা ও সূর্য্য উভয়ের কল্পনার মধ্যে সহজেই স্থান পেয়েছে। দুঃখের বিষয় উষার মহীয়সী কল্পনা বেদোত্তর ধর্ম্মসাহিত্যে আশানুরূপ পরিণতি লাভ করে নি। সূর্য্যপত্নী কালে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে স্বামীর দেহেই লীন হয়ে গিয়েছেন। ঋগ্বেদে আদিত্যগণের সংখ্যা ছয়—যথা মিত্র, অর্য্যমন, ভগ, বরুণ, দক্ষ ও অংশ (ঋগ্বেদ ২।২৭।১)। পরে তাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং যথাক্রমে সাত, আট ও শেষ পর্য্যন্ত বারতে দাঁড়ায়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (১।১।৯।১) আমরা এই আটটির নাম পাই যথাক্রমে—মিত্র বরুণ, অর্য্যমন, অংশ, ভগ, ধাতৃ, ইন্দ্র ও বিবস্বৎ। শতপথ ব্রাহ্মণে কোনও কোনও স্থলে এদের সংখ্যা বলা হয়েছে দ্বাদশ (৬।১।২।৮) এবং বৎসরের বারটি মাসের সঙ্গে এদের সমান মনে করা হয়েছে। পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মসাহিত্যে আদিত্যগণকে বরাবরই সংখ্যায় বারটি বলে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে—কিন্তু বিভিন্ন গ্রন্থে প্রাপ্ত তালিকাতে কিঞ্চিৎ তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক সাহিত্যের দ্বাদশাদিত্য যথাক্রমে মিত্র, অর্য্যমন, ভগ, বরুণ, দক্ষ, সূর্য্য, মার্ত্তণ্ড, অংশ, ধাতা, ইন্দ্র, বিবস্বৎ, বিষ্ণু। ভাগবত-পুরাণে দক্ষের স্থানে সবিতা, অংশের স্থলে রুদ্র, ইন্দ্রের স্থলে পূষণের নাম পাওয়া যায়; ভবিষ্য-পুরাণে দক্ষ, সূর্য্য ও মার্ত্তণ্ডের পরিবর্ত্তে পর্জ্জন্য ও পূষণ্‌ ও ত্বষ্টার নাম দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদোক্ত ছয়টি আদিত্য ছাড়া অনেক সময় এই গ্রন্থে সূর্য্যকেও আদিত্য বলা হয়েছে (ঋগ্বেদ ১।৫০।১২)। বৈদিক কাহিনী অনুযায়ী আদিত্যগণ কশ্যপ ও অদিতির পুত্র। অনেক সময়ে আদিত্যসংঘ বলতে সাধারণভাবে দেবগণকে বোঝাত। ম্যাকডোনেলের মতে সামগ্রিক অর্থে, এরা সকলেই দিব্যজ্যোতির প্রতীক—সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি উক্ত জ্যোতির বিভিন্ন প্রকাশগুলির সঙ্গে এঁদের বিশেষ

সম্পর্ক ছিলনা। বৈদিক সাহিত্যে আদিত্যসংঘের স্বরূপ যাই হোকনা কেন—পরবর্ত্তীকালে এরা যে সকলেই সৌরদেবতা হিসাবে অর্চ্চিত হ'তেন তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। অবশ্য এ কথাও সত্য যে মূলতঃ এঁদের মধ্যে বরুণ ইন্দ্র প্রভৃতি এমন কয়েকজন ছিলেন—স্বতন্ত্রভাবে যাঁদের সূর্য্যের সহিত প্রকৃতিগত কোনও সংস্রব ছিল না। বেদোক্ত দেবতা অশ্বিনদ্বয়ের স্বরূপ নিয়ে বহু তর্ক বিতর্ক হয়েছে। কেউ কেউ বলতে চেয়েছেন সূর্য্যের ক্ষীয়মান ও লুপ্তপ্রায় রশ্মিকে পুনরুদ্ধার করা এবং নিজ মহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা মূলতঃ এঁদের করণীয় কার্য্য ছিল। কিন্তু এই মত সবাই মেনে নেন নি। এঁদের সৌর উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ এখনও নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। তাই বর্ত্তমান নিবন্ধে এদের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

বৈদিক ধর্ম্মে সূর্য্য ও তৎসংক্রান্ত দেবমণ্ডলীর স্থান সম্পর্কে উপরের আলোচনা থেকে—উক্ত প্রসঙ্গের গুরুত্ব বোঝা যাবে। বৈদিক দেবলোককে সাধারণতঃ তিনটি মণ্ডলে ভাগ করা হ'য়ে থাকে—যথা অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য। এদের মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলের দেবগণ সমগ্রভাবে বৈদিক সাহিত্যের রচয়িতৃগণের কল্পনারাজ্যে যতখানি আলোড়ন তুলেছিলেন—অন্য দুই মণ্ডলের দেবগণ স্বতন্ত্রভাবে ও সমগ্রভাবে ততখানি পেরেছেন বলে মনে হ'য় না। কাত্যায়ণ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ঋগ্বেদ অনুক্রমণীতে এই তিন মণ্ডলের মধ্যে সূর্য্যমণ্ডলকে সর্ব্বাধিক প্রধান্য দিয়ে বলেছেন—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি একমাত্র আরাধ্য মহান আত্মা—কেউ বলেন তিনি তিনিই সূর্য্য, আবার কেউবা বলেন সূর্য্যই তিনি। বেদে সূর্য্যমণ্ডলীর প্রাধান্য ও গুরুত্ব এই জাতীয় ইঙ্গিত থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। বৈদিক সৌরধর্ম্ম ভারতীয় মানসকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল পরবর্ত্তী যুগের সূর্য্যোপাসনা বিষয়ক আলোচনাতে

তা বোঝা যাবে। এখানে এইটুকু বলে রাখা যেতে পারে—সূর্য্যপূজায় বিদেশী প্রভাব আমদানী হওয়া সত্ত্বেও—বৈদিক প্রভাব লুপ্ত হয় নি। সৌরধর্ম্মের তৃতীয় স্তর আলোচনা করবার পূর্ব্বে বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড-বিরোধী—বৌদ্ধ, জৈন ও ভাগবত ধর্ম্মের সঙ্গে সূর্য্যপূজার কোনও সম্পর্ক ছিল কিনা—সংক্ষেপে এই বিষয়ে দুই একটি কথা বলে নিতে হ'বে। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের অভ্যুত্থানের সময় খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতক। এই দুই ধর্ম্ম বৈদিক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম্মবহুল ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ফরাসী পণ্ডিত এমিল সেনার্ত্ত তাঁর Essai Sur la Legende du Buddha গ্রন্থে মত প্রকাশ করেন যে, বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে যে সকল কাহিনী আমরা পাই তার থেকে বুদ্ধকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে স্বীকার করা কঠিন। ব্যক্তিগতভাবে বুদ্ধ বলে কেউ হয়তো ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধ ঐতিহ্যে যে ধর্ম্মগুরুর জীবনকাহিনী পাওয়া যায়—তিনি সূর্য্যদেব ছাড়া আর কেউ ন'ন। সুতরাং সেনার্ত্তের মতে বৌদ্ধধর্ম্ম ও বুদ্ধ পূজা সৌরধর্ম্ম ও সূর্য্যপূজারই নামান্তর। উক্ত মত পশ্চিমে কিছুদিন, কিছু কিছু সমর্থন লাভ করলেও বর্ত্তমানে একেবারেই খণ্ডিত ও পরিত্যক্ত হ'য়েছে—(দ্রষ্টব্য Oldenerg The Buddha Eng-trans pp 71-94), এবং বুদ্ধের ঐতিহাসিকত্ব এবং ব্যক্তিত্ব এখন সুনিশ্চিত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং এ আলোচনা টেনে বাড়িয়ে লাভ নেই। জৈনধর্ম্ম মূলতঃ বেদ-বিরোধী হ'লেও—কালক্রমে ব্রহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম্মের দেবলোক ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে একটা আপোষরফা করে নিয়েছিল—তাই হিন্দুধর্ম্মের দেবদেবীরা জৈনগণ কর্ত্তৃক একেবারে বর্জ্জিত হন নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—পরবর্ত্তীকালে শ্বেতাম্বর জৈন কবি মানতুঙ্গের রচিত "ভক্তামরস্তোত্র"তে (খৃষ্টীয় সপ্তম শতক) সূর্য্যদেবের উচ্ছ্বসিত স্তুতি স্থান পেয়েছে। কিন্তু সৌরধর্ম্মের প্রভাব

সর্ব্বাধিক কার্য্যকরী হয়েছে—ভাগবত-বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপর। বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি বেদ-বিরোধী ধর্ম্মের সঙ্গে ভাগবত ধর্ম্মের মিল ছিল এখানেই যে, মূলতঃ এই ধর্ম্মও বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড যাগযজ্ঞ ইত্যাদি ক্রিয়া কলাপের বিরোধী ছিল—এবং সেই জন্যই গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ এর উপর প্রসন্ন ছিলেন না। বহু পূর্ব্বে গ্রীয়ার্সন বলেছিলেন যে ভাগবত ধর্ম্মের উৎপত্তি সৌরধর্ম্ম থেকে। এই মতটিকে সুযুক্তির উপর দাঁড় করিয়েছেন—ঐতিহাসিক শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়। তিনি দেখিয়েছেন—যে ভাগবত বৈষ্ণব ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান আরাধ্য কৃষ্ণ-বাসুদেবের বাল্যশিক্ষায় সৌরমতের প্রভাব পড়েছিল। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়—কৃষ্ণ দেবকীপুত্রের গুরু ঘোর আঙ্গিরস নামক ঋষি (৩।১৭।৬)। কোষীতকি ব্রাহ্মণ অনুযায়ী ইনি সূর্য্যের পুরোহিত। ইনি কৃষ্ণকে যে পুরুষ যজ্ঞ বিষয়ক উপদেশ দিয়েছিলেন তার শেষেও ঋক্ সংহিতা থেকে সূর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত অংশ উদ্ধৃত করে সমাপন করেন (ঋগ্বেদ ৮।৬।৩০-"দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমমিতি—")। অধ্যাপক রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন যে ছান্দোগ্য উপনিষদোক্ত কৃষ্ণ তাঁর গুরু ঘোর আঙ্গিরসের নিকট যে শিক্ষা পেয়েছিলেন—গীতাতে একপ্রকার সেই নীতিরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে (Early History of the Vaishnava Sect, 2nd ed. pp. 78-83)। তা' ছাড়াও—মহাভারত এবং গীতার অংশ বিশেষ বিশ্লেষণ করে উক্ত অধ্যাপক মহাশয় দেখিয়েছেন যে ভাগবত ধর্ম্মের উপর মূলতঃ সৌরধর্ম্মের প্রভাব কত গভীর। কৃষ্ণ-বাসুদেব উত্তরকালে বৈদিক বিষ্ণুর সহিত অভিন্ন রূপে গৃহীত ও পূজিত হ'য়েছিলেন এবং বিষ্ণুর স্বরূপ আলোচনাকালে আমরা দেখেছি মূলতঃ সৌরদেবতা হ'লেও পরবর্ত্তীকালের বৈষ্ণবগণের দ্বারা অর্চ্চিত পৌরাণিক বিষ্ণুর কতগুলি লক্ষণ তাঁর মধ্যে কেমন

সুস্পষ্ট। সমস্ত দিক বিচার করলে—এ বিষয়ে আর সন্দেহের লেশমাত্র থাকে না যে ভাগবত বৈষ্ণব ধর্ম্ম নানাভাবে বৈদিক সৌর-ধর্ম্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল (দ্রষ্টব্য হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী—Early Histoy of the Vaishnava Sect, 2nd ed. pp. 89-91)। * বৈদিক যুগে সূর্য্যপূজার ব্যাপক প্রচলন থাকলেও সূর্য্যোপাসকগণ কোনও একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে পরিণত হ'য়েছিলেন বলে জানা যায় না। কিন্তু বৈদিক যুগের অবসানে ক্রমশঃ সৌর সম্প্রদায় নামক সূর্য্যোপাসক একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় গড়ে উঠতে থাকে। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতির ন্যায় এদের স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক অস্তিত্বের উল্লেখ মহাভারত (৭।১২।১৪-১৬) ইত্যাদিতে দৃষ্ট হয়। বেদে সূর্য্যের বিভিন্ন স্বরূপকে এক একটি স্বতন্ত্র দেবতা জ্ঞান করা হত—কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সূর্য্য ভিন্ন অন্যান্য স্বতন্ত্র বৈদিক সৌরদেবতাগণ অনেকেই স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে সূর্য্যের সঙ্গে এক হ'য়ে গিয়েছিল। তাদের নামগুলি সূর্য্যের নাম হিসাবেই প্রচলিত হ'য়েছিল। মহাভারতে (৩।৩।১৫-২৯) এবং ব্রহ্মপুরাণে (৩৩।৩৪-৪৯) প্রদত্ত সূর্য্যের অষ্টোত্তর শত নামের তালিকা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

ভারতে সূর্য্যপূজার তৃতীয় স্তরটির ইতিহাস অতি আশ্চর্য্যজনক। এর মধ্যে বিদেশী প্রভাবের প্রাচুর্য্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন পারস্য থেকে আগত একদল পুরোহিত সেখান থেকে সূর্য্য-পূজার একটি বিশিষ্ট ধারা সঙ্গে করে ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন এবং

---

* এক্ষেত্রে বক্তব্য, অনেকে ছান্দোগ্য উপনিষদের কৃষ্ণ দেবকীপুত্র আর পৌরাণিক কৃষ্ণ দেবকীপুত্রকে দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তি মনে করেন। কিন্তু অধ্যাপক রায় চৌধুরী মহাশয় এদের অভিন্নত্ব প্রতিপন্ন করে যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা আজ পর্য্যন্ত কেউ সন্তোষজনকরূপে খণ্ডন করতে পারেন নি।

সেইটির দ্বারাই উক্ত তৃতীয় স্তরটি সংগঠিত। ভারতের সঙ্গে ইরাণ বা পারস্যের যোগাযোগ অতি প্রাচীন। ভারতে আগমনকালে আর্য্যগণ প্রথমে পারস্যে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখান থেকেই বৈদিক সভ্যতার স্রষ্টারা ভারতে প্রবেশ করেন। পারস্যে বহুকাল একসঙ্গে বাস করবার ফলে আর্য্যগণের ভারতীয় ও পারসীক গোষ্ঠিদ্বয়ের মধ্যে একটি অতি ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। সূর্য্যপূজা ও সৌরধর্ম্মের বিকাশ উপরি-উক্ত দুটি শাখার মধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে ঘটে এবং স্বভাবতঃ এক্ষেত্রেও দুটি শাখার মধ্যে বহু বিষয়ে যোগাযোগ ও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন পারসীক ধর্ম্মগ্রন্থ আবেস্তাতে সূর্য্যদেবের নাম "হ্বরে ক্ষ্ হয়েত" (সূর্য্যরাজ)। তাঁর যা বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে তাঁকে বলা হয়েছে অমর ও জ্যোতির্ম্ময়। তিনি পৃথিবীকে পবিত্র করেন সমস্ত প্রাণীকে পবিত্র করেন, বারিরাশিকে পবিত্র করেন। তাঁর বিহনে সমস্ত পৃথিবী ঘুমে আচ্ছন্ন এবং অপদেবতা কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হয়। তিনি নিদ্রা ও অপদেবতা উভয়ের বিনাশকারী (Haug-Essays on the Religion of the Parsis—3rd ed. pp. 199-200)। বেদের সূর্য্যের মতই দ্রুতগামী অশ্বগণ তাঁর বাহন এবং সূর্য্যকে যেমন মিত্র বরুণ অগ্নি প্রভৃতির চক্ষু বলে বেদে বর্ণনা করা হ'য়েছে তেমনি তাঁকেও আবেস্তাতে সর্ব্বোচ্চ দেবতা অহুর মাজ্দার চক্ষু বলে অভিহিত করা হ'য়েছে। ম্যাক্ডোনেল দেখিয়েছেন প্রাচীন পারসীক "হ্বরে" এবং বেদের "সূর্য্য" এই দুটি শব্দ একই ধাতু থেকে উৎপন্ন (Vedic Mythology pp 30-31)। এই প্রসঙ্গে প্রাচীন পারস্যের আর একটি দেবতা উল্লেখযোগ্য, তিনি "মিথ্র্"। ইরাণীয় সূর্য্যদেবতা হিসাবে পরে ইনিই বিখ্যাত হন। আবেস্তার অন্তর্ভুক্ত "মিহির যশ্ত্" নামক অংশে এই "মিথ্র্" বা "মিহিরের" স্তুতি বর্ত্তমান। তিনি

সর্ব্বদা সত্যবাদী—তাঁর সহস্র শ্রবণেন্দ্রিয়, দশ সহস্র চক্ষু, চরাচরের মঙ্গলের জন্য তিনি সদাজাগরিত প্রহরী, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মিথ্যাচার বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে তিনি অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেন। . তিনি যখন রথারোহণে পৃথিবী পরিদর্শনে নির্গত হন তখন অপদেবতাগণ ভয়ে পলায়ন করে। পণ্ডিতগণের মতে প্রাচীন পারসীক দেবতা "মিথ্‌র" এবং বৈদিক সৌরদেবতা "মিত্র" মূলতঃ একই দেবতা (Haug—Essays on the Religion of the Parsis pp 202-05, 273)। ইরাণীয় ধর্ম্মে ক্রমশঃ এই সূর্য্য-উপাসনা অধিকতর প্রাধান্য লাভ করতে থাকে এবং ক্রমশঃ "মিথ্‌র" বা "মিহির" সে ধর্ম্মের অন্যতম প্রধান দেবতা হ'য়ে দাঁড়ান। আজ পর্য্যন্ত ধর্ম্মপ্রাণ পারসীদিগের দৈনিক উচ্চার্য্য পাঁচটি স্তবের মধ্যে "হ্বরে ক্ষ্‌হয়েত" (বর্ত্তমান পারসীতে "খুরশীদ") এবং "মিথ্‌র" (মিহির)—এই দুই সৌরদেবতার স্তুতি. প্রধান স্থান অধিকার করে রয়েছে। ধর্ম্মের জটিলতা বৃদ্ধিতেই স্বতন্ত্র পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব। ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণগণের মত পারসীকগণের মধ্যেও ধর্ম্মব্যবসায়ী পুরোহিত শ্রেণী ক্রমশঃ দেখা দিল। এইরূপ এক শ্রেণীর পুরোহিতগণ ম্যাজাই বা Magi নামে পরিচিত ছিল। সূর্য্যদেবের উপাসক হিসাবে এরা খ্যাতিলাভ করে—এবং হোম যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে. পারসীকগণের নিকট এরা অপরিহার্য্য হ'য়ে দাঁড়ায়। দৈবজ্ঞ ও গণৎকার হিসাবেও এরা খ্যাতিলাভ করে (Sykes—A History of Persia Vol. I pp 102-14)। এদের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শীঘ্রই পারস্যে এদের একচ্ছত্র আধ্যাত্মিক আধিপত্য বিস্তারিত হয়। পারস্যের ইতিহাসে সাসানিড্‌ বংশের রাজত্বকালেই এদের প্রভাব সর্ব্বাধিক প্রসার লাভ করে। এই সূর্য্যোপাসক ম্যাজাই পুরোহিত

সম্প্রদায়ের একটি শাখা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল এ রকম প্রমাণ আছে। ভারতীয় সাহিত্যে মহাভারত পুরাণাদিতে এই আগমনের স্মৃতি ছড়িয়ে রয়েছে। এই সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান হ'ল ভবিষ্য-পুরাণের সাক্ষ্য। ম্যাজাই পুরোহিতগণ ভারতীয় ঐতিহ্যে মগ ব্রাহ্মণ বা মগ-দ্বিজ নামে পরিচিত। ভবিষ্যপুরাণে এদের ভারত-অভিযানের যে কাহিনী পাওয়া যায় তা হ'ল এই (ভবিষ্যপুরাণ—ব্রাহ্মপর্ব্ব ১৩৯-১৪২, অধ্যায় বোম্বাই সংস্করণ পৃঃ ১২৪-২৮) : "মগ-ব্রাহ্মণগণের আদি-নিবাস ছিল শাকদ্বীপে। মিহির গোত্রসম্ভূত ঋজিহ্ব নামক ঋষির কন্যা নিক্ষুভার গর্ভে সূর্য্যের ঔরসে জলগম্বু বা জরশব্দ নামক এক পুত্র জন্মায়। সূর্য্য ও নিক্ষুভার এই পুত্র মগ-সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ। এক সময়ে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন এবং তিনি নারদের নিকট সূর্য্য-মহিমা শ্রবণ করে রোগ মোচনার্থ সূর্য্যের আরাধনা করবার জন্য কৃতসংকল্প হন। চন্দ্রভাগা নদীর তীরে তিনি একটি মন্দির নির্ম্মাণ করতে মনস্থ করলে—কোনও ব্রাহ্মণই উক্ত মন্দিরে পুরোহিতের কাজ করতে সম্মত হন না। তখন শাম্ব শাকদ্বীপে গমন করেন এবং সেখান থেকে অষ্টাদশটি মগ-ব্রাহ্মণ পরিবারকে জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষে আনয়ন করেন। মগ-সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা ছিলেন সূর্য্য, সুতরাং সূর্য্যোপাসক পুরোহিতের কর্ত্তব্য এঁদের দ্বারা ভাল ভাবেই সম্পন্ন হয়।" এইভাবে ম্যাজাই পুরোহিত সম্প্রদায় সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণ পুরোহিত হিসাবে ভারতে প্রবেশ করেন। শাকদ্বীপ-নিবাসী সূর্য্যোপাসক মগব্রাহ্মণগণের উল্লেখ—মহাভারত (ভীষ্মপর্ব্ব ১২।৩৩), বিষ্ণুপুরাণ (২।৪।৬৯-৭১), ব্রহ্মপুরাণ (২০।৭১-৭২), অগ্নিপুরাণ (১১৯।১৮-২১), কূর্মপুরাণ (পূর্ব্বভাগ, ৪৮।৩৬-৩৮) প্রভৃতিতেও দেখা যায়। শাকদ্বীপে নিবাসহেতু ভারতীয় ঐতিহ্যে এরা শাকদ্বীপী

ব্রাহ্মণ নামেও সুপরিচিত। শাকদ্বীপ পুরাণে বর্ণিত সপ্তদ্বীপে অন্যতম। পণ্ডিতগণের মতে প্রাচীন Scythian বা শক জাতির নাম থেকেই শাকদ্বীপ নামটির উৎপত্তি। পণ্ডিতগণের মতে শাকদ্বীপ প্রাচীন শকস্থান বা (ইরাণের অন্তর্গত) আধুনিক সিস্তান হ'তে অভিন্ন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে শকজাতির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পতনের পর বিদেশী আক্রমণকারিগণ ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্ত আক্রমণ করে। সেই সময় উত্তর পশ্চিম অঞ্চল ক্রমশঃ যবন (Greek), শক (Scythian), পহ্লব (Parthian) কুষাণ (Kushan) প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণকারী জাতিগুলির কবলিত হ'য়ে পড়ে। বিদেশী হলেও ভারতে বসবাস করে ক্রমশঃ এরা ভারতের রাষ্ট্রনীতি ও সমাজব্যবস্থাতে নিজেদের একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। সম্ভবতঃ এই শকগণের সঙ্গে সঙ্গে— প্রাচীন পারসীক মতে সূর্য্যোপাসনা ভারতে প্রবেশ করে। কণিষ্ক এবং তাঁর পরবর্ত্তী কুষাণ রাজগণের মুদ্রাতেও প্রাচীন ইরাণের সূর্য্যদেবতা "মিয়িরো" বা মিহিরের নাম ও প্রতিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। অনুমান হয় এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হতেই এই বিদেশী সূর্য্যদেবতার পূজা পদ্ধতি ভারতে আসে—এবং সেই সঙ্গে তাঁর পূজারী ম্যাজাই বা মগ পুরোহিত সম্প্রদায়ও ভারতে প্রবেশ করে। কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পরে পারস্যের সাসানিড্ রাজবংশ আফগানিস্তান ও সিন্ধু উপত্যকা অধিকার করেছিল। পূর্ব্বে বলেছি এদের রাজত্বকালে পারস্যে ম্যাজাই সম্প্রদায়ের আধিপত্য বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং ভারতে অংশবিশেষের উপর এদের অধিকার-কালে—এই সম্প্রদায়ের ভারতে প্রবেশের পথ যে আরও প্রশস্ত হবে তা বলাই বাহুল্য। এই ভাবে খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতক (কুষাণ যুগের আরম্ভ) থেকে সুরু

ক'রে খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকের আরম্ভ (ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সাসানিড্ আধিপত্যের সমাপ্তি) পর্য্যন্ত-ম্যাজাই পুরোহিত সম্প্রদায় ভারতে প্রবেশ ক'রে বসতি স্থাপন করতে থাকে। একথা উল্লেখযোগ্য, যে ভারতীয় সমাজে তারা মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ হিসাবেই গৃহীত হয়েছিল। এ ঘটনা তৎকালীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার উদারতা সূচিত করে। এই ভাবে বিদেশী সূর্য্যোপাসনার ধারা এই মিহির-পূজক বিদেশী পুরোহিত সম্প্রদায় ভারতে নিয়ে এল। কালক্রমে উত্তর ভারতে সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বলতে প্রধানতঃ এঁদেরই বোঝাত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে জ্যোতিষী বরাহমিহির তাঁর "বৃহৎসংহিতা" গ্রন্থে (৬০।১৯ ; Kern's edition pp 328-29) বলেছেন :—

> "বিষ্ণোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শম্ভোঃ সভস্মদ্বিজান্
> মাতৄণামপি মাতৃমণ্ডলবিদো বিপ্রান্বিদুর্ব্রহ্মণঃ।
> শাক্যান্ সর্ব্বহিতস্য শান্তমনসো নগ্নান্ জিনানাং বিদু
> র্যে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ স্ববিধানা তৈস্তস্য কার্য্যা ক্রিয়া।"

অর্থাৎ "ভাগবতগণ বিষ্ণুর উপাসক (ব্রাহ্মণ); মগগণ সূর্য্যের উপাসক (ব্রাহ্মণ); ভস্মলিপ্ত দ্বিজগণ শিবের উপাসক (ব্রাহ্মণ); মাতৃমণ্ডলবিদ্গণ মাতৃগণের উপাসক (ব্রাহ্মণ); শাক্যগণ সর্ব্বহিতকর শান্তমনা (বুদ্ধের) উপাসক (ব্রাহ্মণ); নগ্ন (বিপ্রগণ) জিনের উপাসক (ব্রাহ্মণ) যাঁরা যে যে দেবতার উপাসক, তাঁরা নিজ নিজ বিধি অনুসারে সেই সকল দেবতার (প্রতিষ্ঠা পূজাদি) ক্রিয়া সম্পাদন করেন।" এই শ্লোকটিতে সূর্য্যের উপাসক বিশিষ্ট সম্প্রদায় হিসাবে মগগণকে নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ কালক্রমে সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েন। আজও তাঁদের শাখা

প্রশাখা বহুস্থানে, বিশেষ করে পশ্চিম ভারতের রাজপুতনা, গুজরাট, পশ্চিম মালোয়া, কাথিওয়াড়, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এঁদের দ্বারা ভারতে আনীত সৌরধর্মের বিশেষত্ব হল সূর্য্যের রোগব্যাধিহর স্বরূপের উপাসনা। ভবিষ্যপুরাণোক্ত কাহিনীতে আমরা দেখেছি—যে শাম্ব কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়েছিলেন বলেই আরোগ্য হেতু সূর্য্যোপাসনা করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, এবং সেই সূত্রে তিনি শাকদ্বীপবাসী মগব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হন। প্রাচীন পারসীকগণের মধ্যেও কুষ্ঠব্যাধিকে সূর্য্যদেবের অভিশাপ বলে মনে করা হত। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসের সাক্ষ্য এই সম্পর্কে মূল্যবান। তিনি বলেছেন (১।১৩৮): "Whatsoever one of the citizens has leprosy or white (leprosy), does not come into the city, nor does he mingle with the other Persians. And they say that they contact these diseases, because of having committed some sin aganist the sun. শাম্বের ক্ষেত্রে সূর্য্যপূজা ও কুষ্ঠরোগের যে যোগাযোগ লক্ষিত হচ্ছে প্রাচীন ইরাণেও তার অনুরূপ যোগাযোগ দেখতে পাওয়া যায়। ভারতীয় সাহিত্যে এই সংস্কার কেবলমাত্র ভবিষ্যপুরাণে যে দেখতে পাওয়া যায় তা নয়। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে রচিত ময়ূরের "সূর্য্যশতক" কাব্যখানি এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। কথিত আছে কবি ময়ূর স্বয়ং কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়ে—রোগমুক্তির জন্য সূর্য্যের স্তবপূর্ণ সূর্য্যশতক কাব্যখানি রচনা করেন। এর মধ্যে সূর্য্যের কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য করার ক্ষমতা সম্পর্কে এক স্থানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—যেমন—

শীর্ণ ঘ্রাণাঙ্‌ঘ্রিপাণীন্‌ ঘৃণিভিরপঘনৈর্ঘর্ঘরাব্যক্ত ঘোষান্‌
দীর্ঘাঘ্রাতানঘৌঘৈঃ পুনরপি ঘটয়ত্যেক উল্লাঘয়ন্‌ যঃ।

ঘর্মাংশোস্তস্য বোঽস্ত্বদ্বিগুণঘনঘৃণানিঘ্ননির্বিঘ্নবৃত্তেঃ
দত্তার্ঘাঃ সিদ্ধসংঘৈর্বিদধতু ঘৃণয়ঃ শীঘ্রমংহোবিঘাতম্ ॥
(সূর্য্যশতক—শ্লোক ৬)

মর্ম্মানুবাদ—"যারা পাপভারে স্থবির, এবং সেই কারণে যাদের হস্ত পদ নাসার চর্ম্ম সঙ্কুচিত; যাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দূষিত ক্ষতে পূর্ণ—যাদের মুখ হ'তে অস্পষ্ট ঘর্ঘর শব্দ নির্গত হয়, তপ্তরশ্মিবিশিষ্ট (সূর্য্য), তাদের নব (তনু) প্রদান করেন ও আরোগ্য করেন। যিনি বিধিনিষেধমুক্ত, অসীম কারুণ্যে পূর্ণ যাঁর অন্তর, তিনি তাঁদের নূতন করেন। সেই তপ্তরশ্মিবিশিষ্ট (সূর্য্য), যাঁকে সিদ্ধগণ অর্ঘ্য প্রদান করেন—তোমার পাপ সত্বর ক্ষালন করুন।" এখানে পাপীদের ব্যাধির যে বর্ণনা করা হয়েছে—তা যে কুষ্ঠরোগের বর্ণনা এতে বিশেষ সন্দেহ নেই। সূর্য্যের বিরুদ্ধে অপরাধের শাস্তি যে কুষ্ঠ ব্যাধি—মৎস্যপুরাণেও সেই কথা বলা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ে দেখতে পাওয়া যায়—যে সূর্য্যমূর্ত্তির পদদ্বয় নির্ম্মাণ করবার চেষ্টা না করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দ্দেশ না মানলে—শাস্তিস্বরূপ কুষ্ঠব্যাধি ও নরকবাস হ'বে বলে ভয় দেখানোও হয়েছে—

যঃ করোতি স পাপিষ্ঠাং গতিমাপ্নোতি নিন্দিতাম্।
কুষ্ঠরোগমবাপ্নোতি লোকেঽস্মিন্ দুঃখসংযুতঃ ॥
(মৎস্যপুরাণ ১১।৩২)

ব্রহ্মপুরাণে সূর্য্যের যে সকল স্তব স্তুতি দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে লক্ষ্যণীয়—

"নমো নমো রোগবিমোচনায়।" (ব্রহ্মপুরাণ ৩৩।২২)

প্রাচীন ভারতীয় খোদিত লিপিগুলিতে—সূর্য্যের এই রোগহর স্বরূপের বিষয় উল্লেখ দেখা যায়। চতুর্থ বা পঞ্চম খৃষ্টীয় শতক থেকে

এর সুরু। ৪৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দের গুপ্তসম্রাট সকন্দগুপ্তের ইন্দো তাম্রশাসনের প্রথমে যে সূর্য্য বন্দনা পাই, তাতে আছে "......যং লোকো বহু রোগোবেগবিবশঃ সংশৃত্য চেতো লভঃ পায়াদ্ বঃ স জগৎ পিধানপুট ভিদ্রশ্ম্যাকরো ভাস্করঃ."—অর্থাৎ "পৃথিবীব্যাপী অন্ধকারভেদী রশ্মির আকর সেই সূর্য্য তোমাদিগকে রক্ষা করুন......রোগ এবং উদ্বেগে কাতর মানবজাতি সংযম হারিয়ে—যাঁর শরণ নেয় ও পুনরায় চেতনা লাভ করে" (Fleet—Gupta Inscriptions pp 70-71)। বাঙলাদেশের দিনাজপুর অঞ্চলে বাইরহাট্টাতে প্রাপ্ত একটি সূর্য্যমূর্ত্তির পাদপীঠে—একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর অক্ষরে খোদিত লিপিতে সূর্য্য-দেবকে বলা হয়েছে "সমস্ত-রোগানাং হর্ত্তা" (History of Bengal —Dacca University, Vol I p 456)। উদাহরণ বাড়ানোর স্থান বা প্রয়োজন নেই। যেটুকু বলা হয়েছে তার থেকে বেশ বোঝা যায়,—শাকদ্বীপী বা মগব্রাহ্মণগণের প্রভাবে সূর্য্যের রোগ-বিমোচন স্বরূপের অর্চ্চনার রেওয়াজ ভারতে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। আমরা দেখেছি বৈদিক সূর্য্যের কল্পনাতেও—সূর্য্যকে রোগ-চিকিৎসকরূপে স্তুতি করবার প্রবণতা রয়েছে। তবে সেখানে—সূর্য্যের রোগ-হরত্ব হচ্ছে তাঁর বহু স্বরূপের মধ্যে একটি। বৈদিক ও পরবর্ত্তী সূর্য্যপূজার মধ্যে যোগসূত্র—সূর্য্যের এই রোগহর স্বরূপের অর্চ্চনা। এই স্বরূপের অর্চ্চনায় অভ্যস্ত ভারতীয় সূর্য্যোপাসকগণের চোখে বিদেশী পুরোহিতগণের প্রধানতঃ রোগ-বিমোচন রূপে সূর্য্যের অর্চ্চনা, নূতনও মনে হয়নি বর্জ্জনীয়ও মনে হয়নি। সূর্য্যপূজার বৈদিক ও ইরাণীয় স্তর তাই পাশাপাশি মিলে মিশে থাকতে পেরেছিল—এবং সাধারণ লোকের চোখেও এই দুটি ধারার পার্থক্য ধরা পড়েনি—এরা এক হয়ে মিশে গিয়েছিল। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ গোপাল

ভাণ্ডারকর মহাশয় এই যোগসূত্রটি ধরতে না পারায় তাঁর কাছে—এই দুই ধারার মিলন, রহস্যই থেকে গিয়েছে। ভারতে আগত বিদেশী সূর্য্যো-পাসকগণের আর একটি বড় দান সম্ভবতঃ সূর্য্যমন্দির ও সূর্য্যমূর্ত্তির পরি-কল্পনা। আদিম ও বৈদিক সূর্য্যোপাসনায়—সূর্য্যের মন্দির ও মূর্ত্তি নির্ম্মিত হ'ত বলে জানা নেই। কিন্তু গুপ্ত যুগ এমন কি তার কিছু পূর্ব্ববর্ত্তীকাল থেকে আমরা দেখি ভারতবর্ষে অন্যান্য দেবমন্দিরের সঙ্গে বহু সূর্য্যমন্দিরও নির্ম্মিত হচ্ছে। গুপ্ত যুগের খোদিত লিপিগুলি থেকে আমরা অন্ততঃ পাঁচটি সূর্য্যমন্দিরের অস্তিত্বের কথা জানতে পারি, যথা—ইন্দোর, গোয়ালিয়র, মান্দাসর, আশ্রমক ও দেওবর্ণার্ক। পরবর্ত্তীকালে পশ্চিম ভারতে, গুজরাট, কাথিওয়াড় প্রভৃতি অঞ্চলেও অনেকগুলি সূর্য্যমন্দিরের অস্তিত্ব ছিল (এই সম্পর্কে বিশেষ দ্রষ্টব্য Burgess এবং Cousens—Architectural Antiquities in Nothern Guzrat; এবং H. D. Sankalia প্রণীত The Archaeology of Guzrat including Kathiwar)। উড়িষ্যার সুবিখ্যাত কোণার্ক সূর্য্যমন্দির এবং কাশ্মীরের সুবিখ্যাত মার্ত্তণ্ড মন্দিরের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মূলতানের সুবিখ্যাত সূর্য্যমন্দিরের বর্ণনা মুসলমান পর্য্যটকদের রচনায় পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ প্রাচীন সূর্য্যমন্দির আজ হয় বিলুপ্ত না হয় তাদের ভগ্নদশা। সূর্য্যমূর্ত্তি গঠনেও বিদেশী সূর্য্যপূজার ধারার প্রভাব কার্য্যকরী হয়েছিল। ভারতে নির্ম্মিত প্রাচীন সূর্য্যমূর্ত্তিকে নির্ম্মাণ-রীতির দিক থেকে দুইভাগে ভাগ করা যায়—উত্তর দেশীয় ও দক্ষিণ দেশীয়। এর মধ্যে উত্তর ভারতে নির্ম্মিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে মগ বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ আনীত পারসীক প্রভাব সুস্পষ্ট। এদের হাঁটু পর্য্যন্ত পাদুকা বা পারসীক boot দ্বারা আচ্ছাদিত—এবং অব্যঙ্গ নামক কোমরবন্ধ দেহের মধ্যভাগে পরিবেষ্টিত। এই দুটি লক্ষণই বিদেশী প্রভাবের ফল। পারসীক

ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যবহৃত "আইওয়াওনৃহম্" নামক মেখলা বা কোমরবন্ধই ভারতীয় ভাষায় "অভ্যঙ্গ" নাম ধারণ করেছে। উত্তর ভারত প্রচলিত সূর্য্যমূর্ত্তির এই বিদেশী লক্ষণগুলি শাকদ্বীপী বা মগ ব্রাহ্মণগণের প্রেরণার ফলে রূপ পেয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। উত্তর ভারতীয় সূর্য্যমূর্ত্তির লক্ষণ যে কয়খানি প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত হ'য়েছে—সেগুলিতে এই বিদেশী বৈশিষ্ট্যগুলিও সযত্নে উল্লিখিত হ'য়েছে—যথা বরাহ মিহিরের বৃহৎ সংহিতা, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, মৎস্যপুরাণ অগ্নিপুরাণ বিশ্বকর্ম্মাবতারশাস্ত্র ইত্যাদি। দক্ষিণ দেশীয় সূর্য্যমূর্ত্তিতে এবং অংশুমদ্ভেদাগম, শিল্পরত্ন প্রভৃতি তৎসংক্রান্ত পুস্তকাদির বর্ণনাতে উক্ত বিদেশী লক্ষণগুলি অনুপস্থিত (এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য—J. N. Bannerjea—The Development of Hindu Iconography pp 33-34 ; Gopinath Rao—Elements of Hindu Iconography Vol I Pt. II Appendix C, pp, 83-100 ; বরাহ-মিহির বৃহৎসংহিতা ৫৮।৪৬-৪৯, Kern's edition pp 320-21 etc.)। সারা ভারতে এত অসংখ্য সূর্য্যমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হ'য়েছে যে তার থেকে সহজেই বোঝা যায় সূর্য্য ভক্তির জগতে—শিব বিষ্ণু প্রভৃতি সুপরিচিত দেবতার একজন বড় রকমের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বিদেশী মগগণ-আনীত সূর্য্যপূজার পারসীক ধারা ভারতের, বিশেষতঃ উত্তর ভারতের সাহিত্য ও শিল্পে কতখানি গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল—উপরের আলোচনা থেকে তা উপলব্ধি করা যায়। বিহারের গয়া জেলায় প্রাপ্ত ১১৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলালিপিতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ কবি গঙ্গাধর স্ব-সম্প্রদায়ের যে প্রশস্তি গান করেছেন শাকদ্বীপী সূর্য্যোপাসক-গণের প্রভাবের কথা ভাবলে তা অত্যুক্তি বলে মনে হয় না—

"দেবো জীয়াত্রিলোকীমণিরয়মরুণো যন্নিবাসেন পুণ্যঃ।
শাকদ্বীপস্স দুগ্ধাম্বুনিধিবলয়িতো যত্র বিপ্রে মগাখ্যাঃ॥

বংশস্তত্র দ্বিজানাং ভ্রমিলিখিততর্নোব ভাস্বতঃ স্বাঙ্গমুক্তঃ।
শাম্বো যানানিনায় স্বয়মিহ মহিতাস্তে জগত্যাং জয়ন্তি॥
(Epigraphia Indica Vol II p. 333)

"সেই ত্রিলোকের মণিস্বরূপ দেব অরুণের জয় হোক। যাঁর অবস্থান হেতু দুগ্ধসমুদ্রপরিবেষ্টিত শাকদ্বীপ পূত; যে (শাকদ্বীপে) ব্রাহ্মণগণকে মগ আখ্যা দেওয়া হ'য়ে থাকে। সেখানে স্বয়ং ভ্রমিযন্ত্রের দ্বারা লাঞ্ছিত সূর্য্যের অঙ্গ থেকে জাত এক ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সৃষ্ট হ'ন—যাঁদের শাম্ব এখানে (ভারতবর্ষে) আনয়ন করেন; তাঁরা জগৎপূজ্য,—অতুল গৌরবের অধিকারী"—(মর্ম্মানুবাদ)।

উপসংহারে একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ না করলে আলোচনা অপূর্ণ থাকবে। সৌর ধর্ম্ম ভারতবর্ষে কি কোনও বিশিষ্ট দর্শনের জন্ম দিয়েছিল? ভারতবর্ষে ধর্ম্মের সঙ্গে দর্শনের যোগাযোগ অতি নিবিড়। তাই দেখা যায়—যে ধর্ম্মমতই যখন শক্তিশালী হ'য়েছে সে ধর্ম্ম তখনই দর্শনের ভিত্তিতে নিজেকে দাঁড় করিয়ে শক্তির বনিয়াদকে পাকা করবার দিকে মন দিয়েছে। শৈব বৈষ্ণব শাক্ত প্রভৃতি সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই দর্শনগুলির সাধারণ ভিত্তি হ'য়েছে মোক্ষশাস্ত্রের প্রস্থানত্রয়—উপনিষদ বেদান্ত ও গীতা। বেদান্ত মতকেই প্রয়োজনমত সাম্প্রদায়িক রংএ রঞ্জিত করে সম্প্রদায়গুলি নিজেদের সম্প্রসারিত করেছে এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণকে ঠেকিয়েছে। সৌর সম্প্রদায়ের তেমন কোনও দার্শনিক মত গড়ে উঠেছিল কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। কেননা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দার্শনিক গ্রন্থাদির যেমন সন্ধান পাওয়া গেছে সৌর সম্প্রদায়ের তেমন পাওয়া যায়নি। তবে উপাদাম যেটুকু পাওয়া যায় তার থেকে অনুমান হয় যে

এই জাতীয় একটি সৌর বেদান্ত মত আভাষে ইঙ্গিতে ক্রমশঃ গড়ে উঠেছিল। এখানে প্রমাণগুলির শুধু উল্লেখ করব—বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। বৈদিক সাহিত্যে সূর্য্যের যে স্বরূপ বর্ণনা পাই তাতে সর্ব্বোপরি সূর্য্যকে বিশ্বজগতের আত্মার সঙ্গে অভিন্ন রূপে দেখাবার নিদর্শন উপস্থিত। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে সূর্য্য জগতের স্থাবর জঙ্গম সব কিছুর আত্মা (১।১১৫।১; ৭।৬০।২)। সূর্য্যকে বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলে বর্ণণা করেছেন কাত্যায়ন—তাঁর ঋগ্বেদ অনুক্রমণীতে। তিনি বলেছেন "চরাচরের দেবতা একজন মাত্র—তিনি হলেন বিশ্বাত্মা বা মহান্ আত্মা; কেউ কেউ বলেন তিনিই সূর্য্য আবার কেউ বা বলেন সূর্য্যই তিনি।" তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৮) বলা হয়েছে যে মানুষের অন্তরে যিনি বাস করেন এবং সূর্য্যে যিনি বাস করেন—এই পুরুষ এক এবং অভিন্ন। ঈশোপনিষদে (১৫-১৬) সূর্য্যকে বিশ্বাত্মা পরমপুরুষের আধার বলে বর্ণণা করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩।১৭।৭) ঘোর আঙ্গিরস দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঋগ্বেদের যে ঋকৃটির আংশিক আবৃত্তি শোনাচ্ছেন তাতে বলা হয়েছে "আমাদের হৃদয়স্থ জ্যোতির সহিত যা' অভিন্ন, সেই আদিত্যস্থ অজ্ঞানবিনাশক সর্ব্বোৎকৃষ্ট জ্যোতিকে দর্শন করে—আমরা দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয়েছি।" সূর্য্যের মধ্যস্থিত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে এখানে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্নরূপে দেখা হয়েছে। বহু পরবর্ত্তী কালে রচিত আনন্দগিরির শঙ্কর-বিজয় গ্রন্থে (জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন সম্পাদিত সংস্করণ—ত্রয়োদশ প্রকরণ পৃঃ ৯৪-১০১)—শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে সৌরগণের বিচার প্রসঙ্গে সৌরগণকে মোটামুটি বেদান্তমত প্রকাশ করতে দেখি। তাঁরা শঙ্করকে স্পষ্টই বলেছেন আমরা সূর্য্যের সর্ব্বাত্মত্ব এবং

পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করতেই এসেছি (আভ্যাং হি সূর্য্যস্য সর্ব্বাত্মত্বং অস্যৈব চ পরব্রহ্মত্বং চ প্রতিপাদিতং ভবতি)। কৃষ্ণমিশ্রের প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নামক রূপক নাটকে দেখা যায় বৈষ্ণব শৈব সৌর প্রভৃতি আস্তিক সম্প্রদায় ষড়দর্শনের সাহায্যে নাস্তিকতার বিরুদ্ধে অভিযান করেছে (বাসুদেব শর্ম্মা সম্পাদিত সংস্করণ, বোম্বাই ১৯১৬, পঞ্চমাঙ্ক পৃঃ ১৭২)। সর্ব্বোপরি, একথা উল্লেখযোগ্য, কৃষ্ণ উপনিষদ গোপালতাপণী উপনিষদ, শিব উপনিষদ, দেবী উপনিষদ প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালে রচিত সাম্প্রদায়িক উপনিষদ গ্রন্থের ন্যায় একখানি "সূর্য্য-উপনিষদ্"ও রচিত হয়েছিল। সুতরাং এ অনুমান স্বাভাবিক যে সৌরধর্ম্মেও সূর্য্য ও বিশ্বাত্মার অভেদ কল্পনার ভিত্তিতে একটি বেদান্তমত ক্রমশঃ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু এর পরিণতির ইতিহাস আমাদের অজানা। হয়তো বা, এর উপযুক্ত পরিণতির অভাবেই সৌরধর্ম্ম ক্রমশঃ দুর্ব্বল হয়ে—লুপ্তপ্রায় হয়েছে।

হিন্দুগৃহস্থের আদর্শ

আমরা হিন্দুধর্ম লইয়া গর্ব করি—কথায় কথায় বেদ উপনিষদ গীতার দোহাই দিয়া থাকি। অথচ হিন্দুধর্মের লক্ষণ কি—সাধারণ হিন্দুর অবশ্য প্রতিপাল্য আচার অনুষ্ঠান কি—ইহাদের তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য কি এ সম্বন্ধে শিক্ষিত সম্প্রদায়েরও ধারণা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ, অস্পষ্ট এবং অনেকক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। ইহার প্রধান কারণ

বেশীর ভাগ লোকই ইদানীং ধর্মের বিশেষ কোনও ধার ধারেন না—বিবাহ ও মৃত্যু উপলক্ষ্যে নামমাত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়াই অধিকাংশ লোক হিন্দুত্বের মর্যাদা রক্ষা করেন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত ধর্মভীরু—ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি মোটামুটি শ্রদ্ধা যাঁহাদের আছে, তাঁহারা অশিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত পৌরোহিত্যব্যবসায়ীর উপর কাজের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত মনে সস্তায় কাজ সারেন। অনেকে ধর্মের নামে আড়ম্বরকে প্রশ্রয় দেন এবং নানা উচ্ছৃঙ্খলতা ও অশিষ্টতাকেও ধর্মের আবরণে আবৃত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পান। ফলে আমরা অনেকক্ষেত্রেই দেখি, নিছক বহিরঙ্গের দিকে ঝোঁক অথবা সুগভীর ঔদাসীন্য বা স্পষ্টতঃ অশ্রদ্ধা। এই অবস্থার আসল কারণ ধর্মানুষ্ঠান ও তাহার রহস্য বিষয়ে নিদারুণ অজ্ঞতা। ইহা দূর করিবার প্রধান উপায় ধর্মশিক্ষার সুব্যবস্থা—আধুনিক রুচি ও মনোভাবের অনুসরণে ধর্মের আদর্শের বহুল বিশ্লেষণ ও প্রচার—কেবল গীতা, উপনিষদ্, দর্শন প্রভৃতির অত্যুচ্চ অনধিগম্যপ্রায় আদর্শের কথা নয়—নিত্যনৈমিত্তিক কর্মের বিস্তৃত বিবরণ ও রহস্য নিরূপণ।

সত্য বটে, হিন্দুর চরমলক্ষ্য জন্মমৃত্যুর বন্ধন হইতে মুক্তি—অমৃতত্বলাভ। কিন্তু তাহা ত ইচ্ছামাত্রেই সম্ভবপর নয়। সেজন্য দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন। সে সাধনার অধিকার লাভের ক্ষমতাও সকলের নাই। বস্তুতঃ সেই অধিকার অর্জনের জন্য যে সমস্ত গুণের প্রয়োজন সেগুলি সাধারণ গৃহস্থের জন্য নির্দিষ্ট আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই আহৃত হইয়া থাকে। তাই হিন্দুশাস্ত্রে গার্হস্থ্যধর্মের অশেষ প্রশংসা। এক হিসাবে গার্হস্থ্যাশ্রমই মুখ্য—যেমন মাতাকে অবলম্বন করিয়াই জীবজগৎ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ গার্হস্থ্যাশ্রমকে আশ্রয় করিয়াই হিন্দুর চতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠিত। ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও

ভিক্ষু সকলকেই গৃহস্থের সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই সাহায্য না পাইলে কোন আশ্রমই টিকিতে পারে না। তাই রুচিনামক মুনি নির্মম, নিরহঙ্কার, সংযত অবস্থায় যখন পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে-ছিলেন তখন পিতৃপুরুষগণ তাঁহাকে গার্হস্থ্য ধর্ম অবলম্বন না করার জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। বিবাহ ও গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ অতিদুঃখ ও অধোগতির কারণ, মুক্তির পরিপন্থী—রুচি এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিলে পিতৃপুরুষগণ তাহা খণ্ডন করেন। তাঁহারা বলেন—'এইরূপ কর্মের মধ্য দিয়াই জ্ঞানলাভ করা যায়—শুধু সংযমের মধ্য দিয়া নয়। তুমি মনে করিতেছ—দারপরিগ্রহ না করিয়া তুমি নিজেকে পাপমুক্ত করিতেছ কিন্তু কর্তব্যকর্মে অবহেলা করার জন্য তুমি যে পাপলিপ্ত হইতেছ তাহা তুমি বুঝিতেছ না।' পিতৃপুরুষের উপদেশে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া রুচি বিবাহ করেন এবং প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হন। শ্রাদ্ধব্যবস্থার মধ্য দিয়াও এই গার্হস্থ্যধর্মেরই প্রশংসা করা হইয়াছে। কেবল মৃত্যু উপলক্ষ্যেই শ্রাদ্ধের বিধান নয়—পুত্রোৎসব, গৃহপ্রবেশ, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি গৃহস্থের অভ্যুদয়সূচক প্রত্যেক কর্ম উপলক্ষ্যেই আভ্যুদয়িক বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা আছে; গৃহস্থ তাহার আনন্দের সময় পিতৃপুরুষকে স্মরণ করে—পিতৃপুরুষও বংশধরের আনন্দে আনন্দলাভ করেন। তাই শ্রাদ্ধকালীন প্রার্থনা—'গোত্রং প্রবর্ধতাং নিত্যম্'—'আমার বংশবৃদ্ধি হউক।' কেহ বিবাহ না করিলে বা অপুত্রক হইলে পিতৃপুরুষ পিণ্ডলোপের আশঙ্কায় ব্যথিত হন। অপুত্রক দুষ্মন্তের মুখ দিয়া কালিদাস পিতৃপুরুষের এই দুঃখের বিবরণ দিয়াছেন। দুষ্মন্ত বলিতেছেন—আমি তর্পণকালে পিতৃপুরুষকে জল দান করি, তাহা তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে পান করিতে পারেন না। আমার পরে এই বংশে আর তর্পণ করিবার লোক থাকিবেনা—আমার দেওয়া জলের অনেকটাই

পিতৃপুরুষদের এই দুঃখজনিত অশ্রু ধৌত করিতে ব্যয় হইয়া যায়। বাকী যেটুকু থাকে সেইটুকুই তাঁহারা পান করিতে পারেন। এই জন্যই প্রাচীন শাস্ত্রে ও সাহিত্যে অপুত্রকের এত নিন্দা—পুত্রপ্রাপ্তির আনন্দের এত বর্ণনা। গৃহস্থাশ্রম আমাদের সমাজে কি স্থান অধিকার করিত এই সকল বিষয় তাহারই স্পষ্ট পরিচয় দেয়।

এই গৃহস্থাশ্রমের বিধিনিষেধগুলি আমাদের ধর্মের মুখ্য অঙ্গ। কেবল ঈশ্বরারাধনার কথাই ইহাদের একমাত্র বিষয় নয়—মানবসমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনই ইহাদের প্রধান লক্ষ্য। সকলে যাহাতে প্রকৃত মানুষ হইয়া উঠিতে পারে—দেশের ও সমাজের মঙ্গলসাধন যাহাতে নিজ নিজ জীবনযাত্রার অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গড়িয়া উঠে সে দিকে শাস্ত্রকারগণের প্রখর দৃষ্টি ছিল। গৃহস্থের পক্ষে কেবল ধর্মারাধনা নিন্দনীয়—তাহাকে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সমান সেবা করিতে হইবে—ইহাদের একটিকে মাত্র যে অবলম্বন করিবে সে অতি অধম :

ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যা
যোহ্যেকসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ ।

গৃহস্থের দায়িত্ব অতিগুরু—সে দায়িত্ব অবহেলা করিয়া ধর্মকার্য করিলেও তাহাকে পাপভাগী হইতে হইবে। পক্ষান্তরে শত অকার্য করিয়াও তাহাকে পিতামাতা, স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করিতে হইবে। এ অকার্যের ফল তাহাকে একাই ভোগ করিতে হইবে ; যাহাদের জীবনরক্ষার্থ ইহা করিতে হইয়াছে তাহারা ইহার অংশ গ্রহণ করিবে না। এই গুরু দায়িত্ব বহনে যে শিক্ষা—যে সংস্কার সে লাভ করিবে তাহাই তাহাকে উন্নততর জীবনের উপযুক্ত করিয়া তুলিবে।

গৃহস্থের কর্তব্য কর্ম তিনভাগে বিভক্ত—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। যাহা অবশ্য কর্তব্য তাহাই নিত্য কর্ম—ইহা না করিলে প্রত্যবায়-

ভাগী হইতে হয়। পুত্রবিবাহাদি বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে যে কার্য তাহা নৈমিত্তিক। আর কোনও কামনা বা ফললাভের উদ্দেশ্যে ত যে কর্ম তাহা কাম্য কর্ম—যেমন ব্রত প্রভৃতি। এই ত্রিবিধ কর্মেরই মূল লক্ষ্য সংযম ও শৃঙ্খলার অনুশীলন,—কায়, বাক্য ও মনের শুচিতাসম্পাদন, সত্ত্বগুণের বিকাশ ও চিত্তের একাগ্রতাসাধন। এই সব গুণ অর্জন করিতে না পারিলে মানুষ কখনও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

এই সব কর্মের ব্যবস্থা কেবল ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের জন্য নহে—সকল সম্প্রদায়ের—সকল অবস্থার লোকের জন্যই বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা আছে—কাহাকেও উপেক্ষা করা হয় নাই। নিজ নিজ পরিবেশের মধ্যে যাহাতে সকলেই জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ দৈনন্দিন সন্ধ্যাবন্দনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পূজা পার্বণ ব্রত উপবাস প্রভৃতি সকল কর্মেই সকলের অধিকার আছে। দুঃখের বিষয় বর্তমানে আমরা সকলেই আদর্শ-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছি—শাস্ত্রের তাৎপর্য ভুলিয়া বিষম বিপাকে পড়িয়াছি—সমাজের মধ্যে নানা বিকৃতি দেখা দিয়াছে। প্রাচীন যুগে জাতিভেদ ছিল বটে—কিন্তু সর্বত্র বা সর্বকালে তাহার উগ্রতা ছিল না। রামায়ণের শবরী উপাখ্যানে বা গুহক চণ্ডালের প্রসঙ্গে তাহাদের অস্পৃশ্যতার বা নীচতার কোনও উল্লেখ নাই। পক্ষান্তরে একই আত্মা সর্বদেহে বিরাজ-মান বলিয়া সর্বভূতে সমদৃষ্টির উপদেশ ত সর্বসম্মত। তাহা ছাড়া, নীচ বলিয়া প্রসিদ্ধ জাতির লোকও যে ধর্মবিষয়ে উন্নত হইতে পারে এবং উচ্চবর্ণের লোকও ধর্মবিষয়ে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিতে পারেন তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় মহাভারতের বনপর্বের ধর্মব্যাধ উপাখ্যানে। পরবর্তী যুগের অবস্থা যতই আপত্তিজনক হউক না কেন একথা অবশ্যই

স্বীকার করিতে হইবে যে সে সময়েও সর্বজাতির ধর্মাচরণের ও জীবন-যাত্রার প্রণালী মোটামুটি একই ভাবে ব্যবস্থিত ছিল।

যাহা হউক, এখন আবার প্রস্তুতের অনুসরণ করা যাউ। হিন্দুর অনুষ্ঠেয় কর্তব্যসমূহের বিধিব্যবস্থা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় সাধারণ গৃহস্থের জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি ব্যাপারের সহিত ধর্মের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হইয়াছে—সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা দুষ্প্রবৃত্তি দুর্বলতাকে উপেক্ষা না করিয়া সেগুলিকেও যথাসম্ভব ধীরে ধীরে বিশোধিত করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রিতে পুনরায় শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত—জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের জীবনের যাহা কিছু কর্ম সে সকলের মধ্যেই ভগবানকে স্মরণ করিবার বিধান আছে। প্রত্যেক গৃহস্থ এইরূপ বলিতে শিখুক—'হে ভগবন্, আমি প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত যাহা কিছু করি তাহা যেন তোমারই পূজা বলিয়া গণ্য হয়। আমি ধর্ম কি তাহা জানি কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই—অধর্ম কি তাহাও জানি কিন্তু তাহা হইতে আমি নিবৃত্ত হইতে পারি না। আমি অসহায় ও দুর্বল। অতএব, হে অন্তর্যামি, হৃষিকেশ, তুমি আমাকে যেমন ভাবে চালাইবে আমি সেইভাবে চলিব।' ভগবানকে যে কোনও নামে ডাকা হউক না কেন তাহাতে কোনও আপত্তি নাই। তিনি ত সর্বাত্মক। কেহ তাঁহাকে শিব বলে, কেহ বলে বিষ্ণু, কেহ বলে শক্তি। আবার তিন নামেই তাঁহাকে পূজা করা যায়। শৈব বিষ্ণুপূজা করিতে দ্বিধাবোধ করেন না, বৈষ্ণবের পক্ষেও শক্তিপূজা নিষিদ্ধ নহে। বস্তুতঃ এ বিষয়ে হিন্দুর দৃষ্টি অতি উদার। শাক্তের ঘরে নিয়মিত শালগ্রাম শিলার পূজা হইতেছে—বৈষ্ণবের ঘরে সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হই-

তেছে। এদিকে গোঁড়ামির কোন বিধান নাই। আসল লক্ষ্য,নিয়মিত ভগবানের নাম করা—প্রতি কার্যে তাঁহাকে স্মরণ করা। তবে যখন যে নামে খুসি তখন সে নামে ডাকিব এরূপ হইলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়—একাগ্রতার হানি হয়। তাই এক একজন এক এক নাম মুখ্যরূপে জীবনের উপাস্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহারই নাম মন্ত্রগ্রহণ। গৃহীত মন্ত্র প্রতিদিন নিয়মিতভাবে জপ করিতে হইবে—প্রতি কর্মে সেই নাম গ্রহণ করিতে হইবে। প্রতিদিন এই নাম লইয়া সূর্যোদয়ের পূর্বে শয্যাত্যাগ করিয়া নির্দিষ্ট সময়ে স্নান, আহারাদি কর্ম পবিত্রভাবে সম্পাদন করিতে হইবে। সমস্ত জীবনকে সংযতভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে—উচ্ছৃঙ্খলতার স্থান সেখানে নাই। আহার-বিহারে সংযম অপরিহার্য—'যুক্তাহার বিহারঃ স্যাদ্ যুক্তচেষ্টশ্চ ভারত', যখন তখন যেখানে সেখানে যা-তা খাওয়া সর্বথা নিষিদ্ধ—স্বপাকই সর্বথা প্রশস্ত। এইসব দেখিয়া শুনিয়াই একবার একজন খ্রীষ্টান এক কাগজে মন্তব্য করিয়াছিলেন যে হিন্দুধর্ম একটা ধর্ম নয়—ইহার মধ্যে আছে কতকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম। এ কথা হিন্দুধর্মের গৌণ প্রশংসা। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই হিন্দুশাস্ত্রের লক্ষ্য।

কিন্তু সকলের পক্ষে ত এইরূপ সংযত নিয়মনিষ্ঠ জীবন যাপন করা সম্ভবপর নয়। সাধারণ মানুষ চায় উৎসব, আড়ম্বর, আনন্দ। তাই তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে. বসন্তোৎসব দোলযাত্রা, শস্যোৎসব নবান্ন, পিষ্টকোৎসব অনন্তব্রত প্রভৃতির মধ্য দিয়া আনন্দ করিবার যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে। এমন কি, দুর্গোৎসবের প্রতিমা বিসর্জনের সময় যে উদ্দাম নৃত্যগীতের প্রচলন আছে সেই শারদোৎসবকেও মানিয়া লওয়া হইয়াছে। তবে ভগবানের নাম স্মরণ, নাম গান ও দেবতার পূজার সাহায্যে আনন্দের উদ্দামতাকে যথাসম্ভব সঙ্কুচিত ও সংশোধিত করিবার

চেষ্টা করা হইয়াছে। ইহাকে কখনই আদর্শ বলিয়া গণ্য করা হয় নাই। সাত্ত্বিক পূজাই আদর্শ—ইহাতে ধ্যান ও জপই মুখ্য অঙ্গ। আড়ম্বরবহুল উৎসব-মুখর রাজসিক বা তামসিক পূজা নিম্নস্তরের হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। তাহাও মানুষকে ক্রমশ উচ্চস্তরে উন্নীত করে। ইচ্ছা করিলেই মানুষ প্রথমেই উপরের সোপানে উঠিতে পারে না। তাই সকল মানুষের পক্ষে একরূপ বিধান সম্ভবপর নয়।

এইবারে হিন্দুধর্মের সামাজিক দিকের কথা কিছু বলিয়া আপাতত এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্বেই বলিয়াছি হিন্দুর গার্হস্থ্য ধর্ম কেবলমাত্র তাঁহার আত্মোন্নতি সাধনের উপদেশ দেয় নাই আত্মোন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মঙ্গলসাধনকেও ধর্মের অঙ্গীভূত করিয়াছে। কেবলমাত্র মানুষের সুখ সুবিধা বিধানই তাহার ধর্ম নহে, প্রাণিমাত্রের দুঃখ দূর করা ও সুখের ব্যবস্থা করা প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য কর্মের মধ্যে গণ্য। প্রতিদিনের আচরণীয় কর্মের মধ্যেও শাস্ত্রকারগণের এ দিকে লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে মাঠে-ঘাটে মলত্যাগ করারই ব্যবস্থা। কিন্তু যাহাতে জনসাধারণের এ জন্য কোনও অসুবিধা না হয় সে দিকে লক্ষ্য থাকা দরকার। তাই সাধারণের ব্যবহার্য স্থানগুলিকে এ কার্যের জন্য নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। প্রতিদিনের অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ অন্যতম। নৃযজ্ঞ হইতেছে অতিথি সৎকার এবং ভূতযজ্ঞ হইতেছে প্রাণীদের খাদ্যপ্রদান। গৃহস্থ যখন আহার করিবেন তখন তাঁহার খাদ্যের কিছু অংশও প্রাণীদের জীবনধারণার্থ রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে—ইহারই নাম 'শতান্ন' (প্রাণিণাং প্রাণরক্ষার্থং শতমন্নং পরিত্যজেৎ)। বস্তুতঃ গৃহস্থের অন্নের আশায়ই গৃহস্থের বাড়ীতেও আশে পাশে বিশেষ বিশেষ পশুপক্ষী বসবাস করে। গৃহস্থ তাহাদের না দেখিলে কে দেখিবে? ইহা ছাড়া নানা উপলক্ষ্যে কেবল উপকারী

গরুর সেবার ব্যবস্থাই যে আছে এমন নহে কাক ও শিবাকে খাদ্যবস্তু প্রদানের নিয়মও আছে। সমস্ত সমাজের লোকের উপকারের জন্য পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা, কূপ প্রতিষ্ঠা, বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, জীর্ণ মন্দিরের সংস্কার প্রভৃতি প্রত্যেক সম্পন্ন গৃহস্থের পক্ষে অবশ্য অনুষ্ঠেয় পুণ্য কর্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রতি ধর্মকার্যের একটা অপরিহার্য অঙ্গ ব্রাহ্মণকে কিছু দান করা। বিভিন্ন বস্তুদানের নানারূপ মাহাত্ম্য বর্ণনায় শাস্ত্রীয় গ্রন্থগুলি মুখর হইয়া উঠিয়াছে। কেবল দানের বিধিব্যবস্থা লইয়া স্বতন্ত্রভাবে বহু গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। প্রাচীন কালের রাজারাজরাদের দেওয়া ভূমিদানের নিদর্শন অসংখ্য তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। কেহ কেহ মনে করেন লোভী স্বার্থপর ব্রাহ্মণেরা নিজেদের অর্থাগমের পথ সুগম করিবার জন্য এইরূপ দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে অব্রাহ্মণদের জন্যই এ ব্যবস্থা নয়—ব্রাহ্মণকেও অন্য জাতির মত ধর্মকার্য করিতে হয়—দান ধ্যান তাঁহারাও করিতে ত্রুটি করেন না। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণকে দান করিবার পদ্ধতি ভারতের জ্ঞানবিজ্ঞানের ও সর্বপ্রকার সংস্কৃতির পরিপোষণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। প্রধানতঃ ইহারই আনুকূল্যে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিশ্চিন্তমনে শাস্ত্রালোচনা করিতে পারিতেন—আহার বাসস্থান দিয়া বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্রগণের অধ্যাপনা করা সম্ভবপর হইত এবং এখনও হয়। সেইজন্য পণ্ডিত ও শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণকে দান করাই প্রশস্ত—ইহাই শাস্ত্রের বিধান—ইহা অবশ্যই লক্ষ্য করিতে হইবে। সত্য বটে এ বিধানের ব্যতিক্রমই আজকাল একরূপ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছে—তবে তাহাতে মূল বিধানের দোষ দেওয়া চলে না।

একজনে যাহা উপার্জন করিবে দশ জনে মিলিয়া তাহা ভোগ করিবে ইহাই ছিল প্রাচীন আদর্শ। ভারতবাসীর চিরন্তন প্রার্থনা—

ধনং চ নো বহু ভবেদতিথীংশ্চ লভেমহি।
যাচিতারশ্চনঃ সন্তু মা চ যাচিষ্ম কঞ্চন ॥

"আমার যেন প্রচুর ধনলাভ হয়—আমার কাছে যেন অতিথি আসে-প্রার্থী আসে—আমার যেন কাহারও নিকট প্রার্থী হইতে হয় না।"

বৈদিক মন্ত্রের মধ্যেও এইভাবেরই আভাস পাওয়া যায়। বৈদিক ঋষি স্পষ্টই বলিয়াছেন—যে কাহাকেও না দিয়া একা অন্ন গ্রহণ করে সে ঘোর পাপী (নার্যমনং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘোভবতি কেবলাদী)। ভাগবতের মতে উদরপূর্ত্তির জন্য যতটা দরকার তাহার বেশী সঞ্চয় করিয়া রাখিলে চৌর্যাপরাধে অপরাধী হইতে হয়।

তাই একজনের উৎসবে দশজনের উৎসব, একের আনন্দে দশের আনন্দ—ইহাই ছিল প্রাচীন ব্যবস্থা। গ্রামের জমিদারের বাড়ী দোল দুর্গোৎসব হইত—সমস্ত গ্রামবাসী তাহাতে নিমন্ত্রিত হইয়া যোগদান করিত—তাহাকে নিজেদের উৎসব বলিয়া মনে করিত। 'উৎসব প্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও যদি ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়, শুভ উৎসব যেন একান্ত ক্ষুণ্ণ হয়।'*—এই হইল প্রাচীন আদর্শের অবিকল চিত্র।

সমাজ ও বিশ্বের মঙ্গল কামনা হিন্দুর সমস্ত উপাসনার অন্তরালে বর্তমান। 'গৃহের এবং পল্লীর ক্ষুদ্র সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অনুভব করিবার জন্য হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছে।'† সমস্ত জগতের সকল বস্তুর সহিত প্রত্যেক মানুষের মধুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিরাজমান এইরূপ মনোভাব সৃষ্টি করাই ছিল প্রাচীন শাস্ত্রের আদর্শ। বৈদিক মন্ত্রে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, আকাশ, জল, ওষধি বনস্পতি সকলের শান্তি কামনা করা হইয়াছে—সকলের সহিত মৈত্রীর

* বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর—'শুভ উৎসব।'

† রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্বদেশী সমাজ।

আকাঙ্ক্ষা অভিব্যক্ত হইয়াছে—স্পষ্টভাবে প্রার্থনা করা হইয়াছে—আমি যেন মিত্রের দৃষ্টিতে সকলকে দেখিতে পারি—দশ দিক, যেন আমার মিত্র হয়। পরবর্তী যুগেও দেবতার নিকট সমস্ত বিশ্বের মঙ্গল কামনা করা হইয়াছে—সমস্ত জগতের প্রতি দেবতার প্রসাদ ভিক্ষা করা হইয়াছে—সমস্ত সংসারকে রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে।

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥

সমস্ত লোক সুখী হউক—কেহ যেন দুঃখপ্রাপ্ত না হয়, ইহাই হইল সাধারণ কামনা। এই মনোভাবেরই চরম পরিণতি দেখা যায় রাজা রন্তিদেবের চরিত্রে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন—আমি পরমগতি চাহি না—আমি যোগসিদ্ধি চাহি না—জন্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করি না—সমস্ত প্রাণীর দুঃখ আমি বরণ করিয়া লইতে চাই—যাহাতে সকলে দুঃখশূন্য হইতে পারে।

আজ হিন্দু জনসাধারণ তাহার এই প্রাচীন উচ্চ আদর্শের কথা ভুলিতে বসিয়াছে—সে তাহার বিচিত্র ধর্মানুষ্ঠান সম্পূর্ণ ত্যাগ না করিলেও এ বিষয়ে তাহার আগ্রহ মন্দীভূত হইয়াছে। সাধারণ জীবনযাত্রার মধ্যে—ছোটখাট অনুষ্ঠানের মধ্যে যে মহনীয় আদর্শের ইঙ্গিত পাওয়া যায় আজ কে তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিবে—কে তাহার দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করিবে? দেশের প্রাচীন জীবনধারা ফিরিয়া আসিবে না সত্য—দেশের ধর্মানুষ্ঠানের খুঁটিনাটিও আর প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তথাপি এই প্রাচীন আদর্শ বিস্মৃত হইলে চলিবে না—এই আদর্শের স্মৃতিও আমাদিগকে নূতন উৎসাহে উৎসাহিত করিবে—প্রচলিত ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে নবীন প্রাণ সঞ্চারিত করিবে—আমাদিগকে প্রকৃত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিবে।

দের বৈজ্ঞানিক অংশ সম্পূর্ণরূপেই দর্শন শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই বৈজ্ঞানিক অংশের সুস্পষ্ট ধারণা ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদীয় মূল তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে সাফল্যলাভ করা অসম্ভব।

পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞান যেমন প্রধানভাবে পদার্থ বিজ্ঞান (Physics) ও রসায়ন বিজ্ঞানের (Chemistry) উপর প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানও সেইরূপ সম্পূর্ণরূপে দর্শন শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনেকের ধারণা আয়ুর্ব্বেদ অথর্ব্ববেদের উপাঙ্গ হইলেও ইহা কখনও মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্র নহে, ইহার সমর্থনে তাঁহারা চরকের বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন যে, "—ধাতুসাম্য-ক্রিয়া চোক্তা তন্ত্রস্যাস্য প্রয়োজনম্।" সুশ্রুতেও বলা হইয়াছে—"ইহ খল্বায়ুর্ব্বেদপ্রয়োজনং ব্যাধ্যুপসংসৃষ্টানাং ব্যাধি পরিমোক্ষ, স্বস্থস্যরক্ষণং চঃ" যেদিক দিয়াই বিচার করা যাউক না কেন ধাতুসাম্যই যে আয়ুর্ব্বেদের প্রধান প্রয়োজন তদ্বিষয়ে অস্বীকার করিবার কোন হেতু নাই। কিন্তু ধাতুসাম্য প্রধান প্রয়োজন হইলেও আয়ুর্ব্বেদ প্রসঙ্গক্রমে মোক্ষের স্বরূপ ও মোক্ষ লাভের উপায়-সমূহ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহা আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। এইরূপ করিবার কারণও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। প্রথমতঃ বিচার করা আবশ্যক এই ধাতুসাম্য কাহার প্রয়োজন। মৃত শরীরের কেহই চিকিৎসা করে না; একমাত্র চেতনাবান জীবই আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎসিতব্য পুরুষ। সুতরাং যাহার চিকিৎসা করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রকৃত স্বরূপ ও প্রকৃতি

প্রভৃতি অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কোন চিকিৎসা শাস্ত্র বা জীবন-বিজ্ঞান জীবের প্রকৃত স্বরূপ বা সৃষ্টি রহস্যকে উপেক্ষা করিয়া তাহার চিকিৎসূত্র বা উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে না। যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান এই একান্ত অপরিহার্য্য তত্ত্বকে গৌণ বা উপেক্ষা করিয়া আপন সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনের চেষ্টা করে তাহা কখনই জীবন-বিজ্ঞান নহে। দার্শনিক মাত্রেই অবগত আছেন যে, সৃষ্টি-প্রবাহের মধ্যে দুইটি মূল ভাব বিদ্যমান আছে; উক্ত দুইটি ভাব যথাক্রমে ব্যষ্টি ও সমষ্টি ভাব। এই ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে এক বিচিত্র সাম্যভাব বিদ্যমান থাকিয়া দুজ্ঞেয় ও জটিল সৃষ্টিতত্ত্বকে শৃঙ্খলাযুক্ত ও মধুময় করিয়া তুলিয়াছে—এই চিরন্তন সাম্যভাবকে অবলম্বন করিয়া দুজ্ঞেয় সৃষ্টিতত্ত্বের জটিল রহস্য উদ্‌ঘাটন করাই দর্শন শাস্ত্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। বাহ্য প্রকৃতির সহিত আন্তর প্রকৃতির সামঞ্জস্য এই সাম্যভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সৌর জগতের অনন্ত কোটি গ্রহ উপগ্রহের মধ্যে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে শৃঙ্খলা ও তত্ত্ব একটি স্বতন্ত্র ব্রহ্মাণ্ডেও সেই শৃঙ্খলা ও তত্ত্ব; আবার একটি ব্রহ্মাণ্ডের যে তত্ত্ব ও শৃঙ্খলা একটি মানব দেহেও সেই তত্ত্ব ও শৃঙ্খলা সমভাবে বিরাজিত থাকে। ইহা সৃষ্টিতত্ত্বের মূল রহস্য। সুতরাং জীবদেহের সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞানেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্বে পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হয় এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি জ্ঞান হইতেই জীবদেহের সৃষ্টিতত্ত্বের জ্ঞান হয়।

এই জীবদেহের সৃষ্টিতত্ত্বের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া আয়ুর্ব্বেদ ব্যষ্টি জগতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও শৃঙ্খলার সন্ধান করিয়াছেন, এবং এইরূপে বাহ্যজগতের তত্ত্ব ও শৃঙ্খলার মধ্যে ব্যষ্টিজীবের তত্ত্ব ও শৃঙ্খলার সমন্বয় করিয়াছেন—ব্যষ্টি জীব ও সমষ্টি জীবের—এবং জীবদেহ ও জড়-জগতের মধ্যে যে অপূর্ব্ব রহস্যময় সাম্যভাব বিদ্যমান আছে তাহাকে ভিত্তি

করিয়াই আয়ুর্ব্বেদের পাঞ্চভৌতিক তত্ত্ব, ত্রিদোষ তত্ত্ব ও ওরসবীর্য্য-বিপাক-প্রভাব প্রভৃতি মূল তত্ত্বগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার করিয়া অপূর্ব্ব জীবন বিজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে আয়ুর্ব্বেদ বা জীবন বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপেই দর্শন শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। জড় ও চেতনের বিচিত্র সমবায়ে যে জীব উৎপন্ন হয় সেই জীবের প্রকৃত স্বরূপ অবধারণ প্রাক্কালে চরক বলিয়াছেন—

"সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ ত্রয়মেবৎ ত্রিদণ্ডবৎ।
লোকস্তিষ্ঠতি সংযোগাত্তত্র সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্॥
স পুমাংশ্চেতনং তচ্চ তচ্চাধিকরণং স্মৃতম্"।

এই চিকিৎসিতব্য পুরুষের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন— "পঞ্চমহাভূত শরীরি সমবায়ঃ পুরুষঃ।"

অতএব দেখা যাইতেছে পুরুষকে বুঝিতে হইলে সত্ত্ব, আত্মা শরীর অথবা পঞ্চমহাভূত, ভৌতিক ইন্দ্রিয়গ্রাম, আত্মা এবং উহাদিগের বিচিত্র সমবায় প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বগুলি সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আয়ুর্ব্বেদের চিকিৎস্য পুরুষকে বিশ্লেষণ করিলে প্রধানতঃ দুইটি উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়—উহাদিগের একটি জড় বা পাঞ্চভৌতিক উপাদান এবং অপরটি জড়াতিরিক্ত চেতন অংশ। এই জড় ও চেতনের বিচিত্র সমবায়েই জীবের উৎপত্তি—এই জড় ও চেতনের বিচিত্র সমবায়ের অনুকূল ও প্রতিকূল বিষয়ের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করিয়া উহাদিগের সাহায্যে ধাতুসাম্যের প্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া আয়ুর্ব্বেদ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকৃত পূর্ণাঙ্গ জীবন বিজ্ঞানরূপে দর্শন শাস্ত্রের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি প্রধান প্রধান ভারতীয় দর্শন-সমূহের ন্যায় আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিক অংশ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর দর্শন শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত অথবা ইহা উল্লিখিত প্রধান দর্শন শাস্ত্রসমূহের কোন একটি বা একাধিক দর্শন শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত তদ্বিষয়ে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে আয়ুর্ব্বেদ দর্শন মূলতঃ সাংখ্য-সম্মত পরিণামবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তর্ক বা যুক্তিশাস্ত্র হিসাবে ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রের সহিত প্রধান ভারতীয় দর্শনসমূহের যে সম্বন্ধ আয়ুর্ব্বেদের সহিতও ন্যায় এবং বৈশেষিকের সেই একই সম্বন্ধ; তদতিরিক্ত কোন সম্বন্ধ কল্পনা করিবার কোন হেতু নাই। ইহা সত্য যে চরক-সংহিতার সূত্র স্থানে ন্যায় শাস্ত্রের পরিভাষাসম্মত দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামক পদার্থের উল্লেখ আছে এবং ইহা হইতে অনেকেই মনে করেন যে আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিক অংশ প্রধান ভাবে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু চরক-সংহিতার শারীর স্থানের কতিধা পুরুষীয় নামক অধ্যায়ে যে সৃষ্টিক্রম ও মোক্ষের স্বরূপ ও মোক্ষ-লাভের উপায় প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপেই পরিণামবাদের প্রক্রিয়ার সহিত অভিন্ন। সুশ্রুত সংহিতার শারীর স্থানেও যে সৃষ্টি প্রক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত সাংখ্যমতানুসারী তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে আয়ুর্ব্বেদ ন্যায় বৈশেষিক এবং সাংখ্যদর্শনের সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র দার্শনিক মত অবলম্বন করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছে। কিন্তু এই শেষোক্ত মত একান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়। আমরা ক্রমশঃ ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিব। চরকের সূত্রস্থানে বলা হইয়াছে—

"সামান্যঞ্চ বিশেষঞ্চ গুণান দ্রব্যাণিকর্ম্ম চ
সমবায়ঞ্চ তজ্‌জ্ঞাত্বা তন্ত্রোক্তং বিধিমাস্থিতা"……

ইহা হইতে সাধারণতঃ মনে হয় যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র বৈশেষিক দর্শনানুসারী। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদে আরম্ভবাদই সমর্থিত হইয়াছে—অর্থাৎ পরমাণু দ্ব্যণুকাদিক্রমে আরম্ভ প্রক্রিয়া আয়ুর্ব্বেদ সম্মত। আর এই খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই মনে করেন বৈশেষিক দর্শনের মুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ সকল পদার্থের যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে আয়ুর্ব্বেদেও তাহা নির্ব্বাধে প্রবেশ করান যাইতে পারে। বৈশেষিক তন্ত্রজ্ঞ দুই একজন প্রখ্যাত টিকাকার সেইরূপ করিতে যাইয়া বহুস্থানে বিশেষ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন।

সর্ব্ববিধ বৈশেষিক তন্ত্রেই পদার্থবিচার প্রসঙ্গে সর্ব্বাগ্রে দ্রব্যগুণাদির নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বৈশেষিক সূত্রকার মহর্ষি কণাদ হইতে আরম্ভ করিয়া মুক্তাবলীর গ্রন্থকার বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ক্রমে পদার্থের নির্দ্দেশ করিয়া উহাদিগের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু মহর্ষি চরক এই ক্রম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বাগ্রে "সামান্য" পদার্থের উল্লেখ করিয়া ক্রমশঃ বিশেষ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও সমবায়ের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বৈশেষিক মতে যাহা নিত্য পরতন্ত্র এবং আশ্রিত সেই সামান্যকেই চরক সর্ব্বপ্রথম নির্দ্দেশ করিয়া বৈশেষিক সম্মত সামান্য অপেক্ষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের সামান্যেরই নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। সামান্য ও বিশেষ পদার্থ প্রসঙ্গে চরকে বলা হইয়াছে—

> "সামান্যমেকত্বকরং বিশেষস্তু পৃথক্ত্ব কৃৎ।
> তুল্যার্থতা হি সামান্যং বিশেষস্তু বিপর্য্যয়ঃ॥"

কিন্তু বৈশেষিক মতে—"নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বম্" সামান্যের

এবং অন্ত্যোনিত্য দ্রব্যবৃত্তির্নিত্যদ্বয়াবৃত্তিগুর্ণভিন্নো বিশেষঃ" বিশেষের লক্ষণ। আয়ুর্ব্বেদ মতে—"সর্ব্বদা সর্ব্বভাবানাং সামান্যং বৃদ্ধি কারণম্

হ্রাসহেতুর্বিশেষশ্চ………………………"।

অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদ মতে সামান্যকে বৃদ্ধির কারণরূপে এবং বিশেষকে হ্রাসের কারণরূপেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ধাতুসাম্যরূপ কার্য্যই আয়ুর্ব্বেদের মুখ্য প্রয়োজন। এই প্রয়োজনকে লক্ষ্য করিয়াই আয়ুর্ব্বেদে "সামান্য" ও "বিশেষ" নামক পদার্থদ্বয়ের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। বলাবাহুল্য বৈশেষিকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আয়ুর্ব্বেদের দৃষ্টিভঙ্গী স্বতন্ত্র বলিয়াই পদার্থের বিচার প্রণালীও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়াছে। বৈশেষিক মতে সামান্যকে "বৃদ্ধিকারণ" ও বিশেষকে "হ্রাস কারণ" রূপে কুত্রাপি নির্দ্দেশ করা হয় নাই। বিশেষতঃ দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মকে উপেক্ষা বা গৌণ করিয়া সামান্যের নিরূপণ ও নিত্যদ্রব্যকে উপেক্ষা করিয়া বিশেষ পদার্থের নিরূপণ বৈশেষিকতন্ত্রের কুত্রাপি দেখা যায় না। চরকে বলা হইয়াছে—"সত্ত্বমাত্মা শরীরঞ্চ…………ত্রয়মেতত্ত্রিদণ্ডবৎ"। এই সত্ত্ব নামক শব্দে আয়ুর্ব্বেদ যে পদার্থের নির্দ্দেশ করিয়াছেন সেই পদার্থটি বৈশেষিক দর্শনে কোন্ পদার্থের নির্দ্দেশ করে? বৈশেষিক দর্শনে সত্ত্বনামক কোন পদার্থের উল্লেখ নাই। চরকে বলা হইয়াছে—"সেন্দ্রিয়ং চেতনং দ্রব্যং নিরিন্দ্রিয়মচেতনম্" কিন্তু বৈশেষিকমতে—সেন্দ্রিয় দ্রব্য বা পদার্থকে কখনই চেতন বলা হয় নাই।

বৈশেষিক ও আয়ুর্ব্বেদ মতে আত্মতত্ত্ব বিষয়েও বিলক্ষণ মতভেদ আছে। আয়ুর্ব্বেদে আত্মাসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"নির্ব্বিকার পরস্ত্বাত্মাং সর্বভূত গুণেন্দ্রিয়ৈঃ
চৈতন্যে কারণং নিত্যং দ্রষ্টা পশ্যতি হি ক্রিয়া।"

অর্থাৎ আত্মা নির্ব্বিকার, পরমপদার্থ ও নিত্যবস্তু। তিনি সমস্ত

ক্রিয়ার দ্রষ্টা বা সাক্ষী মাত্র। তিনি চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের ও মনের সাহায্যেই চৈতন্যের কারণ হন। আত্মা সর্ব্বব্যাপী হইলেও এই সকল জ্ঞানকরণের বিদ্যমানতা সর্ব্বত্র না থাকায় সর্ব্বপ্রদেশে চৈতন্য প্রকাশ পায় না।

বলা বাহুল্য ইহা অবিকল পরিণামবাদী সাংখ্য ও পাতঞ্জলেরই অভিমত। কিন্তু বৈশেষিক মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মাভেদে আত্মা দ্বিবিধ। আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মের আশ্রয়; জ্ঞান সুখ প্রভৃতি যোগ্য বিশেষ গুণের সম্বন্ধ বশতঃ ই আত্মার প্রত্যক্ষ হয়। পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ, অদ্বিতীয় ও নিত্য। জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ন এবং সংখ্যাদি পাঁচটি আত্মার গুণ। এই আটটি গুণ ও নিত্য। জীবাত্মা নিত্য হইলেও তাঁহার গুণ সমূহ অনিত্য। সুখদুঃখাদি জীবাত্মাই ভোগ করে কিন্তু পরিণামবাদী সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে সুখদুঃখাদি সমস্তই মনের। আত্মা উদাসীন, বা সাক্ষী; তাঁহার সুখদুঃখাদি কিছুই নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলেও আয়ুর্ব্বেদকে কোনক্রমেই বৈশেষিক দর্শনানুসারী বলা যায় না। আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে—"বিকারো ধাতুবৈষম্যং সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে।" (চরক সূত্রস্থান-৯ম অধ্যায়) অর্থাৎ দোষত্রয়ের বৈষম্যাবস্থাই রোগ এবং উহাদিগের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলা হয়। সাংখ্যদর্শনেও বলা হইয়াছে—সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ"। সুতরাং দেখা যাইতেছে "বিকারোধাতুবৈষম্যং সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে" এই বাক্যদ্বারা নিঃসন্দেহে পরিণাম প্রক্রিয়াকেই অবলম্বন করা হইয়াছে—কারণ ইহা সম্পূর্ণরূপেই পরিণামবাদের কথা। ধাতুবৈষম্যই রোগ এবং ধাতুসাম্যই স্বাস্থ্য এইরূপ বলা বৈষম্য ও সাম্যদ্বারা যথাক্রমে অনুলোম ও প্রতিলোম প্রক্রিয়া এবং আবির্ভাব ও তিরোভাবরূপ পরিণামদ্বয়কেই সূচিত করা হইয়াছে। ইহা পরিণাম ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোন প্রণালীতেই সম্ভবপর

নহে। বিশেষতঃ "সাম্যং প্রকৃতিরুচ্যতে" এই বাক্যদ্বারা বৈশেষিক মত সিদ্ধ কোন পদার্থকেই নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। বৈশেষিক দর্শনে প্রকৃতি নামক কোন পদার্থই স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যদর্শনে যেমন 'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা'কে প্রকৃতি বলা হইয়াছে সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদমতেও বায়ু পিত্ত ও কফ নামক ধাতুত্রয়ের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি বা নীরোগাবস্থা বলা হইয়াছে। সাংখ্যমতে গুণত্রয়ের বিভিন্ন পরিণামকে যেমন বিকার নামে অভিহিত করা হইয়াছে সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদ মতে বায়ু পিত্ত কফের বিভিন্ন প্রকার পরিণামই ব্যাধি। সাংখ্যমতে প্রত্যেক জড় পদার্থেই যেমন ত্রিগুণের অন্বয় থাকে আয়ুর্ব্বেদমতে সেইরূপ প্রত্যেক প্রকার বিকারেই ত্রিদোষের অন্বয় বিদ্যমান থাকে। চরকে বলা হইয়াছে—"প্রবৃত্তির্ধাতুসাম্যার্থা চিকিৎসেত্যভিধীয়তে।" (চরক সূত্রস্থান ৯ম অধ্যায়) অর্থাৎ "ধাতুসাম্যার্থ প্রবৃত্তিই চিকিৎসা" এই বাক্যদ্বারা কোনক্রমেই আরম্ভবাদসূচিত হয় না। রোগনিবৃত্তি বা বিনাশের জন্য চিকিৎসা—এইরূপ না বলিয়া ধাতুসাম্যই চিকিৎসা এইরূপ বলায় আরম্ভবাদ না বুঝাইয়া সম্পূর্ণরূপে পরিণামবাদই সমর্থিত হইয়াছে। কাল সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদে বলা হইয়াছে—"কালঃ পুনঃ পরিণাম উচ্যতে" (চরক সূত্রস্থান ১১শ অধ্যায়)। ইহা কখনই আরম্ভবাদী বৈশেষিকের কথা হইতে পারে না। পরিণাম-বাদী ভিন্ন অন্য কেহই কালকে পরিণাম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। চরক প্রভৃতি মহর্ষিগণ শরীর ও ইন্দ্রিয় সমূহকে পঞ্চভৌতিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং সমস্ত আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেই বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু বৈশেষিকগণ কুত্রাপি বাক্ পাণি প্রভৃতিকে কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

ন্যায় ও বৈশেষিকগণ কর্ম্মেন্দ্রিয় বলিয়া কোন পদার্থ ই স্বীকার করেন না। প্রাচীন কাশ্মীরি নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট ইন্দ্রিয় নিরূপণ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "যাহারা বাক্ পাণি পাদ প্রভৃতিকে কর্ম্মোন্দ্রিয় বলে তাহারা উন্মত্ত!" এইরূপ অসংখ্য উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে চরক সংহিতার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পরিণাম প্রক্রিয়া অবলম্বিত হইয়াছে, কুত্রাপি বৈশেষিকসম্মত পার্থিবাদি চতুর্বিধ পরমাণু, দ্ব্যণুক ত্র্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টি প্রক্রিয়া এবং অবয়বে সমবেত অবয়বী প্রভৃতি বস্তুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, ও সমবায় নামক যে শব্দগুলি আয়ুর্ব্বেদে উল্লিখিত হইয়াছে তাহারা অসাধু শব্দ নহে। তজ্জন্য এই শব্দগুলি ব্যবহারের অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু এই শব্দগুলি ব্যবহার করিলেই যে বৈশেষিক পরিভাষা অনুসারে ইহাদিগের ব্যাখ্যা করিতে হইবে এমন কোনই হেতু থাকিতে পারে না।

আর্ষ আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ সমূহের মধ্যে সুশ্রুতের শারীর স্থানের প্রথম অধ্যায়ে অতি সুস্পষ্টরূপে প্রচলিত সাংখ্যসম্মত সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে "ইত্যেকে ভাষন্তে"। ইহাতে কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন "ইত্যেকে ভাষন্তে" এই উক্তিদ্বারা সুশ্রুত অপরের অভিমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা সুশ্রুতের নিজস্ব মত নহে। কিন্তু এই প্রকার সিদ্ধান্ত আদৌ সঙ্গত নহে। কারণ সুশ্রুত স্বীয় গ্রন্থে প্রচলিত সাংখ্য মত (ঈশ্বর কৃষ্ণ) অতি সুস্পষ্ট ও বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করায় এবং অন্যান্য মতের আভাস মাত্র প্রদান করায় ইহাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে সুশ্রুত প্রচলিত সাংখ্য সম্মত পরিণামবাদকেই স্বীয় অভিমত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। পরমতকে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় মতকে সংক্ষেপ মাত্র উক্তি দ্বারা কেহই

প্রকাশ করেনা। পরমত উদ্ধৃত করিয়া তাহার পরক্ষণেই অতি সুস্পষ্ট ভাষায় সুশ্রুত বলিয়াছেন :

"অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তা বিকারাঃ ষোড়শৈবতু।
ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ সমাসেন স্বতন্ত্র পরতন্ত্রয়োঃ ॥"

এই উক্তিদ্বারা সুশ্রুত সুস্পষ্টরূপে প্রচলিত সাংখ্যমতকেই অবলম্বন করিয়াছেন ইহাই বুঝায়।

আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিক অংশ যে দার্শনিক মতবাদ সমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত একমাত্র চরকসংহিতাতেই তাহা বিস্তৃত ও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই শেষোক্ত আর্ষগ্রন্থের সূত্রস্থান ও শারীরস্থান নামক দুইটি অধ্যায়ে আয়ুর্ব্বেদের দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক অংশের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সূত্রস্থানের বিভিন্ন অধ্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে পদার্থ বিচার করিয়া শরীরস্থানে সৃষ্টিক্রমে, মোক্ষের উপায় ও মোক্ষের স্বরূপ প্রভৃতি যাবতীয় দার্শনিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদের দার্শনিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে চরকের মতই সমধিক নির্ভরযোগ্য বা প্রামাণ্য। চরক ও সুশ্রুত নামক উভয় গ্রন্থই আয়ুর্ব্বেদের আর্ষ প্রামাণ্যগ্রন্থ সমূহের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

সুতরাং এই উভয়গ্রন্থেই আয়ুর্ব্বেদের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও মৌলিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে যে ঐকমত্য থাকিবে ইহাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সৃষ্টি প্রক্রিয়া বিষয়ে চরক ও সুশ্রুতে কিঞ্চিৎ ভিন্নরূপ বর্ণনা থাকায় কেহ কেহ মতানৈক্য কল্পনা করিয়াছেন। ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যে মূল সাংখ্যকারগণের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গী অথবা ব্যাখ্যা ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যবশতঃ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। একই মূল তত্ত্ব বচনভঙ্গীর পার্থক্য বশতঃ অনেক সময় বাহ্যতঃ পৃথক বলিয়া

প্রতিভাত হইলেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে উহা একই থাকে। চরক ও সুশ্রুতের টিকাকারগণের মধ্যে সকলেই প্রচলিত সাংখ্য (ঈশ্বর কৃষ্ণ) মতাবলম্বী হওয়ায় একই ভাবে উভয়তন্ত্রের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া কিঞ্চিৎ জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রাচীন সাংখ্যের অভিপ্রায় পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া উভয় মতের সামঞ্জস্য কোথায়ও দেখাইবার চেষ্টা হয় নাই তজ্জন্যই এইরূপ হইয়াছে। যাহা হউক প্রচলিত সাংখ্যমতের সহিত প্রাচীন সাংখ্যমতের যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই ইহা আমরা সংক্ষেপে দুই একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রদর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সুশ্রুতে সম্পূর্ণরূপেই প্রচলিত সাংখ্যমত গৃহীত হইয়াছে কিন্তু প্রচলিত সাংখ্যমত প্রবর্ত্তিত হইবার বহুপূর্ব্বে চরকসংহিতা রচিত হওয়ায় উহাতে প্রাচীন সাংখ্যমত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চরকের সাংখ্যমতের সহিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়, এমনকি অনেকস্থানে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের ভাষায় অবিকল প্রাচীন মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

প্রচলিত সাংখ্যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করা হইয়াছে কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য মতানুসারী মহর্ষি চরক ও “চতুর্ব্বিংশতিকো রাশিঃপুরুষঃ” এই উক্তিদ্বারা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু চরক এবং যাজ্ঞবল্ক্য মতের মধ্যেও কোন কোন স্থানে কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং চরকও যে সর্ব্বত্র যাজ্ঞবল্ক্য সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিয়াছেন আপাতঃদৃষ্টিতে তাহা মনে হয় না। চরকে বলা হইয়াছে অহঙ্কার হইতেই মহাভূত পঞ্চকের উৎপত্তি হয় কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বলা হইয়াছে—“তন্মাত্রাদিন্যহঙ্কারাৎ” অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে তন্মাত্রা সমূহের

উৎপত্তি হয়। প্রচলিত সাংখ্য সিদ্ধান্তানুসারেও অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং এই দিক দিয়া প্রচলিত সাংখ্যের সহিত প্রাচীন যাজ্ঞবল্ক্যমতের কোন বিরোধ নাই। কিন্তু চরক তন্মাত্রের উল্লেখ করেন নাই অতএব বাহ্যতঃ চরকের সহিত যাজ্ঞবল্ক্য ও প্রচলিত সাংখ্যমতের অনৈক্য দেখা যায় কিন্তু অনেকের মতে যাজ্ঞবল্ক্য মতের সহিত প্রচলিত সাংখ্যমতের ও যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে তাহা নহে, কারণ যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়—"তন্মাত্রাদীন্যহঙ্কারাদেকোত্তরগুণাণিচ এই বচনের সহিত চরক ও প্রচলিত সাংখ্যের বিশেষ মতভেদ আছে। প্রচলিত সাংখ্যমতে স্থূল পঞ্চভূত সমূহই একোত্তর গুণ হইয়া ক্রমশঃ পরিণাম প্রাপ্ত হয়—তন্মাত্র সমুহ নহে।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে—

"বুদ্ধেরুৎপত্তিরব্যক্তাৎ ততোঽহঙ্কার সম্ভবঃ।
তন্মাদীন্যহঙ্কারাদেকোত্তর গুণাণিক ॥
শব্দ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধঞ্চ তদ্‌গুণাঃ ॥"

যদি 'একোত্তর গুণাণি' পদকে 'তন্মাদানি' পদের বিশেষণরূপে গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে প্রচলিত সাংখ্যমতের সহিত প্রাচীন মতের এই অংশে অনৈক্য আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যদি একোত্তর গুণাণি শব্দের অর্থ স্থূল মহাভূত হয় তৎ পদের সহিত একোত্তর গুণাণি পদের অন্বয় স্বীকার করা হয় তাহা হইলে প্রাচীন ও নবীন মতের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। আর ইহাই যে সঙ্গত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ প্রাচীন বা প্রচলিত সাংখ্যের কেহই তন্মাত্র সমূহকে একোত্তর গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। স্থূল মহাভূত সমূহই একোত্তর গুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যমতাবলম্বী মহর্ষি চরকও তন্মাত্রকে একোত্তর গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই যদি তন্মাত্রসমূহ

একোত্তর গুণ হইত তাহা হইলে চরকেও উহার উল্লেখ থাকিত। সুতরাং একোত্তর গুণাণি পদ তন্মাত্রাণির বিশেষণ নহে উহার অর্থ স্থূল পঞ্চমহাভূত। চকারএর দ্বারা সমুদয় বুঝাইতেছে না ; উহা দ্বারা ক্রমের নির্দ্দেশই করা হইয়াছে। 'শব্দ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসোগন্ধঞ্চ তদ্‌গুণা' এই বাক্যের তাৎপর্য্য আলোচনা করিলেই সমস্ত বিষয় পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যাইবে। অনেকে বলেন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যসম্মত তন্মাত্র ও চরক নির্দ্দিষ্ট মহাভূত একই পদার্থ এবং এই যুক্তির সাহায্যে তাঁহারা অহঙ্কার হইতেই মহাভূতের সৃষ্টি হয় এইরূপ প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যাহা হোক প্রচলিত সাংখ্য মতে সূক্ষ্ম ও স্থূল ভেদে মহাভূত দুই প্রকার—

"তন্মাত্রাণাং কার্য্যাণি পঞ্চস্থূল ভূতাণি। স্থূল শব্দাৎ তন্মাত্রাণাং সূক্ষ্মভূতত্বমভ্যুপগতম্ ॥"

(সাংখ্যদর্শন ১ম অধ্যায় ৬১ সূত্র ভাষ্য)

সুতরাং "মহাভূতসমূহ অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়াছে" এই বিষয়ে প্রাচীন ও প্রচলিত সাংখ্যে কোন মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু প্রচলিত সাংখ্যে স্থূল মহাভূতের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে প্রাচীন সাংখ্যে সেইরূপ স্পষ্ট ভাবে সেই সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। বরং প্রাচীন সাংখ্যে অহঙ্কার হইতে মহাভূতের উৎপত্তি হয় এইরূপ বলিয়া শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস ও গন্ধকে উক্ত মহাভূতের গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করায় বাহ্যতঃ কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্য বা জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। তথাপি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রচলিত সাংখ্য মতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস ও গন্ধ নামক তন্মাত্র পঞ্চককে বিকার নামে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রাচীন মতেও সেইরূপ মহাভূত পঞ্চকের গুণ-শব্দ-স্পর্শাদিকেও বিকার নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং বিকার পদার্থের সংখ্যা হিসাবে প্রাচীন ও প্রচলিত উভয় মতেই ঐক্য আছে। প্রাচীন মতে অষ্ট প্রকৃতি এবং ষোড়শ বিকার।

প্রচলিত সাংখ্য মতেও অষ্ট প্রকৃতি এবং ষোড়শ বিকার। কেবলমাত্র প্রভেদ এই, প্রচলিত মতে যে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধকে তন্মাত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে প্রাচীন মতে সেই শব্দ-স্পর্শাদিকে মহাভূতের গুণ ও পঞ্চ মহাভূত হইতে স্বতন্ত্র বিকার নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এখন যদি শব্দ স্পর্শ প্রভৃতিকে মহাভূতের গুণ বলা হয় তাহা হইলে পরিণামবাদী সাংখ্য মতে গুণ ও গুণীর ভেদ স্বীকার করিতে হয় কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক মতে যেমন গুণ ও গুণীর ভেদ স্বীকার করা হয়। সাংখ্য মতে সেইরূপ ভেদ স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং পরিণামবাদী সাংখ্যকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে শব্দ-স্পর্শাদি যাহা পঞ্চভূতের গুণ বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে তাহা উক্ত পঞ্চ মহাভূত ও পঞ্চক হইতে একান্ত ভিন্ন নহে অথচ ইহারা স্বতন্ত্র বিকার পদার্থ ? কিন্তু ইহাদিগকে যদি স্বতন্ত্র বিকার পদার্থরূপে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ইহাদিগের স্থূলত্ব-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্ব প্রভৃতি কখনই মহাভূত পঞ্চকের স্থূলত্বাদির সমান হইতে পারে না। যদি সমান হয় তাহা হইলে ইহারা মহাভূত পঞ্চক হইতে পৃথক তত্ত্ব হইতে পারে না। আর সেই অবস্থায় প্রাচীন মতে বিকার পদার্থের সংখ্যা ১৬টি না হইয়া ১১টি হইবে। আর যদি ইহাদিগকে স্বতন্ত্র তত্ত্বরূপে স্বীকার করা হয় তাহা হইলে ইহাদিগের প্রকৃতি কি হইবে ? ইহাদিগের প্রকৃতি স্থূল মহাভূত পঞ্চক কখনই নহে কারণ স্থূল মহাভূত পঞ্চক কখনই প্রকৃত নহে ইহা বিকৃতি মাত্র সুতরাং পরবর্ত্তী প্রকৃতি অহঙ্কারকেই উহাদিগের প্রকৃতি স্বীকার করিতে হইবে। এখন প্রাচীন মতে রূপ রসাদি যাহা মহাভূতের গুণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদিগের স্বরূপ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব। সাধারণতঃ দেখা যায় পিণ্ড ঘট পট প্রভৃতি বিশেষ পদার্থ সমূহের রূপক পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগকে

গ্রহণ করা কখনই সম্ভবপর হয় না। কিন্তু পিণ্ডের রূপ অপেক্ষা ঘটের রূপ অথবা ঘট ও পিণ্ডের রূপ অপেক্ষা পটের রূপ বাহ্যতঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অথচ সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে উপলব্ধি করা যায় যে ঘট, পিণ্ড ও পট প্রভৃতি বিশেষণগুলি শূন্য হইয়া "রূপ মাত্র" রূপে একটি পদার্থ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকে। এই নির্ব্বিশেষ রূপমাত্র পদার্থের স্বরূপ কি ঘট পটাদি বিশেষের সহিত এই রূপমাত্র পদার্থ অভেদে উপলব্ধ হইলেও ঘট পটাদিকে পরিত্যাগ করিলে ইহা কোনক্রমেই সাধারণের প্রত্যক্ষযোগ্য নহে। এই প্রকার নির্ব্বিশেষ রূপমাত্র বা রূপস্বরূপ যে পদার্থটি ঘট পটাদিতে অনুগতরূপে বিদ্যমান থাকে উহা ঘট পটাদি হইতে একান্ত ভিন্ন বা একান্ত অভিন্ন নহে। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক মতে গুণ পদার্থ গুণী ঘট পটাদি অপেক্ষা সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঘট পটাদি বিশেষের সহিত এই রূপমাত্র পদার্থ ঘট পটাদি বিশেষের সহিত অভেদে প্রত্যক্ষ হইলেও ঘট পটাদি বিশেষ শূন্য হইয়া নির্ব্বিশেষ রূপ মাত্র রূপে যাহা সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে তাহা প্রত্যক্ষ করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। এই নির্ব্বিশেষ সামান্যাত্মক রূপমাত্র পদার্থকেই সাংখ্য ও পাতঞ্জল রূপতন্মাত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন। এইরূপে নির্ব্বিশেষ শব্দমাত্রকে শব্দতন্মাত্র এবং নির্ব্বিশেষ স্পর্শ, রস ও গন্ধ সামান্যকে যথাক্রমে স্পর্শ, রস ও গন্ধতন্মাত্র নামে অভিহিত করা হইয়াছে—ইহারা অনুগতরূপে ঘটপটাদি বিশেষ পদার্থে বিদ্যমান থাকিলেও ইহাদিগের প্রত্যেকটিরই স্বতন্ত্র নির্ব্বিশেষ রূপ আছে। এই নির্ব্বিশেষ শব্দ, স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধের স্থূলতা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যতা প্রভৃতি স্থূল পঞ্চ মহাভূত সমূহের স্থূলত্বাদির সহিত সমান নহে। সুতরাং সাংখ্য শাস্ত্রমতে ইহারা তত্ত্বান্তররূপে অবশ্যই স্বীকৃত হইবার যোগ্য। এই শব্দ স্পর্শাদি স্থূল মহাভূতে অনুগতরূপেই বিদ্যমান থাকে। ইহা প্রচলিত ও প্রাচীনপন্থী সাংখ্যাচার্য্যগণের

প্রত্যেকেই স্বীকার করেন এবং যাহা কোন পদার্থে অনুগতরূপে বিদ্যমান থাকে তাহা ঐ শেষোক্ত পদার্থের উপাদান পরিণামবাদী মাত্রেই ইহা স্বীকার করেন। পরিণামবাদী মাত্রেই স্বীকার করেন যে—

"যানি চ যেনরূপেণ আচস্থৌল্যাৎ আচসৌক্ষ্মাৎ যদাত্মনা

সমন্বীয়ন্তে তানি তদাত্মক সামান্য পূর্ব্বানি লোকেদৃষ্টানি। যথা-মৃৎসামান্যাত্মনা সমনুগতানি ঘটাদি কার্য্যাণি মৃদাত্মক- সামান্য-পূর্ব্বকাণি ভবন্তি"।

এই যুক্তি অনুসারেই বৈয়াকরণগণ জগৎকে শব্দ পরিণাম, কাল পরিণাম-বাদীগণ কাল পরিণাম, সদ্রূপ ব্রহ্মবাদীগণ জগৎকে সদ্রূপ ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া থাকেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যগণ শব্দ স্পর্শাদিকে মহাভূত পঞ্চকের গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া প্রকারান্তরে স্থূল মহাভূত পঞ্চককে সূক্ষ্ম শব্দাদি উপাদানক বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন।

এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিচার করিয়াই প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রকারান্তরে বা সংক্ষেপে যে সত্যের সন্ধান দিয়াছেন প্রচলিত সাংখ্যকারগণ সেই একই তত্ত্ব অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ভাব ও ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং প্রচলিত সাংখ্যের সহিত প্রাচীন সাংখ্যের এই দিক দিয়া কোনই ভেদ নাই। একই তত্ত্ববিদেয় এবং আশয় ও বচনভেদে ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইতে পারে কিন্তু তাহাতে উহার স্বরূপের হানি হয় না। এক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। চরকোক্ত প্রাচীন সাংখ্যের সহিত প্রচলিত সাংখ্যের আর একটি প্রধান বিরোধের বিষয় এই যে প্রচলিত সাংখ্যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন সাংখ্যমতে চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। প্রচলিত সাংখ্যমতে পুরুষের সংযোগে প্রকৃতি মহৎ বা বুদ্ধি তত্ত্বরূপে পরিণত হয় কিন্তু চরকমতে

ক্ষেত্রজ্ঞ অব্যক্ত হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ বিচারে পুরুষই ক্ষেত্রজ্ঞ। সুতরাং দেখা যাইতেছে প্রচলিত সাংখ্যে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ নামক গুণত্রয়ের মিলিত সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সাম্যাবস্থাদ্বারা উপলক্ষিত গুণত্রয়ের সমষ্টিরূপা এই প্রকৃতিই জগতের উপাদান। ইনিই সৃষ্টিকার্য্যের মূল বলিয়া ইহাকে মূলা প্রকৃতি বলা হয়। এই মূলা প্রকৃতির সত্ত্ব বহুল প্রথম বিকার মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধিতত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্বের রজোবহুল বিকার অহংতত্ত্ব বা অহঙ্কার—ইত্যাদি ক্রমে গুণত্রয়ের বিভিন্ন পরিণাম বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রকৃতি হইতে ক্ষিতিপর্য্যন্ত এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বই জগৎরূপে পরিচিত। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সহিত পুরুষকে গণনা করিয়া প্রস্তাবিত সাংখ্য সমুদায়ে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন সাংখ্যমতাবলম্বী মহর্ষি চরক স্বতন্ত্র প্রকৃতিকে জগতের মূল উপাদানরূপে স্বীকার না করিয়া অব্যক্ত বা ক্ষেত্রজ্ঞকেই জগতের মূল উপাদানরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইহার ফলে প্রাচীন মতে সমুদায়ে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যাহা হৌক সামান্য প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নামক গুণত্রয় বিশিষ্ট পুরুষই অব্যক্ত পদের অর্থ। পুরুষাশ্রিত গুণত্রয়ই ক্রম পরম্পরায় বুদ্ধি, অহঙ্কার ও মহাভূতাদি রূপে পরিণত হয়। ইহাই চরকোক্ত প্রণালীর সারকথা। প্রকৃতি চৈতন্যময় পুরুষকে আশ্রয় করিয়া চতুর্বিংশতি স্তরে ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া জগৎরূপে পরিণতিলাভ করিয়াছেন, এবং চিদানন্দময় পুরুষ নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্তভাবে মূল প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। চরকমতে এই পুরুষাশ্রিত প্রকৃতিই অব্যক্ত বা ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রকৃতি ও পুরুষের এই একীভূত অবস্থাই অব্যক্ত পদের লক্ষ্য এবং এইরূপে প্রাচীনমতে সমুদায়ে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

চরকের অভিপ্রায় লক্ষ্য করিলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে পুরুষাশ্রিত গুণত্রয়ের পরিণতি পরম্পরায় অব্যক্ত পুরুষই ব্যক্ত হইয়া থাকেন এবং প্রতিলোম পরিণামে প্রলয় দশাতে সমস্ত কার্য্যবর্গ গুণভাব প্রাপ্ত হইলে ব্যক্ত পুরুষই অব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হন। ফলকথা কেবল মাত্র গুণত্রয়ের দিক লক্ষ্য করিয়া পরিণাম পরম্পরার আলোচনা করিলে মাত্র জড় হইতেই সৃষ্টি হয় এইরূপ মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে গুণত্রয় পুরুষাশ্রিত বলিয়া এই গুণসমূহে অনুলোম পরম্পরা পরিণামে অব্যক্ত পুরুষই ব্যক্ত ভাব প্রাপ্ত হন। বস্তুত ইহা স্বীকার না করিলে জড় হইতে সৃষ্টি হয় এইরূপ স্বীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। কিন্তু শ্রুতি জড় কারণতা-বাদ কুত্রাপি স্বীকার করেন নাই। চেতন-কারণতা-বাদই শ্রুতির সর্ব্বত্র বলা হইয়াছে। এমন কি আধুনিক জড়বিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণের মধ্যে বহু বিশ্ববিখ্যাত মনীষী জড়কারণতাবাদ সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

যাঁহারা প্রচলিত সাংখ্য-অনুসারে জড় কারণবাদ সমর্থন করেন এবং মনে করেন যে জগৎসৃষ্টিতে চেতনের কোন অপেক্ষা নাই—শুদ্ধ জড়ই পরিণাম পরম্পরাক্রমে জগতের উৎপাদক হইয়া থাকে—তাঁহারা প্রচলিত সাংখ্যের প্রকৃত অভিপ্রায় অবধারণ করিতে পারেন নাই। সাংখ্য কারিকায় ব্যক্ত ও অব্যক্ত উভয়কেই বিষয় বলা হইয়াছে—"ত্রিগুণমবিবেকী বিষয়......" (১১শ কারিকা)। এই ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপ জড়বর্গ মাত্রকেই বিষয়রূপে নির্দ্দেশ করায় জড়বর্গের বিষয়রূপতা অবশ্যই বিষয়ী সাপেক্ষ হইবে। কারণ বিষয়ী না থাকিলে বিষয় থাকিতেই পারে না। অব্যক্ত বিষয় হইলে তাহার বিষয়ী কে হইবে? জড়বর্গের বিষয়ী জড়

হইতে পারে না, কারণ তাহাও বিষয়। সুতরাং জড়বর্গের বিষয়ী জড়াতিরিক্ত চেতন পুরুষকেই স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুত সাংখ্য কারিকায় পুরুষকে অবিষয় এবং অব্যক্ত, প্রকৃতিকে বিষয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া উভয়ের বৈধর্ম্যও স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু কোন প্রকার সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া পুরুষের সহিত অব্যক্তের বিষয়-বিষয়ীভাব স্বীকার করা যায় না। চেতনের সান্নিধ্যবশতঃ জড়ের প্রবৃত্তি দেখা যায় এইরূপ স্বীকার করিলেও জড়বস্তুকেই প্রবৃত্তির আশ্রয়রূপে স্বীকার করিতে হয় এবং জড়ের প্রবৃত্তিতে চেতনের সদ্ভাব ভিন্ন অন্য কিছুই স্বীকৃত হয় না। কিন্তু সদ্ভাব মাত্র সিদ্ধির দ্বারা চেতনের কারণতা আদৌ সিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রচলিত সাংখ্যানুসারে বিবেচনা করিলেও চিৎসান্নিধ্য নিরপেক্ষ জড়প্রকৃতির প্রবৃত্তি হয় না ইহাই বুঝিতে হইবে। আর্য্য দার্শনিকগণ চেতন নিরপেক্ষ জড়বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই। পুরুষ সান্নিধ্য প্রকৃতিতে না থাকিলে প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধির সহিত পুরুষের অবিবেক বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহাও সঙ্গত হইত না। সুতরাং প্রচলিত সাংখ্যানুসারে বিবেচনা করিলেও পুরুষের সহিত প্রকৃতির কোন না কোন সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে প্রলয় দশাতে সকল পুরুষই মুক্ত হইবে এবং সেই অবস্থায় পুনর্ব্বার আর সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং প্রলয় দশাতেও পুরুষের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। এই জন্যই পুরুষের সহিত প্রকৃতির কোন না কোন অনাদি সম্বন্ধ স্বীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর থাকে না। এই অনাদি সম্বন্ধকেই কেহ বা যোগ্যতারূপ সম্বন্ধ কেহ বা ভোক্তৃভোগ্য সম্বন্ধ কেহ বা সান্নিধ্যরূপ সম্বন্ধ নামে অভিহিত করিয়াছেন। প্রাচীন সাংখ্য এই অনাদি সম্বন্ধকেই আশ্রয়-আশ্রয়ী সম্বন্ধ নামে নির্দ্দেশ

করিয়াছেন এবং আশ্রয়-আশ্রয়ীর অভেদ কল্পনা করিয়া স্বতন্ত্র প্রকৃতির উল্লেখ না করিয়া ত্রিগুণাশ্রিত পুরুষকেই অব্যক্ত বা ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করিয়াছেন। সুতরাং প্রাচীন সাংখ্য মতাবলম্বী চরক সংহিতায় ক্ষেত্রজ্ঞ অব্যক্ত হইতে বুদ্ধি উৎপন্ন হয় বলিয়া যাহা বলা হইয়াছে তাহাকে কোনক্রমেই প্রচলিত সাংখ্যের বিরোধী বলা যাইতে পারে না।

চর্য্যাগীতি-কবিদের ধর্ম্মমত

প্রাচীন বাঙ্গালা চর্য্যাগীতির কবিরা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন, এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী চর্য্যাগীতিগুলির যে নামকরণ করিয়াছিলেন—'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'—তাহা হইতে। কিন্তু চর্য্যাগীতিগুলি তলাইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এগুলির কবিরা অনেকেই বৌদ্ধ ছিলেন না, এবং যাঁহাদের বৌদ্ধ বলা যাইতে পারে, তাঁহাদের সকলকেও প্রচলিত কানুন অনুসারে "বৌদ্ধ" বলা চলে না। চর্য্যাগীতির কবিরা ভনিতায় প্রায়ই নিজেদের নাম দিয়াছেন, যেমন করিয়াছেন জয়দেব এবং পরবর্ত্তী বৈষ্ণব গীতিকবিরা। প্রাপ্ত চর্য্যাগীতি হইতে আমরা এই কয়জন কবির নাম পাইতেছি—লুই, গুডরী, চাটিল-শিষ্য ধাম, ভুসুক, কাহ্ন, কামলি, শান্তি, মহিণ্ডা, সরহ, আজদেব, লুই-শিষ্য দারিক, ভাদে, তাড়ক, কঙ্কণ ও জয়-নন্দী। দুই জন কবির নাম পাই না, ছদ্মনাম পাই—ডোম্বী ও

শবর। দুই জন সাধক-কবি শুধু গুরুর নাম করিয়া সারিয়াছেন—কুক্কুরী-পা ও ঢেণ্ঢণ-পা। একটি গানে কবির নাম বা ছদ্মনাম কিছুই নাই। টীকাকার ভুল করিয়া এটির রচয়িতার নাম "বীণাপাদ" বলিয়াছেন।

সমস্ত চর্য্যাগীতির মধ্যে একটি বাহ্য লক্ষণ প্রধানভাবে বিদ্যমান। এটি হইতেছে রূপক-উপচারের সাহায্যে অধ্যাত্ম-অনুভূতির বর্ণনা ও অধ্যাত্ম-সাধনার পথনির্দ্দেশ। এই জন্যই গানগুলির নাম হইয়াছিল "চর্য্যাগীতি"। শিক্ষাপদীয় আচরণ (disciplinary training) অর্থে "চর্য্যা" ও "চর্য্যাগাথা" শব্দের ও সংজ্ঞার ব্যবহার বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায়। যেমন, "চরামি বোধিসত্ত্বচর্য্যাং", "আর্য্যভদ্রচর্য্যাদি-গাথাভির্বা পূজনা বা।" গানগুলি যে রচনার কালেও চর্য্যা বা চর্য্যাগীতি নামে প্রসিদ্ধ ছিল তাহা বুঝি "কুক্কুরী-পা"-এর ভনিতা হইতে—"অইসনি চর্য্যা কুক্কুরী-পাএঁ গাইউ" (অর্থাৎ এমন চর্য্যা কুক্কুরীপাদে গাইলেম)।

ভাবের দিক দিয়া চর্য্যাগীতিগুলির সাধারণ লক্ষণ হইতেছে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের মিষ্টিক্ (অর্থাৎ অবাঙ্মনোগোচর)-বাদ। কবিরা সকলেই ছিলেন মিষ্টিক্ সাধক। তাঁহাদের দার্শনিক মত ছিল অনীশ্বর। তাহার মানে ইহা নয় যে, ঈশ্বরের জগৎ-কর্তৃত্ব তাঁহারা স্পষ্ট কথায় অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের সাধনায় ঈশ্বরের উপাসনার কোন স্থান ছিল না। তাই তাঁহারা প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্ম-সাধনাকে নিরাস করিয়াছেন, এমন কি বৌদ্ধ-সাম্প্রদায়িক বিভিন্ন মতবাদ ও সাধনাকেও। সরহ তাঁহার দোহা-উপদেশের মধ্যে বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণেরা অধ্যাত্মরহস্য জানে না, তাহারা শুধুশুধুই চতুর্ব্বেদ পড়ে, মাটির বেদী করিয়া অগ্নিতে হোম করে অধ্যাত্ম সাধনা ছাড়িয়া, তাহাতে লাভ কেবল কড়া ধোঁয়ায় চোখ নষ্ট করা; কেহ কেহ বানপ্রস্থ লইয়া একদণ্ডী, ত্রিদণ্ডী ও ভগবদ্‌বেশ ধারণ করে এবং পরমহংসত্ব না পাইয়া উপদেশ দিয়া বেড়ায়। এই ভাবে

মিথ্যার দ্বারা জগৎ চালিত হইতেছে ভ্রান্তির পথে; ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম যে তুল্য তাহা জানে না। শৈবরা গায়ে ছাই মাখিয়া মাথায় জটাভার বহন করে, তাহারা ঘরে বসিয়া দীপ জ্বালে, কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে, চোখ বুজিয়া আসন বাঁধিয়া বসে, লোক ঠকাইয়া কানে মন্ত্র জপে, দক্ষিণার লোভে রাড়, নেড়া ও অন্য বেশধারীদেরও দীক্ষা দেয়। জৈন যতিরা বড় বড় নখ রাখে, মলিন বেশ ধারণ করে অথবা উলঙ্গ হইয়া অঙ্গলোম উপড়ায়। এইভাবে বেশের দ্বারা ধর্ম্মসাধনাকে বিড়ম্বিত করিয়া ক্ষপণকেরা আত্মাকে বাদ দিয়া মোক্ষ-উপদেশ দেয়। যদি নগ্ন হইলেই মুক্তি হয়, তবে কুকুর শিয়ালেরও মুক্তি আছে, লোম-উৎপাটনে যদি সিদ্ধি হয়, তবে যুবতি-নিতম্বেরও সিদ্ধি আছে। ময়ূর-পুচ্ছ ধারণে মোক্ষ দৃষ্ট হইলে হাতি ঘোড়ারও হইবে; এখানে ওখানে খুঁটিয়া আহার সংগ্রহ করিলে যদি মুক্তি হয়, তবে তাহা পশুপক্ষীরও লভ্য। সরহ বলে যে ক্ষপণকদের মোক্ষ লাভ তো আমার কিছুতেই মনে লাগে না, তত্ত্বরহিত কায়া পরলোক সাধন করিতে পারে না। চেলা ও ভিক্ষু যাহারা তাহারা স্থবিরত্বের জন্য ও সম্মানের জন্য প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে। তাহাদের কেহ কেহ সূত্রান্তব্যাখ্যানে নিযুক্ত হয়, কেহ বা দর্শন-চিন্তায় শুকাইয়া যায়। যাহারা মহাযান-মত অবলম্বন করে (তাহাদেরও গতি নাই)।"

তাহা হইলে ইঁহাদের শাস্ত্র ও অনুশাসন তবে কি? তাহা গুরুবাক্য। চর্য্যাগীতি-কবিদের সাধনার গোড়ার কথা হইতেছে গুরু উপদেশে শ্রদ্ধা। সরহ দোহায় বলিয়াছেন,

বরগুরুবঅনেঁ পড়িজ্জহু সাচেঁ।
সরহ ভণই মই কহিঅউ বাচেঁ॥

অর্থাৎ, গুরুবাক্য সত্য বলিয়া আশ্রয় কর,—এই হক্ কথা বলিয়া

দিলাম। তত্ত্বস্ত অনির্ব্বচনীয়, অনির্দ্দেশ্য, তাহার উদ্দেশ গুরুর মুখে প্রাপ্তব্য "লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান", "জই তুম্হে লোঅ হে হোইব পারগামী, পুচ্ছতু চাটিল অনুত্তর সামী", "সদ্‌গুরু বোহে জিতেল ভববল", "শাখি করিব জালন্ধরি পাএ", "গুরুবাক-পুঞ্চআ বিন্ধ নিঅ-মনে বাণেঁ" ইত্যাদি। গুরুর উপদেশ মন্ত্রতন্ত্রে নয়, তাঁহার কাজ শিষ্যের শক্তি জাগানো, দৃষ্টি খুলিয়া দেওয়া। তাই কাহ্ন বলিয়াছেন, "সাধারণ গুরু যে শিষ্যদের উপদেশ দেন তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। বাক্যপথের অতীত যাহা, তাহা কথায় বলা যায় কি করিয়া। যিনি সত্যগুরু তিনি ত বোবা, আর যে সত্য শিষ্য, সে ত কালা।" যিনি আত্মজ্ঞান পাইয়াছেন, যাঁহার স্বাধিষ্ঠান সহজানন্দে, তাঁহারই গুরু হইবার অধিকার। সরহ দোহায় উপদেশ দিয়াছেন,

জাব ন অপ্পা জাণিজ্জই তাব ণ সিস্ম করেই।
অন্ধেঁ অন্ধ কঢ়াব জিম বেণ্ণ বি কুপ পড়েই ॥

অর্থাৎ, যতক্ষণ আত্মাকে না জানা যায়, ততক্ষণ শিষ্য করিতে নাই। অন্ধ যদি অন্ধকে টানিয়া লইয়া যায় তবে দুইজনেই কূপে পড়ে।

এক অর্থে চর্য্যাগীতি-কবিরা ছিলেন মায়াবাদী। ইঁহারা তত্ত্বের দিক দিয়া, চরম সত্যের (ultimate reality) দিক দিয়া জগৎকে মিথ্যা বলেন নাই, ইঁহারা জগৎ-প্রপঞ্চকে মিথ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান প্রকল্পনা বলিয়াছেন। ভুসুকুর একটি গানে এই কথার সরল ব্যাখ্যা আছে। সেটির অনুবাদ দিতেছি।

ওরে, জগৎ আদিতেই অনুৎপন্ন, উৎপন্ন দেখাইতেছে ভ্রান্তিতে। রজ্জু-সর্প দেখিয়া যে চমকিয়া ওঠে তাহাকে কি সত্যই বোড়া খায় ?

ওরে মূর্খ যোগী, হাত কচলাইও না। যদি জগৎকে এই স্বভাবে বুঝিতে পার, তবে তোমার বাসনা ঘুচিবে।

মরু-মরীচিকা, গন্ধর্ব্ব-নগরী, দর্পণ-প্রতিবিম্ব যেমন, বাত্যাবর্ত্তে জল জমিয়া পাথর হয় যেমন, বন্ধ্যাপুত্র যেমন ক্রীড়া করে, বহুবিধ খেলা খেলে, বালির তেল, সজারুর শিঙ, পুষ্পিত আকাশ যেমন, তেমনি—রাউত ভুসুক বলিতেছে স্পষ্ট করিয়া—সকলেরই এইরূপ স্বভাব।

ওরে মূঢ়, তুই যদি ভ্রান্তিতে থাকিস তবে সদ্‌গুরুর চরণে জিজ্ঞাসা কর।

ভদ্রাভদ্রজ্ঞানে পাপপুণ্যবোধে মায়াতরু বৃদ্ধি পায়। অদ্বয় দৃষ্টিরূপ কুঠারে মায়াতরুকে ছেদন করিলে তবে সিদ্ধিলাভ হয়। সিদ্ধি হইতেছে সহজানন্দের অবস্থা। এই অবস্থা পাইলে ভেদাভেদ জন্মমৃত্যু থাকে না, রহিত হয়। চর্য্যাগীতিতে উদ্দিষ্ট মিষ্টিক্ সাধনার উদ্দেশ্য হইতেছে ক্ষণ-আনন্দ-রহস্যজ্ঞান। চারি ক্ষণ অনুসারে আনন্দের চারি অবস্থা—প্রথমে বিচিত্রানন্দ, দ্বিতীয়ে বিপাকানন্দ, তৃতীয়ে বিরমানন্দ, চতুর্থে সহজানন্দ। পবন নিরুদ্ধ ও চিত্ত নিষ্ক্রিয় হইলে হয় সমতাযোগ এবং বিরমানন্দ প্রাপ্তি। তাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে মহাসুখলীলা-সহজানন্দের আভাস পাওয়া যায়।

বিরমানন্দ বিলক্ষণ সুধ
জো এথু বুঝই সো এথু বুধ
ভুসুক ভণই মই বুঝিঅ মেলেঁ
সহজানন্দ মহাসুহ-লীলেঁ॥

যাহার মহাজ্ঞান লাভ হইয়াছে, সে সংসারকে ত্যাগ করিয়া যায় না, সে সংসারকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিয়া লয়।

দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিয়া ভুঞ্জই ইন্দী জানী
স্বপরাপর ণ চেবই দারিক সঅলানুত্তর মানী।

অর্থাৎ দুঃখ সুখ এক করিয়া জ্ঞানী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ভোগ করে।

হে দারিক, সে আত্মপর জানে না, সব কিছুই সে পরমার্থ বলিয়া মনে করে।

চর্য্যাকবি সাধকদের এই যে অদ্বয়দৃষ্টি, ইহা গীতোক্ত যোগদৃষ্টি, যে যোগ হইতেছে সমতা (সমত্বং যোগ উচ্যতে)। এ যোগী ভব সংসারকে মানিয়া লয়, কিন্তু তাহাতে বদ্ধ হয় না। সাধারণ লোক সংসার ভোগ করিয়া তাহাতে বদ্ধ হয়, কেননা তাহার সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ পুণ্য-পাপ দ্বৈত বোধ আছে; আর যোগী ভব ভোগ করিয়াও মুক্ত, কেননা তাহার চিত্তে দ্বৈতবোধের দাগ পড়ে না।

ভব ভুঞ্জই ন বাজ্ঝই রে অপুব বিণানা।
জেব বি লোঅর বান্ধন তেব বি জোইর মেলানা॥

কোন কোন চর্য্যাগীতি-কবি যে বৌদ্ধ মহাযানপন্থী তান্ত্রিক ছিলেন সে অনুমান করা যায় তাঁহাদের রচনায় বৌদ্ধ মহাযান-মতের বিশিষ্ট পারিভাষিক শব্দ ও সংজ্ঞা হইতে। যেমন, বোধি (সরহ, ধাম, কঙ্কণ); সংবোধি (কঙ্কণ); দশবল, তথাগত (কাহ্ন); শূন্য (অনেকেই); করুণা (ভুসুক, কাহ্ন, কামলি, দারিক); তথতা (কাহ্ন, কঙ্কণ, জয়-নন্দী); স্কন্ধ (কাহ্ন); বুদ্ধ ("বীণা"); হেরুক (শান্তি, "বীণা"); মার (মহিণ্ডা)। বৌদ্ধ তান্ত্রিকতায় নাথ-যোগপন্থের ঘোর প্রভাব পড়িয়াছিল। তাই বুদ্ধের উপরে শূন্য নিরঞ্জন। তেলি-পা (তিল্লোপাদ) দোহায় বলিয়াছেন, "হঁউ জগু হঁউ বুদ্ধ হঁউ নিরঞ্জণ"। চর্য্যাগীতিতে শূন্য নিরঞ্জনের পরিবর্ত্তে পাই "নৈরামণি"। পরবর্ত্তীকালে বাউল গানে দুইটি শব্দই এক সঙ্গে এবং প্রায় এক অর্থে পাইতেছি,

উঠন ঠন-ঠন করে রে ভাই ঘরে জলের ঢেউ
নৈরামণির নিরঞ্জনে পায় না খুঁজে কেউ।*

হঠযোগের প্রক্রিয়া, বিশেষ করিয়া শ্বাসের ক্রিয়া—প্রাণায়াম,

চর্য্যাগীতি-নির্দ্দিষ্ট সাধনার একটা বড় অঙ্গ ছিল। লুই চর্য্যাগীতিতে বলিয়াছেন, "কুম্ভক-রেচক রূপ দুই পিঁড়িতে আমি বসিয়াছি"। তেলিপা দোহায় উপদেশ দিয়াছেন, "অধ উঘাড়িআ লোচনেঁ ঝানেঁ হোই রে থিত্তি''—নীচের দিকে লোচন উদঘাটন করিয়া ধ্যানে স্থিত হও।

সরহ দোহায় লিখিয়াছেন,

অনিমিস-লোঅন চিত্ত-নিরোহেঁ
পবন নিরূহই সিরিগুরু-বোহেঁ।
পবন বহই সো নিচ্চলু জব্বেঁ
জোই কালু করই কি রে তব্বেঁ॥

অর্থাৎ চিত্ত-নিরোধের দ্বারা অনিমেষলোচন হইয়া শ্রীগুরুর বোধে পবন নিরুদ্ধ হয়। সেই পবন যদি নিশ্চল ভাবে বহে, তবে কি যোগী কালগত হয়?

চর্য্যাগীতিতেও সরহ এই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন,

অম্হে ন জানহুঁ অচিন্ত জোই
জাম মরণ ভব কইসন হোই।
জইসো জাম মরণ বি তইসো
জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসো।

অর্থাৎ আমরা জানি না, যিনি চিন্তাতীত তাঁহার জন্মমরণস্থিতি কি করিয়া হয়। জন্ম যেমন মরণও তেমনি। জীবন্ত ও মৃতের মধ্যে তফাৎ নাই।

পর অপ্পাণ ম ভন্তি করু, সঅল নিরন্তর বুদ্ধ।
এহু সে নিম্মল পরমপউ চিত্ত সহাবেঁ সুদ্ধ॥

অর্থাৎ আত্ম-পর ভ্রান্তি করিও না। সকলই নিরন্তর বুদ্ধ। এই যে স্বভাব-চিত্ত (বা বোধ) ইহাই নির্ম্মল পরম প্রাপ্তি।

কাপালিক যোগীর মত সাধনসঙ্গিনী-গ্রহণ বোধ করি চর্য্যাগীতি-কবিদের মধ্যে কোন কোন সম্প্রদায়ে চলিত ছিল। অন্ততঃপক্ষে কাহ্নের গুডরীর ও শবরে চর্য্যাগীতি হইতে তাহাই মনে হয়। তবে এই যে ডোম্বী-শবরীর সঙ্গে সুরত প্রসঙ্গ[১] ইহা পূরাপূরি কবি-কল্পনা বা যোগ-সাধনার আধ্যাত্মিক সঙ্কেত হইতে পারে। এবং তাহাই অধিকতর সম্ভব। মহাযান-তন্ত্রে যুগনদ্ধ হেরুক মূর্ত্তির উপাসনায় ও ইহার ইঙ্গিত আছে। সরহ দোহায় বলিয়াছেন, যোগিনীর গাঢ় আলিঙ্গনে বজ্রসত্ত্ব লঘু উপসন্ন হন,

জোইনি গাঢ়ালিঙ্গনহি বজ্জিল লহু উপসন্ন।
তত্তু-পআমিঅ তেহি থনে হন্নে দিবঅন দিন্ন

নারী সঙ্গের তীব্র আকর্ষণ উপনিষদে ব্রহ্মানন্দের সহিত উপমিত হইয়াছে। বৈষ্ণব সাধনার পরতত্ত্বও এই রূপককেই আশ্রয় করিয়া পল্লবিত হইয়াছে এবং চর্য্যাগীতির মিষ্টিক্ কবিরা সেই কথাই বলিয়াছেন। দোহায় সরহ স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "হে পণ্ডিত লোক, তোমরা আমাকে ক্ষমা কর। আমি প্রবঞ্চনা করিতেছি না, যতটুকু বলিয়াছি তাহার বেশি বলিবার শক্তি আমার নাই। গুরুর মুখে যাহা শুনিয়াছি, সেই পরম গোপন কথা আর বেশি ভাঙ্গিয়া বলা যায় না। শুধু এই কথাই বলিব যে কমলকুলিশের মধ্যস্থিত সেই যে সুরত-বিলাস তাহাতে ত্রিভুবনে এমন কে আছে যে মুগ্ধ না হয় এবং যাহার আশা পূর্ণ না হয়।"

কয়েকটি চর্য্যাগীতি কাপালিক যোগী-সাধকের লেখা। যেমন কাহ্নের কয়েকটি গান (সংখ্যা ১০, ১১, ১৮, ১৯)। কাপালিক যোগীরা

১ অহনিসি সুরঅ-প্রসঙ্গে জাঅ
জোইনি-জালে রএনি পোহাঅ। [কাহ্ন]

প্রায় উলঙ্গ থাকিতেন, গায়ে ছাই মাখিতেন, গলায় হাড়ের মালা ঝুলাইতেন; তাঁহাদের কানে থাকিত কুণ্ডল, পায়ে নূপুর। হাতে ডমরু লইয়া কাপালিক যোগী নগরে বেড়াইতেন। এই খুঁটিনাটি বর্ণনা কাহ্নের চর্য্যাগীতিতে আছে।

নাথ-যোগীদের বিশিষ্ট ভূষণ-চিহ্ন নাদ-বিন্দু-কুণ্ডলের উল্লেখ সরহের একটি চর্য্যাগীতিতে আছে। নাথ-পন্থের মতবাদও সরহের দোহায় ও চর্য্যাগীতিতে দুর্লক্ষ্য নয়।

সাম্প্রতিক ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা

ভারতীয় দর্শনের প্রাচীন ইতিহাস আমাদের মোটামুটি জানা আছে। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে, সাম্প্রতিক চিন্তাজগতে, আমাদের মনীষীদের দান কতটুকু সে-কথা আজ বিচার করে দেখবার সময় এসেছে। ভারতীয় দর্শন যে কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, আমাদের দার্শনিক চিন্তা যে কেবল অভ্রান্ত শ্রৌত সত্যের ব্যাখ্যা ও পরিবর্দ্ধন নয় —এ কথা যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তিনিই প্রথম দর্শনের বিচারক্ষেত্রে তুলনামূলক সমালোচনা এবং বিতর্কের সাহায্যে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবার পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করলেন। তাঁর *Positive Sciences of the Ancient Hindus* বইটিতে তিনি সাংখ্যদর্শনের গুণ, প্রকৃতি ও পরিণাম প্রভৃতি তত্ত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে

দেখিয়েছেন যে আধুনিক ইউরোপীয় পদার্থবিজ্ঞানের (Physics) ছাঁচে ফেলে সাংখ্যের তত্ত্বগুলির গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা। জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের মতগুলিও সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করলে দেখা যাবে যে সেই সব তত্ত্বের মধ্যে বহু কথা আছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের অনুকূল। আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর *Syllabus of Indian Philosophy*-পুস্তিকাতে যে সকল তথ্যের আভাস দিয়েছেন সেগুলি অবলম্বন করে গবেষণা করলে ভারতীয় দর্শনের অনেক অধ্যায় নতুন করে চিন্তাজগতের সামনে উপস্থিত করা যায়। আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি গবেষণা করেছেন। কিন্তু একমাত্র শ্রীঅরবিন্দ ব্যতীত আর কেউ সত্যিকারের দার্শনিক মতবাদ (system) দিতে পারেন নি। অন্যান্য সাম্প্রতিক দার্শনিকের চিন্তার ফল বিভিন্ন প্রবন্ধে ছড়িয়ে আছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি দানা বেঁধে মতবাদ হিসাবে গড়ে ওঠেনি। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনের মধ্যে খণ্ডনের দিকে যেমন মৌলিকতা আছে, তেমনি মৌলিকতা রয়েছে তাঁর সিদ্ধান্তের মধ্যে। তিনি দেখিয়েছেন যে জড়বাদ ও শুদ্ধ অধ্যাত্মবাদ—দুটোই একদেশদর্শী, কাজেই ভ্রান্ত ; আসল সত্য রয়েছে সমন্বয়ের মধ্যে, সঙ্গতির মধ্যে। ব্রহ্ম অব্যয় হলেও পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে অনুস্যূত। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আত্মপ্রকাশ করছেন বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়ে—যেমন জড়জগৎ, চেতনজগৎ, মানসজগৎ। কিন্তু বিবর্ত্তনের ধারা এখনও চলেছে অব্যাহত গতিতে ; কাজেই অতি-মানসলোকের আবির্ভাব বিবর্ত্তনের নিয়ম অনুসারে অসাধ্য নয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে শ্রীঅরবিন্দ নতুন ধরণের তাদাত্ম্য-জ্ঞানের (knowledge by identity) কথা বলেছেন। আত্ম-জ্ঞানের (self-consciousness) মধ্যেই এই তাদাত্ম্য জ্ঞানের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু

আমাদের মানসলোকের জ্ঞান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান (separative knowledge); আমরা জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—এই দুটি জিনিষের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করি বলেই সত্যিকারের তাদাত্ম্য-জ্ঞান লাভ করতে পারি না। বিবর্ত্তনের নতুন তাৎপর্য্য, অধ্যাত্মজগতে আরোহণ ও অবরোহণ, অতিমানস লোকের অবতরণ প্রভৃতি শ্রীঅরবিন্দের মৌলিক দান।

বহুদিন যাবৎ পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা ছিল। ইংরেজী ভাষায় ভারতীয় দর্শনের নির্ভরযোগ্য, প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করলেন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্, ডাঃ আর. ডি. রাণাডে ও অধ্যাপক হরিয়াম্না। এই ইতিহাস প্রকাশিত হওয়ায় বিদেশী দার্শনিকদের সংশয় ও অবিশ্বাস কিছু মাত্রায় দূর হোল বটে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিঃসংশয় হতে তাঁরা পারলেন না। ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির বিভিন্ন যুগ ও যুগন্ধরদের সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক ভাষণ দিলেন ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। এই ভাষণগুলি *Eastern Lights* নামে একখানি পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। মহেন্দ্রনাথ ভারতীয় দর্শন ও ধর্মের বহু দুর্বোধ্য ও রহস্যময় অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেছেন এবং পাশ্চাত্য দেশ-বাসীদের মনে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলেছেন।

সাম্প্রতিক ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লিখবার সময় এখনও আসেনি। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও গবেষণার কাজ চলছে। 'আধুনিক ভারতীয় দর্শন' নামে যদি কোন যুগের কথা বলা চলে তবে তা' সবে সুরু হয়েছে। আধুনিক ভারতীয় চিন্তাজগতের দুজন মনীষীর কথা এই প্রবন্ধে আলোচনা করব। একজন ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্, অপরজন অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

এক

ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ (১৮৮৮খৃঃ—)

রাধাকৃষ্ণন্ একটি স্বাধীন, সুসংবদ্ধ বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ (system) গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন নি'। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতির মূল সূত্রগুলি জীর্ণ পুঁথির পাতা থেকে উদ্ধার করে আমাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের দর্শনের যোগাযোগ সৃষ্টি করা; তাঁর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হ'ল পাশ্চাত্য দর্শনের পরিভাষার মাধ্যমে ভারতীয় দর্শনের মুখ্য তত্ত্বগুলি সহজ ও সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা। রাধাকৃষ্ণনের ভাষা স্বচ্ছ, সজীব ও সাবলীল। তিনি ভাষার যাদুকর। তাই তাঁর প্রকাশের মধ্যে যে প্রসাদগুণ আছে তাতে দর্শনের শুষ্ক, নীরস তত্ত্বগুলি মনোরম হয়ে উঠেছে এবং পাঠকের মনে এনে দিয়েছে অপরিসীম বিস্ময়। পুরাণো, বহু-ব্যবহৃত তথ্যগুলি তাঁর তুলির স্পর্শে এমন রূপ পরিগ্রহ করেছে যাতে মনে হয় আমরা যেন এক নতুন জগতের সন্ধান পাচ্ছি। রাধাকৃষ্ণনের দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে যদি মৌলিকত্ব কোথায়ও থাকে তবে সে তত্ত্বের নয়, প্রকাশভঙ্গীর। ভারতীয় দর্শনের যে বিশ্লেষণ তিনি করেছেন তার মধ্যে স্বকীয়তা আছে। তিনি ভারতীয় দর্শনের—বিশেষত বেদান্ত দর্শনের অন্যতম ব্যাখ্যাতা হিসাবে সমাদর পেয়েছেন। জীবনের সঙ্গে যোগাযোগ নেই, ভারতের মাটির সঙ্গে যোগাযোগ নেই—এমন এক অভূতপূর্ব নতুন কথা শুনিয়ে চমক লাগাবার প্রচেষ্টা তিনি করেন নি'। গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, সহানুভূতিশীল হৃদয় দিয়ে তিনি অনুভব করেছেন যে আমাদের সংস্কৃতির মূল কথা হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতা পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচায়ক নয়; এ হচ্ছে আমাদের জীবনের জীবন—

আমাদের একমাত্র সত্যিকার পরিচয়। রাধাকৃষ্ণনের জীবনে যে দুটি মতবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে তার একটি হ'ল বৌদ্ধদর্শন, অপরটি বেদান্তদর্শন। অদ্বৈতবাদে তাঁর অনুরাগ অপরিসীম। কিন্তু অদ্বৈতবেদান্তের 'নেতিবাদ' তাঁর মনে বিশেষ ভাবে নাড়া দেয় নি'। রাধাকৃষ্ণন্ মনে করেন যে অদ্বৈতবেদান্তের "নেতি"—অংশের উপর এতকাল বেশী জোর পড়েছে বলেই আমরা শংকরোত্তর যুগে কতকগুলি প্রাণহীন, তর্ক-সর্ব্বস্ব ফরমূলা পেয়েছি। কিন্তু নিছক তর্কের জাল বুনে আর যাই পাওয়া যাক না কেন 'দর্শন' পাওয়া যায় না। রাধাকৃষ্ণন্ বুদ্ধির আবেদন এবং বোধির আবেদনকে পৃথক্ করে দেখেন নি'; তিনি চেয়েছেন এদুটোর সমন্বয় করতে—এই প্রচেষ্টায় তিনি অনেকাংশে সফলও হয়েছেন। যাঁরা শুধু তর্ককেই দর্শনের প্রাণ বলে মনে করেন তাঁদের কাছে নেতিবাদ-বিশ্লেষণ একটি আকর্ষণের বস্তু, কিন্তু নেতিবাদ শেষ পর্য্যন্ত তত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করলে দেখা যায় যে চরম সত্তা শুধু যে নির্গুণে পর্য্যবসিত হয়েছে তা নয়, সে এক মহাশূন্যের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাধাকৃষ্ণন্ বিশ্বাস করেন যে, সেই দর্শনই মানুষের জীবনকে মহত্তর করে তুলতে পারে যাতে ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে সত্যিকারের সমন্বয় করা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণনের জীবনে আছে ভক্তি-বাদের প্রেরণা; তাই তিনি বলেন যে, যে তর্কবিজ্ঞান 'বহু' কে মিথ্যা বলে অস্বীকার করে এবং এক অদ্বৈতকে কেবল সত্য বলে গ্রহণ করে সে তর্ক একদেশদর্শী, ভ্রান্ত তর্ক। উপনিষদের তাৎপর্য্য হচ্ছে 'এক'-এর মধ্যে 'বহু'র সম্ভাবনা আছে; 'বহু'-র মধ্যে 'এক' অনুস্যূত হয়ে আছেন। কাজেই একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি গ্রহণ করা চলেনা। শংকর ও রামানুজের মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলেছেন

রাধাকৃষ্ণন্। তিনি শংকর ও রামানুজ সম্বন্ধে বলেছেন: the best qualities of each are the defects of the other—একজনের সর্বোত্তম গুণগুলি অপরের দোষ হয়ে দেখা দিয়েছে। নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম—দুটোরই তাৎপর্য্য বজায় রাখতে চান রাধাকৃষ্ণন্। শংকর সগুণ ব্রহ্মের ব্যবহারিক সার্থকতা মেনেছেন কিন্তু একে পরম তত্ত্ব বলে স্বীকার করেন নি'। রাধাকৃষ্ণন্ এই মত গ্রহণ করতে রাজী নন; কিন্তু অপরদিকে তিনি মনে করেন রামানুজের মতে যে ব্রহ্ম আমরা পাচ্ছি তা আসলে ব্রহ্মই নয়, তা হচ্ছে ঈশ্বর। চরম সত্যকে সসীম, সান্ত চিন্তাধারার সাহায্যে নিঃশেষে প্রকাশ করা যায় না সত্য; কিন্তু যদি সসীমের ভিতর দিয়েই অসীম ও অনন্তকে প্রকাশ করবার প্রেরণা জাগে তবে রামানুজ-প্রদর্শিত পথেই আমাদের অগ্রসর হ'তে হবে। এই পরিবর্ত্তনশীল জগৎ ও সীমাবদ্ধ সত্তাকে অতিক্রম করবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের সহজাত। তাই যখন মানুষ তর্কের সাহায্যে, অসীম অনন্ত সত্তাকে প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুল হয় তখন আসলে সে সসীম থেকে অসীমে যাত্রা করে না; যে পরিবেশ থেকে তার চিন্তা ও তর্কের প্রেরণা আসে সে পরিবেশ হচ্ছে সসীম-অসীম। মানুষ যখন সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, যখন জ্ঞানের যাত্রাপথে একটির পর একটি অর্দ্ধসত্য ও সত্যকল্পকে পরিত্যাগ করে অপরটিকে যুক্তির কষ্টিপাথরে বিচার করে দেখে তখন তার মনে এই আশাই জাগে যে চরম সত্য অসামান্য ঐশ্বর্য্যশালী; পথের শেষে যে সম্পদ্ সে লাভ করবে তা মহাশূন্য নয়, তা হচ্ছে সচ্চিদানন্দ। এই অপরূপ ঐশ্বর্য্য ন্যায়শাস্ত্রের সূত্রে নিঃশেষে প্রকাশ করা যায় না—এ সত্য অনুভূতি-বেদ্য। রাধাকৃষ্ণন্ মনে করেন যে ভাব (thought) ও সত্তা (being) মূলত এক—এই অভ্রান্ত, একক বচনকে আশ্রয় করে আমরা জ্ঞান অর্জনে প্রবৃত্ত হই। আমার

চিন্তা নিছক চিন্তামাত্র—এর সাহায্যে আমি হয়ত কোনদিনই সত্যের সন্ধান পাব না এই প্রবৃত্তি আত্মঘাতী। মানুষ এই ভাব আশ্রয় করে সত্যানুসন্ধানে অগ্রসর হতে পারে না। রাধাকৃষ্ণন্ মনে করেন ব্র্যাড্‌লি (Bradley) যে ভাবে বচন (judgment)-এর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে আমাদের জীবনের সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুই সামঞ্জস্যহীন, বিরোধাত্মক—তা হচ্ছে ভ্রান্ত, খণ্ডিত দৃষ্টির ফল। আসলে প্রত্যেক বচনের উদ্দেশ্য ও বিধেয় সমানভাবে সত্য ; তাদের মধ্যে বিরোধ নেই ; সেইরকম দ্রব্য ও গুণ সমানভাবে সত্য। এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বলেই রামানুজ পরব্রহ্মকে জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত দেখেছেন। তিনি জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, ব্রহ্ম আত্মা, জগৎ তাঁর দেহ। জগৎ যে ব্রহ্মাশ্রিত, ব্রহ্মের উপর নির্ভর-শীল—এই কথাই বলতে চেয়েছেন রামানুজ। রামানুজ-দর্শনের এই অংশটুকু রাধাকৃষ্ণন্ মনে প্রাণে গ্রহণ করেছেন। জগৎ স্বয়ংসর্বস্ব, স্বাধীন, নিরপেক্ষ সত্তা নয়। দেহ এবং আত্মা যেমন একটি অপরের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তেমনি জগৎ ও ঈশ্বর একটি অপরের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। যুক্তির সাহায্যে যখন রামানুজ-দর্শনের বিচার করা হয় তখন রাধাকৃষ্ণন্ রামানুজের সব কথা মেনে নিতে পারেন না। প্রশ্ন হচ্ছে : ঈশ্বর বা ব্রহ্ম যদি জগতের দ্বারা সংক্রামিত হন তবে জগতের দুঃখ, কষ্ট, পাপ, অন্যায় প্রভৃতিও কি ঈশ্বরকে স্পর্শ করে না ? রামানুজ-দর্শনে এ-প্রশ্নের সদুত্তর মেলে না। এই প্রসঙ্গে একটি সংকটের উল্লেখ করা যেতে পারে : ব্রহ্ম যদি অব্যয়, অপরিবর্তন, বিশ্বাতিগ সত্তা হন তাহলে ইতিহাসের গতি ও কালের পরিণতি তিনি কেমন করে আত্মসাৎ করেন ? অপর পক্ষে যদি ইতিহাসের গতিকেই চরম তাৎপর্য্যপূর্ণ বলে গ্রহণ করা হয় তবে আর অব্যয়, ত্রিগুণাতীত সনাতন

ব্রহ্মকে চরম সত্য বলে স্বীকার করা যায় না। সে ক্ষেত্রে ক্রমবর্দ্ধমান পূর্ণতাকেই চরম সত্য বলতে হয়। অথচ এ দুটি বিকল্পের কোনটাই রামানুজের অভিপ্রেত নয়। রাধাকৃষ্ণন্ স্বকীয় পদ্ধতিতে এই সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করেছেন। প্রশ্নটা হচ্ছে, নিগুর্ণ ব্রহ্ম ও সগুণ ঈশ্বরের মধ্যে সম্পর্ক কি? পরিবর্ত্তনশীল জগতের সঙ্গে অব্যয়, অপরিবর্ত্তন ব্রহ্মের সম্পর্ক কি? নিগুর্ণ ব্রহ্ম হচ্ছেন সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ-রহিত; তিনি অসঙ্গ, নিষ্কল, নিরঞ্জন। জগতের সঙ্গে নিগুর্ণ ব্রহ্মের সম্পর্কের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না, কারণ পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম একমাত্র সত্য, জগতের সৃষ্টি কোনদিন হয়নি। আমরা যে জগৎ দেখছি তা আমাদের ভ্রান্ত দৃষ্টির ফল। সগুণ ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা এবং নিয়ামক; জীব ও জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সত্যিকারের সম্পর্ক। ব্রহ্ম ও ঈশ্বর কি একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ? এ-প্রশ্ন নিয়ে দার্শনিকগণ বহু বিচার করেছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি'। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন: সত্য একই—ভক্তির দিক দিয়ে যখন দেখি তখন বলি ঈশ্বর, জ্ঞানমার্গে যাঁকে পাই তিনি ব্রহ্ম—যেমন জল আর বরফ। শংকরের মতে ঈশ্বরের ব্যবহারিক সত্তা আছে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঈশ্বর ও মিথ্যা। ব্র্যাড্‌লি বলছেন, ঈশ্বর পরমব্রহ্মের প্রকাশ—কিন্তু সে যেন ব্রহ্মের ছায়ার (appearance) মত। রাধাকৃষ্ণন্ এ কয়টি মতের একটিও সমর্থন করেন না। তাঁর মতে ব্রহ্ম কূটস্থ, নির্বিকার নন. ব্রহ্ম গতিশীল, ব্যাপক (dynamic)। ব্রহ্ম হচ্ছেন অসীম শক্তিপুঞ্জের আকর, এই শক্তিপুঞ্জের প্রকাশ হচ্ছে অসৎ থেকে সৎ-এ এবং এর আত্মপ্রকাশের পর্য্যায় (levels) হচ্ছে—জড়পদার্থ, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান। ব্রহ্মের দিক থেকে অবশ্য সৃষ্টির কোন তাগিদ নেই; তবু যে সৃষ্টি আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি—ব্রহ্ম সে সৃষ্ট জগৎ

থেকে মুক্ত। পরম ব্রহ্মের প্রকাশের সম্ভাবনা অনন্ত এবং অনির্দিষ্ট; এই অনন্ত সম্ভাবনার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি ঈশ্বরতত্ত্বে। এ ছাড়া ব্রহ্মের অনন্ত সম্ভাবনা কি ভাবে কখন মূর্ত্ত হবে তা কেউ বলতে পারে না। তাহলে, ব্রহ্মকে যখন্ জগতের পরিপ্রেক্ষিতে দেখি, তখনই তাকে ঈশ্বর বলি। একই সত্যের বিভিন্ন দিক হচ্ছে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর। ব্রহ্ম অনন্ত সম্ভাবনা। ঈশ্বর তারই একটি বিশেষ মূর্ত্ত বিগ্রহ। কিন্তু একটি কথা ভুললে চলবে না যে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর দুইই ভাগবত তত্ত্ব (divine)। রাধাকৃষ্ণন্ বলছেন: 'While the Absolute is the transcendent divine, God is the cosmic divine. While the Absolute is the total reality, God is the Absolute from the cosmic end, the consciousness that informs and sustains the world. God is, so to say, the genius of this world, its ground, which as a thought or a possibility of the Absolute lies beyond the world in the Universal Consciousness of the Absolute. The possibilities or the ideal forms are the mind of the Absolute or the thoughts of the Absolute. One of the infinite possibilities is being translated into the world of space and time. Even as the world is a definite manifestation of one specific possibility of the Absolute, God, with whom the worshipper stands in personal relation is the very Absolute in the world context and is not a mere appearance of the Absolute..........The Absolute is joy: God is love.'[১]

সাধনার সাহায্যে আমি ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারি। কিন্তু ঈশ্বর উপলব্ধি হয়ে গেলে আমি ও ঈশ্বর উভয়ই ব্রহ্মে লীন হ'য়ে যাব। যতক্ষণ

১ *Contemporary Indian Philosophy*, পৃঃ ২৮১—২

সসীম চিন্তাধারা আছে ততক্ষণই তর্কশাস্ত্রের সার্থকতা, ততক্ষণই ঈশ্বর আছেন এবং ভক্ত হিসাবে আমি আছি। কিন্তু ঈশ্বর উপলব্ধি হবার পরে কেবল ব্রহ্ম আছেন। ঈশ্বর প্রেম; ব্রহ্ম আনন্দ। চরম অনুভূতির স্তরে প্রেম আনন্দে লীন হয়ে যায়। রাধাকৃষ্ণন্ ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেন। ব্যক্তিত্বের মূলে আছে আত্ম-সচেতনতা ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বা স্বাধীনতা। আগেই বলা হয়েছে, ব্রহ্মতত্ত্ব যখন সৃষ্টির দিক থেকে দেখি তখনই তাকে বলি ঈশ্বর। কাজেই সৃষ্ট জগৎ হচ্ছে ঈশ্বরের পরিবেশ। এই পরিবেশে তাঁর ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে। ঈশ্বরের দিক থেকে আত্মপ্রকাশের জন্য জগতের প্রয়োজন; আবার জগৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু নয়; জগতের তাৎপর্য্য সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে জগৎকে অতিক্রম করতে হবে।

রাধাকৃষ্ণন্ মনে করেন যে অদ্বৈত বেদান্তে মায়াকে যে 'ভাবরূপ' বলা হয়েছে তা গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ। 'মায়া' কথাটির অর্থ 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' বা 'অলীক' নয়। অদ্বৈতবাদী বলেছেন সৃষ্টি 'সদসদ্ভ্যাম্ অনির্বচনীয়া'—সৃষ্ট জগৎ সৎও নয় অসৎও নয়, অনির্বচনীয়। রাধাকৃষ্ণন্ বলেন যে, সান্ত, সসীম ভাবসম্পদের সাহায্যে অনন্ত, অসীম সত্তার নাগাল পাওয়া যায় না। কাজেই অনন্তলোকের সম্বন্ধে আমাদের পক্ষে অনুমানের আশ্রয় না নেওয়াই শ্রেয়। অনন্ত, অব্যয় ব্রহ্মতত্ত্ব হচ্ছে অনুভূতি বা বোধিগম্য। এখানে মনে রাখা দরকার যে, ফরাসী দার্শনিক ব্যের্গস যে অর্থে 'বোধি' (intuition) কথাটি ব্যবহার করেছেন, রাধাকৃষ্ণন্ তা করেন নি। রাধাকৃষ্ণনের মতে বোধি (intuition) বুদ্ধির (intellect) চাইতে বড় ও বেশী শক্তিশালী। কিন্তু বুদ্ধি ও বোধির মধ্যে কোন বিরোধ নেই; বুদ্ধির পরিপূর্ণতা ও সার্থকতা ঘটে বোধির রাজ্যে। বোধি বুদ্ধির শত্রু নয়। যে বোধি বুদ্ধিকে অস্বীকার

করে বা তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে সে বোধি পরিশেষে ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। বোধি-লব্ধ সত্য বুদ্ধি-রাজ্যের বাইরে আছে, কিন্তু তাই বলে বোধির দরজা বুদ্ধির কাছে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ নয়। সমগ্রের সঙ্গে অংশের যে সম্বন্ধ, বোধির সঙ্গে বুদ্ধির সেই সম্বন্ধ। মানুষের জীবনের সকল চিন্তার মধ্যে অস্ফুটভাবে বোধি অনুস্যূত হয়ে আছে। তাই বোধি-বিমুক্ত চিন্তন শুধু ভাষার খেলা মাত্র। বোধি হচ্ছে সম্যগ্‌দর্শন; বুদ্ধি তারই আংশিক প্রকাশ। শংকরোত্তর যুগের দার্শনিকদের রচনায় বুদ্ধির দীপ্তি আছে, কিন্তু বোধির অন্তরঙ্গ স্পর্শ নাই। সেইজন্য ধীরে ধীরে আমাদের জীবন থেকে দর্শন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাধাকৃষ্ণন্‌ মনে করেন যে দার্শনিকের কাজ লোকলোচনের অন্তরালে বসে নীরবে তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা নয়; তাঁর অন্যতম কাজ হচ্ছে বোধির সোনার কাঠি ছুঁইয়ে পাঠকের বা শ্রোতার মনের সুপ্ত ভাবগুলিকে জাগিয়ে তোলা। কাজেই দর্শন একাধারে প্রকাশধর্মা এবং সৃজনধর্মা। দার্শনিকের জীবনে পরম সম্পদ হচ্ছে 'নৈসর্গিকী প্রতিভা'। এই নৈসর্গিকী প্রতিভা যাঁর নেই তিনি দর্শনের গ্রন্থ রচনা করলেও সত্যিকার দার্শনিক নন।

ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে যাঁদের সামান্য পরিচয় আছে তাঁরা জানেন যে ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গী কেবল তাত্ত্বিক (theoretical) নয়; ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে জীবনের যোগাযোগ অতি নিবিড়। কেমন করে দুঃখকষ্ট থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়, কেমন করে মুক্তিলাভ করা যায়—এই প্রশ্নই ভারতীয় দর্শনের মূল ও প্রাথমিক প্রশ্ন। রাধাকৃষ্ণন্‌ এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যতক্ষণ না পৃথিবীর সকল জীব মুক্তি লাভ করছে ততক্ষণ মুক্তির কোন অর্থ নেই। তিনি সর্বমুক্তিতে বিশ্বাস করেন। রাধাকৃষ্ণন্‌ আশাবাদী। তিনি বিশ্বাস

করেন যে মানুষের জীবনে আজ যে অসঙ্গতি দেখা যাচ্ছে, তার ব্যবহারে আজ যে মালিন্য এসেছে তা একদিন দূর হয়ে নবীন সূর্য্যের স্বর্ণচ্ছটায় তার জীবন আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। মানুষের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত—উভয় জীবনেই যে সংঘাতের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে, যে অসন্তোষের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে, তার মূল কারণ দৈহিক নয়, সামাজিক অব্যবস্থাও নয়। সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে অশান্তি দেখা যাচ্ছে তা হচ্ছে মনের ব্যাধি। মনের পরিবর্ত্তন যতদিন না স্থায়ী কল্যাণের দিকে যাচ্ছে ততদিন সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি দৃঢ় করলেও মানুষ সত্যিকারের সুখ ও সন্তোষ পাবে না।

রাধাকৃষ্ণন্ তাঁর *An Idealist View of Life* ও *Eastern Religion and Western Thought* বই দুটিতে এবং *Contemporary Indian Philosophy*-তে লিখিত নিজের প্রবন্ধে বর্ত্তমান সভ্যতার সংকটের যে প্রতীকার নির্দ্দেশ করেছেন তা হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের পুনরুজ্জীবন। মানুষ যেদিন তার সুপ্ত আত্মাকে আবার জাগিয়ে তুলতে পারবে, সেই দিনই তার জীবনের পথ মঙ্গলময় হয়ে উঠবে। রাধাকৃষ্ণন্ বিশ্বাস করেন যে ধর্ম বা 'রিলিজন্' মানুষের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত; তার চিন্তা ও কর্মের উৎস। 'জপ তপ আর হোম আরাধনা'র মধ্যেই ধর্মের স্বরূপ নিহিত আছে একথা মনে করলে ভুল হবে। এগুলো শুধু ধর্মের বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান। ধর্মের মধ্যে এমন একটি বিশেষ শক্তি আছে যা জীবনকে মহীয়ান করে তোলে, সেবা ও প্রেমে মানুষকে বলীয়ান করে, মানুষকে "অভীঃ"—মন্ত্রে দীক্ষিত করে।

মার্কস্‌বাদ সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণনের মত সুস্পষ্ট। *Religion and Society* বইটিতে তিনি দ্বান্দ্বিক জড়বাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে সামাজিক পরিবেশের উৎকর্ষ, অর্থনৈতিক প্রগতি—প্রভৃতি যে কোন

প্রকারের ঐহিক উন্নতি মানুষের জীবনের একমাত্র চরম লক্ষ্য হ'তে পারে না ; তারা বড় জোর জীবনের লক্ষ্যে পৌছাবার কয়েকটি সোপান মাত্র। মানুষের জীবনে অন্নবস্ত্রের সমস্যা যেমন প্রবল, শ্রেয়োবোধের (Value-sense) প্রশ্ন, ধর্মবোধের প্রশ্ন তার চাইতে কিছুমাত্র কম নয়। ধর্মের বিরুদ্ধে মার্কস্‌পন্থীদের যে আক্রমণ তা ব্যর্থ আক্রমণ। কারণ তাঁরা ধর্মের বিকৃত রূপটি গ্রহণ করেছেন। সত্যিকারের ধর্ম মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনসেতু রচনা করেছে। মার্কস্‌পন্থীদের মতে চরম সত্য বলে কিছু নেই ; সব সত্যই আপেক্ষিক সত্য ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সামাজিক মূল্য (Social values) কে তাঁরা চরম বলেই গ্রহণ করেছেন। যে সামাজিক কর্মী সমাজের নানাপ্রকার অব্যবস্থা ও শোষণ দূর করবার জন্য, দারিদ্র্য দূর করবার জন্য, জীবন পণ করেছেন তিনি কোন্ উদ্দেশ্যের দ্বারা তাঁর জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন? রাধাকৃষ্ণন্ মনে করেন, এই জাতীয় নিঃস্বার্থ কর্মীদের জীবনে প্রেরণা এসেছে অধ্যাত্মলোক থেকে, ধর্মবোধ থেকে। আপাতকল্যাণের দিকে দৃষ্টি থাকলে, অন্নবস্ত্রের সমস্যা-সমাধান একমাত্র লক্ষ্য হ'লে এঁরা কোন দিনই এত বড় যুগান্তকারী বিপ্লবের সূচনা করতে পারতেন না। তাই রাধাকৃষ্ণন্ বলেছেন: 'Unhappiness and discontent spring not only from poverty. Man is a strange creature fundamentally different from other animals. He has far horizons, invincible hopes, creative energies, spiritual powers. If they are left undeveloped and unsatisfied, he may have all the comforts which wealth can give, but will still feel that life is not worth while. What is missing in our age is the soul; there is nothing wrong with the body. We suffer from sickness of spirit'.[১]

---

১ *Religion and Society* পৃঃ ২৩—২৪

যে দিন থেকে আমরা আত্মাকে অস্বীকার করে শুধু বাইরের নিয়ে মেতেছি, সেদিন থেকেই সুরু হয়েছে আমাদের দুর্গতির ইতিহাস। আজকে কল্যাণ লাভের উপায় হচ্ছে তাই আত্মার অনুশীলন (Culture of the Spirit)। জীবনের নোঙর হারিয়ে ফেলেই আমরা লক্ষ্যহীন ভাবে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছি। আর বুভুক্ষু আত্মা আজ তার ক্ষিদে মেটাবার জন্য নানা রকম ভুল পথে ছুটেছে—তারই কয়েকটি নিদর্শন হোল সমাজতন্ত্রবাদ (Socialism), মানবিকতাবাদ (Humanism), ধ্রুববাদ (Positivism) সাম্যবাদ (Communism)। ধর্ম মানুষকে বিশ্বব্যাপী সঙ্কট থেকে উদ্ধার করতে পারবে তা অবশ্য কো গতানুগতিক ধর্মমত নয়—সে হচ্ছে এমন ধর্ম যা আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের সমন্বয় করতে পারবে ; যা মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে মহত্তর, সুন্দরতর লোকের দিকে নিয়ে যাবে।

দুই

অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (১৮৭৫—১৯৪৯)+

সাম্প্রতিক ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে আর একজন চিন্তানায়কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। রাধাকৃষ্ণনের জীবনে লক্ষ্য হচ্ছে আত্মপ্রকাশ ; কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনে আত্মগোপন। কৃষ্ণচন্দ্র দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে যতখানি মৌলিকতা দেখিয়েছেন, ততখানি স্বীকৃতি ও মর্য্যাদা তিনি পাননি। তার কারণ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রকাশিত বই মাত্র দুখানি—*Studies in Vedantism* (Calcutta University) ও *The Subject as Freedom* (Amalner, Bombay.)

+ গত ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ তারিখে কৃষ্ণচন্দ্র ইহলোক থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে যে ক্ষতি হয়েছে তা অপূরণীয়।

বইদুখানির অনেক জায়গা দুর্বোধ্য। তাঁর মতবাদ অবশ্য নানা পত্রিকায় প্রকাশিত বহু প্রবন্ধে বিক্ষিপ্ত রয়েছে। কৃষ্ণচন্দ্রের ভাষা সহজবোধ্য নয়; তিনি যে সকল ভাব (Concept) ব্যবহার করেছেন তা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব এবং সাধারণের কাছে রহস্যময় মনে হবে। কৃষ্ণচন্দ্রের দার্শনিক মতবাদ তাঁর অন্তরঙ্গ কয়েকজন শিষ্যের কাছে পরিস্ফুট হয়েছে। তবে একথা স্বীকার করতে হবে যে কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যবহৃত আঙ্গিকে (technique) দীক্ষিত না হলে তাঁর মতবাদের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা সহজ নয়। কৃষ্ণচন্দ্রের চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁদের প্রভাব গভীর ভাবে পড়েছে তাঁদের মধ্যে কাণ্ট ও শংকরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জৈনদর্শনের স্যাদ্‌বাদ ও অনেকান্তবাদের দ্বারাও তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

কাণ্ট-এর মতে আত্মা সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়; কারণ জ্ঞান মাত্রেই কাণ্টের মতে, বাচনিক জ্ঞান (judgmental knowledge) এবং জ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রিয়োপাত্ত (sense-datum) এবং ভাবসূত্রের (categories) সমন্বয়। কাণ্ট জ্ঞাতা বা প্রমাতা অর্থে 'আত্মা' কথাটি ব্যবহার করেছেন। প্রমাতা সকল বিষয়-জ্ঞানের ভিত্তিস্বরূপ; কাজেই প্রমাতা জ্ঞানের 'বিষয়' হ'তে পারে না। আমি চোখের সাহায্যে সবকিছু দেখি অথচ চোখকে দেখতে পাই না; তেমনি প্রমাতা সকল জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবেদ্য অথচ অপরিহার্য্য ভিত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান। প্রমাতার সাহায্যে বিষয়ের জ্ঞান সম্ভবপর হয়; কাজেই প্রমাতা বিষয়রূপে জ্ঞেয় হয় না। কৃষ্ণচন্দ্র বলেন যে আত্মা বিষয়রূপে অজ্ঞেয় হ'লেও একেবারে অজ্ঞেয় নন। অন্তরূপে আত্মাকে জানবার উপায় আছে; এই জানা অবশ্য চিন্তনের (thinking) সঙ্গে সমপর্য্যায়ভুক্ত নয়। তিনি মনে করেন চরম তত্ত্ব জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—কোনটিই নয়। যে সত্যকে চরম বলে' গ্রহণ

করতে পারি সে হচ্ছে সম্বিৎ (consciousness)। এই চরম তত্ত্বকে কৃষ্ণচন্দ্র বাস্তব (real) বলতে রাজী নন। কারণ বাস্তব ও অবাস্তব এই জাতীয় বিরোধাত্মক কথা জ্ঞান লাভের পরে ব্যবহার করা যেতে পারে; তার আগে নয়। যে মৌলিক তত্ত্ব থেকে আমাদের জ্ঞানের উদ্ভব হচ্ছে তাকে যদি নির্দিষ্ট করে' জ্ঞাতা বা জ্ঞেয় কিছুই বলতে না পারা যায় তবে তাকে অনির্দিষ্ট বা অনির্বচনীয় (Indefinite) বলাই ভাল। এই অনির্দেশ্য (Indefinite) সত্তা থেকেই আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে নানা নির্দিষ্ট বস্তুর আবির্ভাব হয়। 'অনির্দেশ্য' কেন 'নির্দিষ্টে'র মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করল—এ প্রশ্নের মীমাংসা হয় না। অব অনির্দেশ্যকে জানবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বস্তু-বিশ্বের উপর থেকে আমার চিন্তাকে সরিয়ে এনে প্রমাতার উপর ন্যস্ত করা। অন্যভাবে বলা যায় যে, আত্মবোধের ভিতর দিয়েই অনির্দেশ্যকে উপলব্ধি করা যায় এবং এর জন্য সাধনার প্রয়োজন। কৃষ্ণচন্দ্র মনে করেন যে তত্ত্ব-বিস্তার (metaphysics) বিভিন্ন দিক আলোচনা করবার পূর্বে দর্শন বা Philosophy কথার প্রকৃত অর্থ কি সে সম্বন্ধে সম্যক্ বোধ থাকা দরকার। এই জন্যই তিনি *Contemporary Indian Philosophy*-নামক বইটিতে নিজের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে আভাস দিতে গিয়ে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তার নাম "The Concept of Philosophy"। কৃষ্ণচন্দ্র 'দর্শনে'র (Philosophy)-তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দুটি ভুল পথ সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক হ'তে বলেছেন। একদল লোক আছেন যাঁরা বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত উৎসাহী যে দর্শনকে তাঁরা বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে ফেলে দিতে চান; কাণ্ট আংশিক ভাবে এই দিক থেকে অপরাধী। অপর দল দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয় করবার প্রেরণা নিয়ে বিজ্ঞানকে দর্শনের কোঠায় ফেলে দেন। এই গোষ্ঠীতে আছেন, এডিংটন, জীন্স্

ও এই মতের অন্যতম ব্যাখ্যাতা সি. ই. এম. যোড্ (Joad)। Joad তাঁর *Philosophical Aspects of Modern Science*-বইটিতে দেখিয়েছেন যে বৈজ্ঞানিকেরা যতই গভীর থেকে গভীরতর বিশ্লেষণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ততই তাঁরা দার্শনিকের জগতের মধ্যে গিয়ে পড়ছেন। প্রসঙ্গক্রমে এডিংটনের Universal Logos, Symbolic world ও জীন্‌স্-এর Mathematical mind প্রভৃতি তত্ত্ব নিয়ে জোড আলোচনা করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র মনে করেন এ দুটো পন্থাই ভুল পন্থা। এই দুটি পথ অনুসরণ করলে আমরা কোনদিনই দর্শনের (Philosophy) তাৎপর্য্য বুঝতে পারব না।

দার্শনিক হিসাবে কৃষ্ণচন্দ্রের মৌলিক দান হল সম্বিৎ-এর স্তরভেদ দেখানো। কৃষ্ণচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, অনির্দ্দেশ্য সম্বিৎ যখন নির্দ্দিষ্টরূপে প্রতিভাত হয় তখন তার প্রকাশের চারটে স্তর লক্ষ্য করা যায়: মূর্ত্ত চিন্তা (empiric thought), শুদ্ধ বৈষয়িক চিন্তা, (pure objective thought), আধ্যাত্মিক চিন্তা (spiritual thought) এবং অতিক্রান্ত চিন্তা (transcendental thought)। প্রথম পর্য্যায়ের আলোচনা হচ্ছে বিজ্ঞানের লক্ষ্য। শেষ তিনটি স্তর দর্শনের আলোচ্য বিষয়। দ্বিতীয় স্তরের আলোচনার নাম দেওয়া হয়েছে "Philosophy of the object", তৃতীয়টির নাম "Philosophy of the subject" এবং চতুর্থটির নাম হোল "Philosophy of truth"।

বিজ্ঞান আলোচনা করে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সত্তা; দর্শনের জগৎ হচ্ছে শুদ্ধ চিন্তার জগৎ। দর্শনের বিষয়বস্তু অনেক সময় কাল্পনিক বলে মনে হয়; কিন্তু আসলে তা কাল্পনিক নয়। দার্শনিক চিন্তা কতকগুলি বচনের সমষ্টি নয়। কারণ বাচনিক সত্তা (Judgmental content) বিজ্ঞানের রাজ্যে সীমাবদ্ধ। যাঁরা মনে করেন বিভিন্ন

বিজ্ঞানের ফলগুলি সংগ্রহ করে একটা সমন্বয় করাই দর্শনের কাজ তাঁরা ভুল করেন। আসলে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শনের তফাৎ মৌলিক —এখানে রয়েছে পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর তফাৎ। দর্শন বিশ্লেষণ করে স্বতঃসিদ্ধ, স্বাশ্রয়ী বস্তুর সত্তা; বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় স্বতঃসিদ্ধ, স্বাশ্রয়ী নয়, এ হচ্ছে মূর্ত (empirical) বিষয়।

কৃষ্ণচন্দ্রের মতবাদ এত জটিল ও গভীর ব্যঞ্জনাপূর্ণ যে, স্বল্প-পরিসর ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তার পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়। জিজ্ঞাসু পাঠক ডাঃ রাধাকৃষ্ণন্ ও ম্যুরহেড্ সম্পাদিত *Contemporary Indian Philosophy* (George Allen & Unwin) পৃঃ ৬৫—৮৬ পড়লে এই বিষয়ের খানিকটা সন্ধান পাবেন। উক্ত প্রবন্ধে কৃষ্ণচন্দ্র দর্শনের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন: "Philosophy is self-evident elaboration of the self-evident and is not a body of judgments. The self-evident is spoken, but is not spoken *of*."[১]

রাধাকৃষ্ণন্ জীবনকে দেখেছেন সামগ্রিক ও অখণ্ড দৃষ্টি দিয়ে। জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান করা, আপাতবিচ্ছিন্ন অংশের সমন্বয় ও সঙ্গতি সাধন করাই দর্শন ও ধর্মের লক্ষ্য। জীবনের বিভিন্ন প্রকাশকে যাঁরা খণ্ড করে', বিশ্লিষ্ট করে' বিচার করেন তাঁরা জীবন-রহস্যের মূল কথাটি ধরতে পারেন না। কৃষ্ণচন্দ্র দর্শন বলতে কখনই সামগ্রিক সমন্বয় বোঝেন না। তাঁর মতে দর্শনের একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে; এই সীমারেখা অতিক্রম করে জীবনের সমস্ত প্রকাশ ও পরিচয়কে দর্শনের রাজ্যে ঢুকিয়ে নিলে দর্শনের অমর্য্যাদা করা হয় তিনি বলছেন: "There is the problem of piecing together

১ *Contemporary Indian Philosophy.* পৃ ৬৯

the results of the sciences into a world-view. The synthesis wanted is sometimes imagined to be the generalisation of the primary laws of the sciences into more comprehensive laws. To suppose, however, that it can be accomplished by philosophy without the employment of the distinctive technique and methods of science would be nothing short of a presumptucus folly."[১] কৃষ্ণচন্দ্র যুক্তির তীক্ষ্ণ ছুরিকা দিয়ে জ্ঞানরাজ্যের সকল বস্তুকে বিশ্লেষণ করে সত্যের সন্ধান করেছেন। রাধাকৃষ্ণন্ বলেছেন যে, বোধির সাহায্য ব্যতীত শুধু শুষ্ক তর্ক বা বিশ্লেষণ দিয়ে সত্যজ্ঞান লাভ হয় না। বোধি অবশ্য বুদ্ধি বা তর্কের বিরোধী নয়। বোধি-বিমুক্ত চিন্তাকে রাধাকৃষ্ণন্ ব্যর্থ, ভ্রষ্ট চিন্তা বলে নিন্দা করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের মতে দর্শনের কাজ স্বয়ং-সর্বস্ব বস্তুর (self-subsistent object) বিশ্লেষণ ও বোধ। এই বস্তু অবশ্য জ্ঞানের (knowledge) বিষয় নয়, এ হচ্ছে সাধনার (meditation) বিষয়। কৃষ্ণচন্দ্রের সাধনা হচ্ছে অবেদ্য, স্বাশ্রয়ী আত্মাকে উপলব্ধি করবার সাধনা; রাধাকৃষ্ণনের সাধনার লক্ষ্য হ'ল মানুষের সমগ্র জীবনকে, জ্ঞানের সকল বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রকে এক সমন্বয়ের সূত্রে গ্রথিত করা। কৃষ্ণচন্দ্র বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন ও সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের (Aesthetics) সীমারেখা নির্দিষ্ট করে টেনেছেন; রাধাকৃষ্ণন্ জীবন ও জীবনের অভিজ্ঞতা অখণ্ড করে দেখেছেন বলেই এই শাস্ত্রগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধন করবার চেষ্টা করেছেন।

স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে কৃষ্ণচন্দ্রের দার্শনিক মতবাদের প্রাঞ্জল ও পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া সুকঠিন। এই প্রবন্ধে রাধাকৃষ্ণন্ ও কৃষ্ণচন্দ্রের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য দেখাবার প্রচেষ্টা করা হ'ল। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রবন্ধাবলী

* ১ *Contemporary Indian Philosophy.* পৃ ৭৫

ও পুস্তকের মধ্যে সূত্রাকারে লিখিত অনেক বাক্য আছে যার বিশ্লেষণ ও বিস্তার প্রয়োজন। এই সূত্রগুলির সংক্ষিপ্ত রূপের মধ্যে অবশ্য গভীর ব্যঞ্জনা ও অসামান্য সম্ভাবনা সুপ্ত রয়েছে। ভারতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে উত্তরসাধকের কাজ হচ্ছে সেই সূত্রগুলির বিস্তৃত ভাষ্য প্রণয়ন করে আমাদের সংস্কৃতি ও সাধনার ধারাকে অব্যাহত ও অক্ষুণ্ণ রাখা। আশা করি সে দিন খুব দূরে নয়।

ভারতের তীর্থ-ক্ষেত্র

হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হিন্দু তীর্থস্থান সমূহ ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্য আধুনিক যুগ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন নিশীথ আকাশে তারকাখচিত ছায়াপথের মত অসংখ্য হিন্দু নরনারীর ভক্তিসূত্রে গ্রথিত এই তীর্থসংঘ আধুনিক জড়বাদের তমিস্রার মধ্যেও একটি স্তিমিত স্নিগ্ধ আলোকরেখা বিকীর্ণ করিতেছে। তীর্থে গেলেই বর্তমানের আবরণ যেন দেহ-মন হইতে আপনা হইতেই শিথিল হইয়া পড়ে—সুদীর্ঘ ব্যবধানে অন্তরায়িত, বিলুপ্তপ্রায় অতীতের নৈকট্য আবার নূতন করিয়া অনুভব করি। মহাকালের প্রবাহে যে সমস্ত যুগ-মহাদেশ ভাসিয়া গিয়াছে তীর্থগুলি যেন সেই সর্ববিধ্বংসী কাল-মহাসমুদ্রে সেই অতীত যুগসমূহের স্মৃতিচিহ্নমণ্ডিত, বিচ্ছিন্ন দ্বীপ খণ্ডের মত মাথা তুলিয়া আছে। তীর্থের পর্বতচূড়ায় আরোহণ

করিয়া বর্তমানের সমতল ভূমি হইতে অদৃশ্য অতীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন দিঙমণ্ডলের প্রসার আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি। অতীতের নানা সংস্কার-বিশ্বাস-কিংবদন্তী, আমাদের মনের চারিদিকে ভিড় করিয়া আসে; মরু বালুকায় অবলুপ্ত ভক্তি-স্রোতস্বতীর বারিধারা আবার নূতন প্রবাহে কল্লোলিত হইয়া উঠে; যে হৃৎস্পন্দন, অশ্রু-আবেগ ও পুলক-রোমাঞ্চ দীর্ঘদিনের অব্যবহারে অসাড় হইয়া গিয়াছে, তাহারা আবার নূতন করিয়া অঙ্কুরিত হয়। আধুনিক জীবন-যাত্রা হইতে তীর্থপ্রয়াণ শুধু দূরত্বের ব্যবধান নহে, যুগ-ব্যবধানের অতিক্রমণ, শুধু বাহিরের দৃশ্যের পরিবর্তন নয়, মানস পরিস্থিতির অভিনব বিন্যাস, শুধু স্থানে নয় কালে নব প্রতিবেশে পদক্ষেপ।

তীর্থের মহিমা-মাহাত্ম্যের অকুণ্ঠিত স্বীকৃতিতেই অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় ভারতের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। ধর্মের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা পাশ্চাত্য দেশে প্রায় অপ্রচলিত হইয়াছে। মধ্যযুগের ভক্তির আবেশে ইউরোপে যে সমস্ত অপরূপ শিল্পকলার নিদর্শন দেব মন্দির-মালা নির্মিত হইয়াছিল, তাহারা এখনও ভ্রমণকারীকে আকৃষ্ট করে—কিন্তু সে কেবল ইহাদের স্থাপত্য কৌশল ও চিত্র সৌন্দর্য উপভোগের জন্য। প্রোটেষ্টাণ্ট দেশগুলিতে কোন মন্দিরই আর প্রাচীন যুগের মনোভাবের উদ্রেক করে না। ক্যাথলিক দেশসমূহে, বিশেষতঃ ইটালীর জগদ্বিখ্যাত দেবমন্দির গুলিতে ধূপ সৌরভ, স্তিমিত দীপালোক ও আধুনিক জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন, স্নিগ্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন পাষাণ প্রকোষ্ঠ গুলির মধ্যে অতীতের আত্মা এখনও সঞ্চরণশীল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এখানেও ধর্ম বিশ্বাসের পূর্বতন অসংশয় প্রভাব আর নাই। মুসলমানদের মধ্যে ধর্মসাধনার অঙ্গরূপে তীর্থভ্রমণ এখনও প্রচলিত, প্রতি বৎসর বহু ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান মক্কা, মদিনা দেখিয়া তাঁহাদের ধর্ম

প্রবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করেন। হয়ত আরবের মরুপ্রদেশে মধ্য-যুগীয় পরিস্থিতি এখনও কতকটা সাধারণ জীবনযাত্রাতে বর্তমান বলিয়া তথাকার পবিত্র তীর্থস্থানগুলির সঙ্গে সমসাময়িক জীবনধারার একটা সহজ সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু ভারতে প্রগতিশীল মনোবৃত্তির দ্রুত পরিবর্তনশীলতার সহিত প্রাচীন, অপরিবর্তিত ধর্মবিশ্বাসের অবিরোধ, এমন কি দ্বন্দ্ব অবস্থিতি মানব মনস্তত্ত্বের একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিকাশ, এবং এইখানেই ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য।

আজকাল ও কোন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ প্রাচীন তীর্থে গেলে মনে হয় যে একটি মধ্যযুগীয় আব-হাওয়া কতক পরিমাণে তাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। মন্দিরের চারি পাশে যে সহর তাহা আধুনিক; কিন্তু ঠিক মন্দির ও তাহার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে সুদূর অতীতের ছায়া নিবিড়ভাবে সংলগ্ন। দেবতার পূজক-পাণ্ডা গোষ্ঠীর মনে কতকটা সহজ উত্তরাধিকার সূত্রে, কতকটা ব্যবসায় বুদ্ধির প্রেরণায় প্রাচীন ভাবাদর্শ জাগরূক ও সক্রিয়। মনে হয় যেন যেমন দেবতার পূজা পদ্ধতি ও ভোগের উপকরণ হইতে তেমনি পূজক সম্প্রদায়ের চিত্ত হইতেও আধুনিক প্রভাব সযত্নে বর্জিত হইয়াছে। যখন মন্দির-পুরোহিত দেববিগ্রহের প্রাচীন মাহাত্ম্য ও অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে যাত্রীর নিকট উচ্ছ্বসিত বর্ণনা করে, তখন ইহার সবটাই যে অর্থ শোষণের ফিকির-ফন্দি মাত্র তাহা মনে হয় না—তাহার আন্তরিক ধর্ম বিশ্বাস ও কতকটা ইহার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ইহাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে ও তীর্থ-দেবতার প্রভাব অসপত্ন আধিপত্য বিস্তার করে। ইহাদের জীবনে যে সমস্ত প্রধান প্রধান ঘটনা আসে, উন্নতি-অবনতির যে জোয়ার-ভাটা খেলে, তাহার সমস্তই ইহারা দেবতার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত। এমন কি পাণ্ডাদের

মধ্যে অনেকেই কঠিন সংশয়াপন্ন রোগেও চিকিৎসাশাস্ত্র অপেক্ষা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, দেবতার প্রসাদভিক্ষা ও চরণোদকের উপরই অধিক আস্থা রাখে। তীর্থক্ষেত্রে স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেরই মনে একটি সুকুমার, ভক্তিরসসিক্ত ভাবমণ্ডল চিরন্তন মানস সংস্কাররূপে বিদ্যমান থাকে। ইহা হয়ত ধর্মাবেশসঞ্জাত আত্মপ্রতারণা হইতে পারে, কিন্তু সজ্ঞান মিথ্যাচার নয় তাহা সুনিশ্চিত।

কোন কোন ক্ষেত্রে তীর্থ প্রভাব কেবল যে বাহ্য আচার অনুষ্ঠানে নিষ্ঠার প্রেরণা দেয় তাহা নয়। ধর্মের নিগূঢ় মর্ম রহস্যকেও জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করে। ব্রজমণ্ডলে স্থায়ী অধিবাসী এক সাধুর নিকট শুনিয়াছি যে কোন কোন অঞ্চলের নারীদের মধ্যে এখনও কান্তাভাব ও বাৎসল্য রসের প্রাচীন আদর্শ বিদ্যমান। রাস-ঝুলন-দোল উৎসবে সেই সর্বত্যাগী, সর্বজয়ী দিব্য আকর্ষণ ব্রজ গোপীদের আধুনিক প্রতিনিধিদিগকে এক অলৌকিক ভাবানুভূতির রাজ্যে লইয়া যায়; একজন অপরিচিত পুরুষের প্রতিও তাহাদের মনে যশোদার পবিত্র স্নিগ্ধ মাতৃভাব স্ফুরিত হয়। কাশীতে বহুদিন পূর্বে বিশ্বনাথের আরতির সময় একজন মন্দিরসেবকের যে ভক্তিবিহ্বল আকুতির দৃশ্য দেখিয়াছিলাম তাহাতে মনে হয় যে মহাদেব যদি মানবিক আবেদনের আন্তরিকতার প্রতি কোন মূল্য আরোপ করেন, তবে তিনি কিছুতেই এই ভক্তের কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। সেইরূপ প্রায় সমস্ত তীর্থস্থানেই হয়ত এমন সাধক আছেন যাঁহারা ধ্যান-ধারণা ও জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্য দিয়া স্থান-মাহাত্ম্যের স্বরূপটি পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেন, অতীত গৌরবের ধারাটি বর্তমানের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও প্রবাহিত

রাখিতে প্রয়াস পান। অতীতের ভাবলোকের সহিত গমনাগমনের পথটি উন্মুক্ত রাখাই বর্তমান যুগে তীর্থস্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগিতা।

এখন তীর্থযাত্রীর দিক দিয়া বিষয়টির আলোচনা করা প্রয়োজন। যে সমস্ত ভক্ত নর-নারী নানা দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য ও আর্থিক অসুবিধার বাধা উপেক্ষা করিয়া এক অনিবার্য আকর্ষণে চুম্বকাকৃষ্ট লৌহখণ্ডবৎ, পুণ্য তীর্থাভিমুখে প্রয়াণ করেন, তাঁহাদের অদৃষ্টে এক নূতন দেশ দেখার কৌতূহল নিবৃত্তি ছাড়া আর বিশেষ কি পুণ্য সঞ্চিত হয়? অবশ্য যাঁহারা "রথেষু বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" রূপ আশ্বাসবাণীতে পূর্ণমাত্রায় আস্থাশীল তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের পক্ষে তীর্থ-দর্শন, উহার পবিত্র ধূলিরেণুস্পর্শ, মন্দিরে দেববিগ্রহ নিরীক্ষণ ও আনুষঙ্গিক শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের পালনমাত্রই মুক্তির হেতুরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু যে সমস্ত লোকের মধ্যে এই বিশ্বাসের পূর্ণশক্তির অভাব, যাঁহাদের মধ্যে বিবেকবুদ্ধির জাগরণ শ্মশান বৈরাগ্যের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, যাঁহাদের অন্তরে ভক্তিরস-প্রবাহ বর্ষাস্ফীত পার্বত্য নদীর ন্যায় অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া আবার শুকাইয়া যায়, তাঁহারা গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় পাণ্ডা-প্রদত্ত সুফলের মধ্যে কি কোন চিরন্তন কল্যাণ ও চিত্ত-বিশুদ্ধির উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন? আমার মনে হয় খুব কম তীর্থযাত্রীই এই সৌভাগ্যের অধিকারী হন। অবশ্য আমাদের মধ্যে তীর্থদর্শনের পুণ্য সম্বন্ধে যে প্রচলিত ধারণা তাহা মূলতঃ অভাবাত্মক (negative)—পাপের স্খালন, নূতন সুকৃতি অর্জন নহে। আমরা যখন গঙ্গাস্নান করি, বা বৃন্দাবনের পুণ্যস্মৃতিজড়িত রজে গড়াগড়ি দিই বা সমুদ্রের মহিমার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট জগন্নাথদেবের মহিমা উপলব্ধি করি, তখন আমাদের মুখ আমাদের অতীত জীবনের

দিকেই ফিরান থাকে, ভবিষ্যতের দিকে নয়। আমরা অনুভব করি যে এই নবানুভূতির ফলে আমরা অতীতের কলুষমুক্ত হইলাম। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য কোন নূতন আদর্শ স্থির করিয়া, কোন নূতন সংকল্প গ্রহণ করিয়া আমরা কেহই ঘরে ফিরি না। তীর্থদর্শন আমাদের পক্ষে অতীতের ছেদরেখা, ভবিষ্যতের পথনির্দেশ নহে। সুতরাং তীর্থমহিমা আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকের জীবনেই সত্যভাবে প্রতিফলিত হয়। বরঞ্চ অনেক স্থানে দেখা যায়, যে হজমি ঔষধ যেমন উদরিকতাকে প্রশ্রয় দেয়, তেমনি পাপের সহজ প্রায়শ্চিত্ত আমাদিগকে পাপানুষ্ঠানের প্রতিই অধিকতর প্ররোচিত করে। কোটিপতি অসাধু ব্যবসায়ী যেমন ধর্মশালা নির্মাণের দ্বারা তাঁহার অধর্মার্জিত ধনের কথঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার করেন, যেমন লোকহিতৈষণার খ্যাতি ও সুকৃতি ব্যবহারিক জীবনে তাঁহার নীতিবোধকে অসাড় করে, আমাদের পুণ্যলোভাতুর চিত্তেরও অনেকটা সেইরূপ অবস্থা। হয়ত মনের চিরাভ্যস্ত জড়তা খানিকটা কাটিয়া যায়; ভাবাবেগের বদ্ধ জলাশয়ে খানিকটা স্রোতোসঞ্চার হয়; চিত্তের প্রসার ও উদারতা গতানুগতিকতার কক্ষপথকে অতিক্রম করিয়া একটু বৃহত্তর পরিধিতে আবর্তিত হয়; বিস্ময়রসক্ষরণে মানস গ্রহণশীলতা কিঞ্চিৎ বাড়ে। কিন্তু সত্যিকার চিত্তবিশুদ্ধি অনায়ত্তই থাকিয়া যায়। শতচ্ছিদ্র কলসীতে জল আনার মত আমাদের নানা বিক্ষেপে বিপর্যস্ত, দৃঢ় একনিষ্ঠতার অভাবে শিথিলগঠন, রন্ধ্রবহুল মনে তীর্থের পুণ্যপ্রভাব বাড়ী ফিরিতে ফিরিতেই বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত হইয়া নিঃশেষিত হইয়া পড়ে। সুতরাং মানস সংস্কৃতি প্রসারের, চিত্তমার্জনার অনুকূল এত বড় একটি শক্তি প্রায় ব্যর্থতাতেই পর্যবসিত হয়। শেষ পর্যন্ত বিরাট দেবমন্দিরসমূহের শিল্পকৌশল ও স্থাপত্যমহিমার স্মৃতি, পূর্বপুরুষদের উদাত্ত কীর্তিতে কিঞ্চিৎ

আত্মশ্লাঘা ও গৌরববোধ ছাড়া তীর্থভ্রমণের ফল আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির এত বড় একটা বিরাট অবদানকে কিরূপভাবে একটি সত্যই ক্রিয়াশীল অধ্যাত্মশক্তির উৎসে পরিণত করা যাইতে পারে। এই বিরাট শক্তির অপচয় বস্তুত একটি শোচনীয় অবস্থা। যখন আমাদের নৈতিক মান এত নিম্নমুখী, স্বার্থপর ব্যক্তিসর্বস্বতার অভিভবে সমাজ-সংহতি বিপন্ন, সুবিধাবাদের বিষ ক্রিয়ায় উন্নততর ধর্মবোধ মুমূর্ষু, তখন আত্মোন্নতি-সাধনের একটি উপায়কে নষ্ট হইতে দেওয়া ঘোরতর নির্বুদ্ধিতার কাজ। প্রচণ্ড বেগবান জলপ্রপাতকে কেবল শুভ্র ফেনপুঞ্জের ক্রীড়াশীল সমাবেশ, ইহার শীকরসিক্ত বায়ুমণ্ডলকে কেবল ভাববিলাসমূলক ইন্দ্রধনুর রঞ্জনের পট-ভূমিকারূপে দেখিলে ইহার অন্তর্নিহিত প্রেরণার অমর্যাদা করা হয়। তীর্থ-যাত্রার প্রতি হিন্দুর যে সংস্কারগত আকর্ষণ তাহার পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিলে আমদের সামাজিক প্রকর্ষ বিধানের সমস্যা অনেকটা সরল হইতে পারে। তীর্থযাত্রীরা যাহাতে মহাভারতের অশ্বত্থামার ন্যায় দুগ্ধের পরিবর্তে পিটুলি গোলা জল খাইয়া মিথ্যা আনন্দে হর্ষোৎফুল্ল না হয়, আত্মপ্রবঞ্চনার অলীক চিত্ত প্রসাদে বিভ্রান্ত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখা ধর্মনায়কদের একান্ত কর্তব্য। সেই জন্য প্রত্যেক তীর্থে এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা উচিত যাহা উহার মাহাত্ম্যের ও অধ্যাত্মসাধনার সত্যিকার প্রতীক্। ঐ প্রতিষ্ঠানে তীর্থের অতীত ঐতিহ্যকে জীবন্ত রাখিতে হইবে; যে মনোবৃত্তি ও সাধনা হইতে উহার উদ্ভব, যাহাদের অনুশীলনে উহার সার্থকতা তাহাদের বাস্তব রূপটি যেন আধুনিক যুগেও প্রত্যক্ষগোচর হয় সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বর্তমান যুগে তীর্থস্থলের সমস্ত বিশৃঙ্খলা, ইতর কোলাহল

ও নির্লজ্জ বণিকবৃত্তির অন্তরালে যাহাতে অনুসন্ধিৎসু ভাবুকেরা ইহার সত্য পরিচয় পাইতে পারেন, ইহার সঞ্জীবনী রস আস্বাদন করিতে পারেন সে দিকে অবহিত হওয়া কর্তব্য। হয়ত অলৌকিক শক্তির মহিমা আর ফিরাইয়া আনিতে পারা যাইবে না। বৃন্দাবনে কিশোর-কিশোরীর অনুপম লীলামাধুর্য, ভাবগহন, রসঘন মিলনোৎসবটি ভক্তের প্রতীক্ষা-ব্যাকুল নয়ন সমক্ষে আর উদ্‌ঘাটিত হইবে না। নীলাচলে গৌরাঙ্গদেবের ভাব-বিভোর নৃত্যতাণ্ডব-মত্ত দৃশ্যটি আর কালের সর্বগ্রাসী গহ্বর হইতে উদ্ধার করা যাইবে না। কালীঘাটে শ্মশান-বাসিনী কালীর ভয়াবহ অথচ বরাভয়দাত্রী মূর্তিটি আধুনিক বিলাস-বৈভবের প্রতীক সৌধমালার অন্তরালে অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু বাহিরে যাহা মিলিবে না, অন্তরে তাহার প্রতিচ্ছবি যদি না জাগে, তবে বৃথাই ভক্তের আকিঞ্চন ও তীর্থযাত্রীর পথক্লেশ স্বীকার। যাহা বস্তুরূপে কাল-মহাসাগরে বুদ্‌বুদ-বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে ধ্যানগম্য আদর্শরূপে, নিগূঢ় ভাবানুভূতিরূপে, অন্তরের পুলক-কণ্টকিত রোমাঞ্চরূপে, সংসার যাত্রাপথের অক্ষয় পাথেয় ও প্রেরণারূপে মানস-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই অনুভূতির পুনরুদ্ধার ও অন্তর-মধ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠাই তীর্থের আসল কাজ।

অনেক হয়ত মনে করিবেন যে উপরে পরিকল্পিত আদর্শ অসম্ভব রকম উচ্চ ও বাস্তব জীবনে অনধিগম্য। কিন্তু পুণ্যতীর্থে যদি এই আদর্শ রূপায়িত না হয়, তবে ইহার মাহাত্ম্য কোথায়? এক একটি তীর্থ এক এক রূপ অধ্যাত্ম সাধনার সার্থক অনুশীলন-ক্ষেত্র; দুরূহ তপশ্চর্যায় সিদ্ধিলাভ, অসাধ্য সাধনই ইহার মহিমার হেতু। প্রত্যেক তীর্থে লোকলোচনের অগোচরে এখনও হয়ত অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা নিজ জীবনে ইহার গৌরবরশ্মিচ্ছটা বিচ্ছুরিত করার

সাধনায় নিমগ্ন। তীর্থযাত্রীর দল ইহাদের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ পায় না। তাহাদের পাণ্ডা-নিয়ন্ত্রিত ভ্রমণসূচী কয়েকটী বাহিরের জাঁকাল দৃশ্য ও কাল্পনিক স্মৃতিচিহ্ন প্রত্যক্ষ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাহাদের রসনা খোলস অতিক্রম করিয়া রস-মধুর শাঁস পর্যন্ত পৌঁছায় না। যদি সত্যিকার তত্ত্বজিজ্ঞাসু যাত্রীদের সহিত এই সমস্ত সাধকের সংযোগ স্থাপনের কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় তবে ইঁহাদের তীর্থ-ভ্রমণের উদ্দেশ্য অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও সিদ্ধ হইতে পারে। ভগবান দেখা না দিলেও ভক্ত ও সাধক এখনও সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হন নাই। প্রত্যেক ধর্মমতের গৌরবোজ্জ্বল যুগসমূহে যে সমস্ত ভক্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সাধনা ও ক্রিয়াকলাপ এখনও আমাদিগকে প্রভাবিত করে। বৃন্দাবনে নন্দনন্দনের দর্শন না মিলিলেও, প্রথম যুগের চৈতন্যপরিবার গোষ্ঠীর সাধনা-ধারা এখনও অনুভবগম্য ও অনুকরণ-সাধ্য। ষড় গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, শ্রীনিবাস আচার্য প্রভৃতি যে আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিলেন, যে সর্বত্যাগী নিষ্ঠার সহিত তাঁহাদের ধর্মানুশীলনে ব্রতী ছিলেন, আজকার বৃন্দাবন যাত্রী অন্ততঃ সেই সাধনার উপযোগী আশ্রমের একটি আধুনিক সংস্করণ প্রত্যক্ষ করিবার আশা করে। বৃন্দাবনে বাসনের চাক্‌চিক্য ও নামাবলীর রং-বেরংএর বিচিত্রতার অতীত একটি বৈষ্ণবোচিত ভাব সৌকুমার্য ও মাধুর্য রসের অনুশীলন তাহাদের অন্তরকে স্পর্শ ও দ্রবীভূত করিতে পারে। বারাণসীর শাস্ত্র চর্চা, বিষয়-বৈরাগ্য ও চিত্তস্থৈর্য কি কোন আধুনিক মঠের জীবনযাত্রাতে রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না? সমুদ্রকল্লোলমুখর পুরীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের সিংহাসনতলে যে ভাবোল্লাস স্তব্ধ হইয়া আছে, যে অসীমের আহ্বান আকাশ বাতাসে পরিব্যাপ্ত, সাম্যবোধের যে উচ্ছ্বাস সাগরতরঙ্গের ন্যায় আমাদের চিত্তের বেলাভূমিকে

প্লাবিত করে, কোন জীবন্ত প্রতিষ্ঠান কি সে দুর্বার প্রেরণায় ভাব-নির্যাসটুকু ধরিয়া রাখিয়া জনসমাজে বিতরণ করিতে পারে না? এই সমস্ত পুণ্যস্থলে অধ্যাত্মশক্তির যে অনু-পরমাণু সমূহ স্বয়ংসম্পূর্ণ নির্জনতায় ধ্যানরত আছেন, তাহাদিগকে কি একত্র করিয়া একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠানের মিলিত, জীবন্ত শক্তিতে পরিণত করা অসম্ভব? ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রোজ্জ্বল দীপশিখাগুলিকে কি একটি দীপালি মহোৎসবে কেন্দ্রীভূত করা যায় না?

আজকাল তীর্থক্ষেত্রে দুর্নীতি ও অনাচার দমনের জন্য রাষ্ট্রনেতারা আইন প্রণয়নের কথা চিন্তা করিতেছেন। ইহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এহো বাহ্য। তীর্থে পুঞ্জীভূত প্রসুপ্ত অধ্যাত্ম-শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ইহার অপরিমিত সঞ্চয় হইতে জাতীয় জীবনের রিক্ততার পরিপোষণই হইল আসল সমস্যা। ইহার জন্য প্রয়োজন হিন্দুধর্মের প্রাণশক্তির নবীভূত স্ফুরণ, ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি গোষ্ঠীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও ধর্ম ও সমাজনেতাদের প্রতিষ্ঠান সংগঠনশক্তি। হিন্দুধর্ম হিমালয়ের উন্নত শৃঙ্গের ন্যায়ই নিজ সমুন্নত ভাবাদর্শে কালজয়ী মহিমায় দাঁড়াইয়া আছে ইহা আমাদের গৌরবের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাকে কেবল আমাদের জীবনের সুদূর পটভূমিকায় সন্নিবিষ্ট আকাশের নীলিমার সহিত অভিন্ন একটি দিগন্ত প্রসারিত, অতিকায় অধ্যাত্ম প্রাকারের মত দেখিলে চলিবে না। ইহার অঙ্গ হইতে দ্রবীভূত ভাব-মাধুর্য, সঞ্জীবনী পীযূষধারা, হিমালয়প্রবাহিনী ভাগীরথীর মত, আমাদের বাস্তবজীবনকে যদি সরস ও ঐশ্বর্যশালী করিয়া তোলে তবেই ইহার সার্থকতা। অতীত মহিমার অভ্রভেদী নিশ্চল পাষাণস্তূপের মধ্যে প্রাণধারার দুরন্তবেগবতী ভাব-নির্ঝরিণীর আবিষ্কার ও উহাতে অবগাহনই আমাদের জীবনে কালোপযোগী শক্তি ও কালাতীত শান্তি আনিয়া দিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক

রবীন্দ্রনাথের চিরচঞ্চলা কাব্যলক্ষ্মী 'রূপ হ'তে রূপে,' প্রাণ হ'তে প্রাণে' নিত্য নবীনা, 'নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে' নিত্য বিচিত্র রূপা। তাঁর নাট্যভারতীও তাই, তিনি নবরসরুচিরা, নব নব তাঁর রূপ, বিচিত্র তাঁর প্রসাধনকলা। কখনও তিনি গীতি-কলকণ্ঠী, সংগীতে সুরের মোহজাল রচনা ক'রে চলেছেন; কখনও উচ্ছ্বসিত-আবেগ ঘটনাবর্তে ভ্রুকুটি-কুটিল আরক্তনয়না ভীষণা, কখনও বা নিপুণা নটীর মতই লাস্যময়ী, বিদ্যুৎচঞ্চলা। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে রচনা করেছেন গীতি-নাট্য; পরে কথানাট্য এবং সর্বশেষে নৃত্যনাট্য। কোন শ্রেষ্ঠ সমালোচক বলেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের পরিণতি সংগীতে এবং নাটকের পরিণতি নৃত্যে। উক্তিটি একান্তভাবে সত্য। শেষতম রবীন্দ্রতীর্থে যাত্রী বস্তুভারমুক্ত যে অসীমের মহাস্পর্শ লাভ করে তা এই গীতে এবং নৃত্যে আভাসিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এবং নাটকে এমনই করেই সীমা অসীমের পথে যাত্রা ক'রেছে। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন, 'আমার তো মনে হয় আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলনসাধনের পালা।' এই কথা রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্বন্ধে যতখানি সত্য নাটক সম্বন্ধেও ততখানি সত্য। এর কারণ, তাঁর জীবনব্যাপী সাধনা এই সত্যকেই প্রকাশিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথের কথানাট্য বিশেষ করে সাংকেতিক নাটক এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সাংকেতিক নাটক অজানিত রহস্য-সংকেতে

আভাসিত হ'লেও কথা নাট্যেরই অন্তর্গত। এগুলি গীতিনাট্যও নয় আবার নৃত্যনাট্যও নয়। ঘটনা বা চরিত্রের সংঘাতের চাইতে বিশিষ্ট ভাব বা আদর্শ সংঘাতের রূপায়ন রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ সন্দেহ নেই, তবু তাঁর কথা-নাট্যের দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তরে "রাজা ও রাণী," "বিসর্জন," "মালিনী" ও "তপতী" প্রভৃতি যেগুলি অপেক্ষাকৃত বস্তুলীন, যেখানে ঘটনার আবর্ত বা সংঘাত তীব্র পাক খেয়ে চলে আর দ্বিতীয় স্তরে "ফাল্গুনী," "অচলায়তন," "মুক্তধারা," "ডাকঘর," "রাজা," "রক্তকরবী" প্রভৃতি সাংকেতিক নাটক যেগুলিতে ঘটনার অপেক্ষাকৃত বিরলতা এবং যেগুলি অন্তর্লীন সত্য-সুন্দরের মহিমায় আভাসিত।

প্রথম স্তরের নাটকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। এগুলি প্রধানতঃ বহির্ঘটনার সংঘাতমূলক। এখানে মানুষের আদিম বা মৌলিক প্রবৃত্তির উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হ'য়েছে। দুর্দান্ত প্রেম, অবিমৃশ্যকারিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, রাজ্যলিপ্সা, ঈর্ষা, সন্দেহ, তীব্র ভোগ-লালসা প্রভৃতি আদিম মনোবৃত্তি (যা স্থূল, সার্বজনীন এবং সহজাত) সমূহের এক বা একাধিক সেক্সপীয়রের ট্রাজেডি নাটক সমূহের প্রধান উপজীব্য। রবীন্দ্রনাথের নাটক সমূহে এগুলির স্বাধীন স্ফূর্তি এবং অবাধলীলা না থাকলেও দুর্দান্ত প্রেম ও কর্তব্যবোধ, অথবা চিরাচরিত ধর্মসংস্কার (যা কুসংস্কারের নামান্তর মাত্র) ও মানবধর্ম প্রভৃতির দ্বন্দ্ব মুখ্যতঃ প্রকাশ লাভ করেছে। সেক্সপীয়রের নাটকে জননায়ক, সম্রাট, সেনাপতি, রাষ্ট্রনায়ক প্রভৃতি অভিজাত মানুষের আদিম বা মৌলিক মনোবৃত্তির (elemental passion) স্বৈরাচারের সঙ্গে রাজ্যের ভাঙাগড়া বা রাষ্ট্রীয় উত্থান পতনের ইতিহাস জড়িত হ'য়ে এইসব মনোবৃত্তি দানবীয় মূর্তিধারণ ক'রেছে। এদের প্রাণান্তকারী একাধিপত্য

তাঁর নাটকের চরিত্রগুলিকে অসামান্য বিরাটত্ব ও মহত্ব দান করেছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকেও এদের স্বৈরাচার বজ্রকঠিন আদর্শের সংঘাতে বারবার ব্যাহত হ'য়ে ভেঙে পড়েছে। প্রবৃত্তি ভেঙে পড়ে কিন্তু আদর্শ হারায় না। তাই নাটকের পরিণামে দেখা যায় ভয় ও করুণার সংগে শান্ত সমাহিত মহিমার প্রতিষ্ঠা।

সেক্সপীয়রের ট্রাজেডির পরিণামে একটা শোচনীয় অপচয়ের (impression of terrible waste) বিহ্বলতা সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন ক'রে দেয়। আমরা যেন সভয়বিস্ময়ে চীৎকার ক'রে বলে উঠি; 'মানুষ এত সুন্দর, আবার এত ভয়ংকর! আর এমনিক'রেই যদি তার সৌন্দর্য ও মহত্ব ধূলায় বিলুণ্ঠিত হ'বে তবে তার কি প্রয়োজন ছিল?'

রবীন্দ্রনাথের ট্রাজেডিতে কিন্তু মহাক্ষয় অপেক্ষা মহাশান্তির বাণীই উচ্চকিত। 'অশান্তির অন্তরে যথা শান্তি সুমহান।' এই সুমহান শান্তিই পরিণামে সূচিত। তাঁর মতে, 'অশান্তির সুর কেবল মাঝের কথা, শেষের কথা নয়।' চরম কথাটা হ'চ্ছে শান্তং শিবমদ্বৈতম্। রুদ্রতাই যদি রুদ্রের চরম পরিচয় হ'তো তাহ'লে সেই অসম্পূর্ণতায় আমাদের আত্মা আশ্রয় পেত না। তাইতো মানুষ তাঁকে ডাকছে, 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম।' অশান্তির সমুদ্র—বিক্ষুব্ধ তরংগ এই জ্যোতির্ময়ের দিকেই আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। সেক্সপীয়রের নাটকে ভয় ও বিস্ময়ের সংগে জড়িত ক্ষয়বোধের মহাবিষাদ আর রবীন্দ্রনাথের নাটকে ভয় ও বিস্ময়কে অভিভূত ক'রে প্রকাশিত শান্তির ললিতবাণী। সেক্সপীয়রের নাট্যাদর্শ রবীন্দ্রনাথের প্রথম স্তরের নাটকে কথঞ্চিৎ অনুসৃত তাই এই আলোচনার প্রয়োজন ছিল। আর সাংকেতিক নাটক আলোচনার ভূমিকায় এর

প্রয়োজন এইজন্য যে এখানে সৌন্দর্য, শান্তি, এবং অমর্তলোকের আভাস জীবনে নিবদ্ধ; সাংকেতিক নাটকে তারই মহত্তর প্রকাশ জীবনোত্তর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

দ্বিতীয় স্তরে সাংকেতিক নাটক। গুহাহিতকে রূপ দেওয়া অনন্ত অতীন্দ্রিয় লোকের রহস্যভরা সৌন্দর্যের রূপায়ন এই ধরণের নাটকের অর্থাৎ সাংকেতিক নাটকের বৈশিষ্ট্য। এর প্রধান লক্ষ্য, অরূপ ও অসীমের রহস্য সন্ধান। জীবনের দুই সীমান্তে অন্ধকার—অব্যক্ত রহস্যেভরা; মধ্যে যতটুকু ব্যক্ত তাও সম্পূর্ণ জানিত নয়। এই অনালোকিত, অনাবিষ্কৃত রহস্যময় জগৎকে (যা জীবনকে এবং জীবনোত্তরকে ঘিরে বিরাজিত রয়েছে) সংকেতিত করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য—এ এমন দেশ যে বাক্য এখান থেকে প্রতিহত হ'য়ে ফিরে আসে। একে আভাসে ইংগিতে—মনশ্চক্ষুর গোচরে আনতে হবে তাই এই নাটকের আংগিকের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। এ নাটক যতখানি ভাবায় ততখানি মাতায় না—যতখানি মগ্ন করে ততখানি উত্তেজিত করে না। অবচেতন লোকের অনালোকিত অন্ধকারে—আত্মার গহনে অথবা মৃত্যুর মধ্যে যে রহস্য অনুভূত হয়, অভাবিত না হলেও যা একান্তভাবে অনির্বচনীয় তাকে বচনীয়তার সীমায় ধ'রে দিতে হ'বে। আধখোলা দ্বারের স্বল্পালোকিত পথে রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায়,—তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় অথচ তাকে প্রকাশ করার ভাষা নেই। সাংকেতিক নাটকের রচয়িতাকে এমনই এক সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। দ্বন্দ্বসংঘাতময় বহির্ঘটনার প্রাধান্য; আবেগ-উত্তেজনাপূর্ণ উচ্ছ্বসিত জীবনের বর্ণনা এবং প্রবৃত্তির ঘনঘটা বিচ্ছুরিত বর্ণালিম্পের স্থান এখানে নেই, এখানে রচয়িতা তলিয়ে যান অন্তরের অতল গভীরে,

আত্মার গহনে যেমন ডুবুরি তলিয়ে যায় নিরন্ধ্র অন্ধকার গভীর সিন্ধুতলদেশে আর তারই মত রতন কণিকা কুড়িয়ে আনে যা তলদেশের অজানিত রহস্যের নিঃসংশয়িত অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়—তার ভয়ংকরতা সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলে অথচ যার কূলকিনারা করা যায় না। শুধু নিশ্চিত ধরার মাঝে অধরার আভাসটুকু ছুঁইয়ে দিয়ে জীবনের সীমাকে বর্দ্ধিত করা যায়, জীবনকে মহত্তর সম্পদে বিভূষিত করা যায়। তাই দেখা যায়, একজন বৃদ্ধ আরাম কেদারায় বসে জীবনের যে রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারে—প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বসংঘাতময় জীবনসমুদ্রের মহাকল্লোলেও তার কিছু শোনা যায় না।

প্রথম স্তরের নাটক যদি জীবনের কাহিনী হয়, এ নাটক জীবনোত্তরের কাহিনী। সাংকেতিক নাট্যকার প্রাক্তন সংস্কার ব সাধনার বলে জন্মপূর্বলোকে ও মৃত্যুর মহালোকেও হানা দিয়েছেন—সত আহরণ ক'রেছেন এবং জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা মৃত্যুরহস্যে সমাধান করতে উদ্যত হ'য়েছেন। তাই সাংকেতিক নাটক রচয়িত শুধু জীবনরসের রসিকই নন, জীবনোত্তরও এঁদের সাধনা প্রকাশিত। তাই এঁরা মরমী কবি বা mystic আখ্যা পে থাকেন। এছাড়া সাংকেতিক নাটকের অন্য একটি ধারা আছে প্রথমেই বলা হ'য়েছে, জীবনের অব্যক্ত রহস্য (জীবনোত্তরকে ঘি যার প্রকাশ) অথবা মনের অবচেতন লোকে যে-সব অপরিচিত ব অর্ধপরিচিত প্রাণীর আনাগোনা সাংকেতিক নাটকে তাদের রূপায়ি করা হয়। এখানে কিন্তু নাট্যকার জীবনের ক্ষেত্রে নিত্যক্রিয়াশীল কো সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ধর্মীয় নীতি, অন্ধশক্তি বা আদর্শবাদকে অবলম্ব ক'রে নাটক রচনা করেন—যেমন জড়বাদ, সাম্রাজ্যবাদ বা অন্ধসংস্কার যারা একদিন স্বাভাবিকভাবেই জীবনে উদ্ভূত হ'য়ে মানুষের স্বাভাবি

বিকাশের পথেই সহায়তা ক'রেছিল আর পরবর্তীকালে যারা নানা কারণ নানাবিধ স্বার্থের সংগে জড়িত হ'য়ে অস্বাভাবিক রূপান্তর গ্রহণ ক'রেছে এবং জীবনের স্রোতে জটিল আবর্তের সৃষ্টি করে শাশ্বত কল্যাণের পথ রুদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের "মুক্তধারা" "রক্তকরবী" "অচলায়তন" এই ধরণের নাটক। এরূপ নাটকে সভ্যতার বিশেষ স্তরে কোন বিশেষ সমস্যা বা ব্যাধির কথাই বড়ো হ'য়ে দেখা দেয়। তবে অ[illegible] ক্ষেত্রেই সাময়িক সমস্যাকে অতিক্রম ক'রে এরা চিরন্তন সমস্যার দিকে আমাদের জাগ্রত ক'রে তোলে, অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের চিরন্তন সমস্যার দিকটি অপ্রকাশিত নেই। যন্ত্রদানবের অনাসৃষ্টিকে বৃহত্তর যন্ত্রসৃষ্টি ক'রে অপসারিত করা যাবে না, প্রাণ দিয়ে তাকে ঠেকাতে হবে অর্থাৎ অন্যায়কে বৃহত্তর অন্যায়ের দ্বারা ঠেকানো যায়না অথবা সভ্যতা যেখানে জটিলতার সৃষ্টি ক'রে স্পর্ধিত বাধার জগদ্দল পাথরের মূর্ত্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে তাকে বিনষ্ট করতে যৌবশক্তির মহামৃত্যু বরণের প্রয়োজন আছে—এই কথাগুলি সাময়িক নয়, চিরন্তন সত্যের আভাস।

এমন ব্যাপারে আংগিকের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এবং নিম্নলিখিত ভাবে সে পরিবর্তন সাধিত হ'য়েছে :—

(১) বহির্ঘটনার বিরলতা

(২) গতিশীল ঘটনা অপেক্ষা পরিস্থিতির উপর অধিক জোর দেওয়া।

(৩) সরব বাক্য অপেক্ষা নীরব সংকেতের প্রাধান্য।

(৪) আলো-আঁধারি দৃশ্যাবলি—অন্ধকারাচ্ছন্ন গুহা, সমুদ্রবেষ্টিত পরিত্যক্ত দুর্গ, আধখোলা দরজা ও অর্থহীন অদ্ভুতদৃশ্য ('রক্তকরবীর' জালাবরণ) প্রভৃতির সাহায্যে কবি নিগূঢ়, অব্যক্ত, ভাষায় অপ্রকাশ্য রহস্যের সন্ধান দেন।

(৫) চরিত্রসৃষ্টিতে প্রাণাবেগ অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্য; ফলে মানব রসের অপেক্ষাকৃত হানি।

(৬) সজ্ঞানে কোন একটি তত্ত্বের রূপায়ন।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকে আংগিকের এই সকল পরিবর্তন সাধারণভাবে লক্ষ্য করা যায়। পরিবেশ রচনা, চরিত্রসৃষ্টি, তত্ত্বপ্রকাশ প্রভৃতি ব্যাপারে এগুলি ব্যাখ্যাত হ'বে। তার নাটকে কিন্তু বহির্ঘটনার বিরলতা থাকলেও সরব বাক্যের বিরলতা নেই, এই উক্তি বোধ করি মিথ্যা নয়।

পূর্বেই বলা হ'য়েছে যে সাংকেতিক নাটকে ঘটনার একটানা প্রবাহ অপেক্ষা পরিস্থিতি বা ভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'য়ে থাকে। অন্যান্য নাটকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা ও প্রাণবান নরনারীকে আশ্রয় ক'রে কাহিনীর সচল প্রবাহ তীব্রভাবে পাক খেয়ে ছুটে চলে। কিন্তু ঘটনার বিরলতা হেতু একটি ভাবের পরিমণ্ডল রচনা করতে হয়, মন তাকে আশ্রয় করে হয় গভীরতায় ডুবতে থাকে নয় দৃশ্যমান বস্তুর ঊর্ধ্বে উঠতে চেষ্টা করে। সাংকেতিক নাটকের 'পথের' দৃশ্য শুধু বাস্তব পথেরই সন্ধান দেয় না সুদূরের রহস্যের সংকেতাভাসও করে। দৃশ্যাবলি বা মঞ্চসজ্জা লক্ষ্য করলে এ-কথার তাৎপর্য বোঝা যায়। এই সকল শুধু স্থানকে জুড়ে বসে না, মনকেও অধিকার করে। এরা নাটকের অপরিহার্য অংগ এবং চরিত্রগুলির মতই প্রয়োজনীয়। অনেকস্থলে এরা বর্ণিতব্য বিষয়ের সংকেতাভাস, যেন নাটকের প্রবেশ দ্বার। নাটকের ভাবলোকে উত্তীর্ণ হ'তে গেলে এদের সহায়তা না হ'লে চলে না। তাই এরা সাধারণ দৃশ্যসজ্জার অনুরূপ নয়। অভিনয়কালে এগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে। 'ডাকঘর' নাটকের শেষদৃশ্য এবং অপর কয়েকটি

নাটকের পটভূমিকা আলোচনা করলে এ-কথার সত্যতা বোঝা যাবে।

'ডাকঘর' নাটকের দৃশ্যযোজনা সুচিন্তিত বা সুপরিকল্পিত-বিশেষ করে শেষ দৃশ্যটি। এই নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। দৃশ্যসজ্জা কিছুতেই মনঃপূত হয়না এমন সময় অবনীন্দ্রনাথ একটি শূন্য দাঁড় এনে মঞ্চের একান্তে ঝুলিয়ে দিলেন। শূন্যদাঁড়-শিকলটি নীচে ঝুলে পড়েছে। দৃশ্যের অপরূপ রূপান্তর ঘটলো। সত্যই দৃশ্যটি যেন এতক্ষণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হ'ল। শূন্য দাঁড়ের সংকেতটি অর্থহীন নয় (অবশ্য সাধারণ নাটকে এর কোন বিশেষ অর্থ নেই)। আপাত-দৃষ্টিতে বস্তুটি একান্ত তুচ্ছ হ'লেও মুহূর্তে নাটকের মর্মকথাটি প্রকাশ ক'রে দিল। সমস্ত বাঁধন কেটে বিহংগ উড়ে গিয়েছে। নীল আকাশের স্বপ্ন, সবুজবনের শ্যামল মায়া, দিশাহীন সুদূরপথের অন্তহীন রহস্য তাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছে। নিরাপত্তার বাঁধন, সুখের বাঁধন কিছুতেই তাকে ধরে রাখতে পারেনি। (এই সূত্রে বলে রাখা ভালো যে বিহংগ রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত একটি প্রিয় প্রতীক।) সুদূরের পিয়াসী অমলের কথাটিও কি তাই নয়? পৃথিবীর সহস্র মায়াবন্ধন আকুল আগ্রহে বাহুবিস্তার ক'রে তাকে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু ডাক আসে সুদূরের, বন্ধন হয় শিথিল, হয় ছিন্ন, অমল চলে যায় মুক্তপক্ষ সিন্ধু-বিহংগমের মত সুদূরের স্বপ্নে মগ্ন হয়ে। শূন্য দাঁড় দর্শকের মনে এইসব কথাই উচ্চকিত ক'রে তোলে। এটি দেওয়ার পরে বুঝতে পারা যায়, না দিলে নাটকের কতখানি অংগহানি ঘটতো। এর থেকে বলা যায় না কি যে এটি যোজনা করার একান্ত প্রয়োজন ছিল এবং এর দ্বারা নাটকের রহস্যটি আরও ঘনীভূত হ'য়ে উঠেছে—এটি নাটকের বহিরংগ নয় কি?

'ফাল্গুনী'-নাটকের শেষ দৃশ্য গুহাদ্বারে। দ্বারপথে চন্দ্রহাস বুড়োর সন্ধানে গুহামধ্যে প্রবেশ করলো। যখন ফিরে এলো তখন দেখা গেল বুড়োর জীর্ণ আবরণ গিয়েছে খসে। যাকে দূর থেকে বুড়ো ব'লে মনে হ'য়েছিল সে বালক-বেশে ফিরে এসেছে। ছদ্মবেশ পরিত্যাগ ক'রে বসন্তের রূপরসে সঞ্জীবিত হ'য়ে ফিরে এলো সেই বুড়ো। দেখা গেল যিনি জীর্ণ, যিনি শীত তিনিই বসন্ত প্রাণরসে ভরা ধরণীর ধ্যানভরা ধন। পিছন দিক থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হ'য়েছিল, সামনের দিক থেকে দেখা গেল, সেইটাই যৌবন। নাটকের পরিণামে এই সত্যটিই রসোজ্জ্বল অক্ষরে দর্শকের চিত্তে মুদ্রিত হ'ল। এই গুহামুখ একেবারে অর্থহীন নয় আবার খুব স্বাভাবিকও নয়, কেমন একটা রহস্যকে সংকেতিত করে। 'ধর্মস্যতত্ত্বং নিহিতং-গুহায়াম্'—এই গুহাহিত তত্ত্বকে রূপ দেওয়ার জন্যই কি গুহামুখের অবতারণা নয়? এই গুহামুখের দৃশ্যটি নাটকের ভাবের সম্পূর্ণ উপযোগী—পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য "ফাল্গুনী" নাটকের অনবদ্য সংলাপ ভাবের পরিমণ্ডল রচনায় অদ্ভুত সহায়তা করেছে। প্রতীক্ষারত যুবকদলের সংলাপ অতর্কিতে মনের মধ্যে প্রবেশ করে ভয়ে বিস্ময়ে সন্দেহে আশায় মনকে অভিভূত ক'রে ফেলে। অতি দীর্ঘ দুঃখ রজনীর অন্ধকার প্রান্তে দাঁড়িয়ে বহু ঈপ্সিত প্রভাতের অপেক্ষায় মন যখন পীড়িত হ'তে থাকে, মনে হয় এ-দুঃখ-রজনীর বুঝি শেষ নেই—শেষ হবে না অথচ আশা না করেও পারা যায় না তখনকার শংকা, সংশয়, বেদনা, আশা সবই অপূর্বভাবে এখানে প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের 'শিশুতীর্থে'র অপূর্ব পরিস্থিতির সঙ্গে এই নাটকের পরিস্থিতির তুলনা করা যায়।

"মুক্ত-ধারায়" প্রথম দৃশ্য এইভাবে পরিকল্পিত "উত্তরকূট পার্বত্য

প্রদেশ। সেখানকায় উত্তর-ভৈরব মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অভ্রভেদী লৌহযন্ত্রের মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপর দিকে ভৈরব মন্দির চূড়ায় ত্রিশূল—ইত্যাদি।" সাম্রাজ্যবাদ এবং অত্যুগ্র জাতীয়তাবোধ এবং তাদের প্রধান অস্ত্র যন্ত্রদানব কেমন করে জীবনের সহজ বিকাশের পথ রুদ্ধ ক'রতে উদ্যত হয়েছে এইখানে তা প্রকাশিত। যন্ত্রদানবের গর্বোদ্ধত স্পর্ধিত মূর্তি শিবতরাই-বাসীদের তৃষ্ণার বারিই শুধু হরণ করেনি নীলাভ্রদ্যুতি আকাশের অন্তহীন স্বচ্ছতাকেও আবিল ক'রে তুলেছে। আকাশ মানুষের পরম আশ্রয়, প্রভাতের রৌদ্র-ঝলমল আকাশ, নক্ষত্রদ্যুতি-রোমাঞ্চিত আকাশ —শারদচন্দ্রমাবিধৌত আকাশ, মানুষের মনকে, জীবনকে নানাভাবে ঘিরে রেখেছে। আজ বুঝতে পারিনে মাথার ওপর থেকে কোনদিন হারিয়ে গেছে তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারতাম। এই যন্ত্রদানব সেই চিরদিনকার আকাশকে আবিল ক'রে তুলতে চায়।— 'যাকে দিনরাত্তির দেখতে দেখতে প্রাণ-পুরুষ শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে যায়—এমনই ভয়াবহ সেই যন্ত্রদানব। এই তো গেল একদিক। আর অন্যদিকে চেয়ে দেখি—'ভৈরব-মন্দির চূড়ার ত্রিশূল'এ নটরাজের প্রলয়োদ্ধত বাণীর প্রতীক, যা যন্ত্রের এবং যন্ত্ররাজের দম্ভমদোদ্ধত স্পর্ধাকে ধূলায় লুণ্ঠিত ক'রে দেবে, মানুষের কাছে বহন ক'রে আনবে আশা ও আশ্বাসের বাণী। ভৈরবের প্রচণ্ডতা অভিজিতের মাধ্যমে যন্ত্র-দানবকে মরণ আঘাত হানলো—যন্ত্রদানব সে আঘাত দিল ফিরিয়ে। অভিজিৎ গেল ভেসে কিন্তু মুক্তধারার বাঁধন পড়লো খসে, মানুষ রক্ষা পেল। মুক্তধারার দৃশ্য যোজনার মধ্যে যে ভাব-সংকেত রয়েছে বা যে ভাব-পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে নাটকের পক্ষে তা কতখানি অপরিহার্য সে-কথা বোধ করি বলে দিতে হবে না।

'রাজা'-নাটকের প্রথম দৃশ্য অন্ধকারময় বিশেষ অর্থময়। সত্যকথা বলতে কি এইটে না থাকলে নাটকটি অনেকখানি অর্থহীন হ'য়ে পড়তো। সব-ডুবানো এই নিরন্ধ্র অন্ধকার সাধনার প্রতীক। বহির্বিষয় থেকে বিবিক্ত হ'য়ে মানুষ অন্তরের গহনে ডুব দেয়, সেখানে তাকে পার হ'তে হয় সাধনার দুস্তরবারিধি যা শোকে সংশয়ে শংকায় সমাচ্ছন্ন হ'লেও 'তমসঃপরস্তাৎ' আদিত্যবর্ণ মহাপুরুষের (যাঁকে জানলে পরে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়) নিঃসংশয়িত সন্ধান দিতে পারে এ সেই সাধনার অন্ধকারের প্রতীক। সুদর্শনা রাণী শুনেছেন কিন্তু রাজার রূপ সম্বন্ধে অর্থাৎ সাধনার সিদ্ধি সম্পর্কে নিঃসংশয় হ'তে পারছেন না। সিদ্ধি তো সহজ নয়, তার জন্য যে দুশ্চর এবং দুঃসাধ্য সাধনার প্রয়োজন আছে। অন্ধকার ঘরটি এই দুঃখসাধ্য সাধনার প্রতীক আর অরূপের আবির্ভাবের অপরূপ পরিবেশ। নিরন্ধ্র অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, শুধু শোনা যায় রাজার সুগভীর বাণী যার মধ্যে অন্তহীনের ব্যঞ্জনা অনুরণিত আর ভেসে আসে রাণী সুদর্শনার ব্যাকুল হৃদয়ের করুণ প্রার্থনা, রাজাকে স্পষ্ট দিবালোকে—ইন্দ্রিয় পথে দেখবার আকুল আগ্রহ। দর্শকচিত্ত ও অন্তহীনের পায়ের ধ্বনি শুনতে পায়—তাঁর আবির্ভাব অনুভব করে। সমস্তটা মিলিয়ে কেমন যেন রহস্য ভাবে চিত্তলোক আচ্ছন্ন হয়।

'রক্তকরবী'র প্রচ্ছদপট, জালাবরণটি এই নাটকের একটি মাত্র দৃশ্য। এর বাইরে নাটকের সমস্ত ব্যাপার ঘটছে। প্রথম দৃষ্টিতে জালাবরণটি ঊর্ণনাভের জালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ঊর্ণনাভের মতোই মানুষ নিজের ভিতর থেকে যন্ত্রসভ্যতার এই জটিল জালাবরণ সৃষ্টি ক'রে তার মাঝে বসে আছে। প্রাণবান সচলতার মাঝখানে এ এক অচল বিকার। সে অপরকে ধরবার চেষ্টায় আছে কিন্তু জানেনা

যে সে নিজেই নিজের রচা জালে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েছে। অবশ্য এ-জালে একদিন অদ্ভুতজীব ধরা পড়ে একে ছিন্ন ক'রে কারণ বিশ্ববিধানের বিরোধী এই জাল। একটু গভীরভাবে ভেবে দেখলে দেখা যাবে জটিল এ-জাল উর্ণনাভের জালের চেয়েও ভয়ংকর। এ শুধু বিস্ময়েরই সৃষ্টি করে না, দর্শককে বিমূঢ়তায় স্তব্ধ করে, তার মনে এক ধরণের অস্বস্তি ও বিভ্রান্তিময় ভয়াবহতার সৃষ্টি করে। সৃষ্টি প্রবাহের পথে এ এক 'স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা'। অবশ্য অদ্ভুত জানলা একটা আছে, একটা বদ্ধগুহার মতো তা যেন একে কিম্ভুত করে তুলেছে। তার মাঝখান দিয়ে একদিকে চোখে পড়ে যক্ষরাজের বজ্রদৃঢ় মুষ্টি, নিষ্পেষণের প্রতীক আর অন্যদিকে নন্দিনীর হাতের রক্তকরবীর গুচ্ছ। কোমলে কঠোরে এ এক ভয়ংকর ছবি। দেখতে দেখতে ভয়ে অভিভূত হ'য়ে পড়তে হয়, তবু এর আকর্ষণ কমে না। জালাবরণ যে আকর্ষণজীবী সভ্যতার প্রতীক তার ধর্মই এই। যন্ত্রসভ্যতার বিরাট কারখানা ঘরে প্রবেশ করলে মনের মধ্যে এমনই ভয়াবহ বিমূঢ়তার ভাব আসে। প্রথমে মানবের দানবীয় শক্তি ও দম্ভের বিরাটোদ্ধত প্রকাশ মনকে অভিভূত করে তারপরে যখন তলিয়ে দেখা যায় যে কেমন করে এই যন্ত্রদানব শোষণের জন্য করাল দংষ্ট্রা বের করেছে এবং মানুষকে 'রুদ্ধগতি, কদাকার প্রাণ' ও 'আত্মায় বামন' ক'রে তুলছে তখন এই যন্ত্রসভ্যতার মধ্যে একটা কানা রাক্ষসের অভি-সম্পাতের কথা ভেবে বুকের রক্ত জল হ'য়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছেন এই সৃষ্টি-প্রবাহ চিরচঞ্চল। প্রলয়ে সৃজনে এই প্রবাহ। এ প্রবাহ থামতে জানেনা থামতে পারেনা এবং একে থামানো যায়না। থামলে কি হ'বে দেখা যাক: সঞ্চয়ের অচল বিকারে 'স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা'র সৃষ্টি ক'রে বেদনার

শূলে আকাশের মর্মমূলকে বিদ্ধ করবে। সেদিন চিরদিনকার অবারিত, নীলাম্বুদদলের মতো নীল, বন্ধুর মতো প্রসন্ন আকাশখানা জীবন থেকে যাবে হারিয়ে। থেমে থাকা এমনই বিরোধী, এমনই অস্বাভাবিক। মানুষও এই সৃষ্টিপ্রবাহের অঙ্গীভূত—সেও চিরযাত্রী। সূর্যচন্দ্র গ্রহতারা যে পথে ভীষণ নীরবে চলে মানুষও সেই চলারপথে তাদের সহযাত্রী। সে যদি থামে তবে অচল বিকারের সৃষ্টি করবে আর তা হ'বে স্বাভাবিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী। আকর্ষণজীবী, ধর্ষণজীবী এই যন্ত্র-সভ্যতার দানবীয় নিষ্ঠুরতা, তীক্ষ্ণ দংষ্ট্রাকরাল ভয়ালরূপ সহজ প্রাণের যাত্রাপথে এমনই বিরোধের সৃষ্টি ক'রেছে। মানুষ এর চণ্ডশক্তিকে সত্য বলে ভাবছে; কিন্তু এটা সত্য নয়. যেমন যত প্রচণ্ডই হোক্ ঘূর্ণিটা সত্য নয়—সত্য চিরচঞ্চল শাশ্বত প্রবাহ।

জালাবরণ এই দম্ভোদ্ধত অস্বাভাবিক যন্ত্রসভ্যতার ভয়ংকর প্রতীক—সহজ প্রাণের স্ফূর্তির এবং যাত্রার পথে স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধার যথার্থ প্রকাশ এবং 'রক্তকরবী' নাটকের সার্থক পটভূমিকা।

আধুনিক নাটকে বিশেষ ক'রে সাংকেতিক নাটকে চরিত্র সৃষ্টির আংগিক পূর্বেকার চাইতে সম্পূর্ণ পৃথক এমন কি বিপরীত মুখে বললেও অত্যুক্তি করা হয় না। সেকস্‌পীয়র এবং তাঁর অনুবর্তী নাট্যকারগণ চরিত্র সৃষ্টিতে ব্যক্তি-সত্তার উপর জোর দিয়াছেন, সেখানে ব্যক্তিরূপেরই প্রাধান্য। কোন ভাব, আদর্শ, নীতি বা প্রবৃত্তির প্রাণান্তকারী একাধিপত্য চরিত্রের প্রধান গুণ বা দোষ হ'লেও তারা ব্যক্তিরূপের প্রকাশকেই উজ্জ্বল ক'রে তুলেছে, তাকে ক্ষুণ্ণ বা বিলুপ্ত করতে পারেনি। ম্যাকবেথে অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষার প্রকট প্রকাশ ঘটেছে তবু ম্যাকবেথকে কেউ অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বলতে সাহস পাবে না। এ্যাণ্টনির সর্বনাশা মোহের বা কামনার দুর্ধর্ষতা তার ব্যক্তিসত্তাকে নিশ্চয়ই গলাটিপে মারতে

পারেনি। রবীন্দ্রনাথের বিক্রমদেব, রঘুপতি প্রবৃত্তির বা সংস্কারের প্রাণান্তকারী একাধিপত্যের দাস হ'লেও মানুষ, তারা ভাবের প্রতীক নয়। এখানে ব্যক্তি-প্রাধান্য স্বীকৃত, ভাব বা প্রবৃত্তির প্রাবল্য ব্যক্তিত্ব প্রকাশের বাহন মাত্র। আর এরা একান্তভাবে সজীব, প্রাণবান, এমনিই যে অস্তিত্ব-গৌরবে বাস্তব মানুষকে অতিক্রম ক'রে যায়। সংলাপের মধ্যে দিয়ে যেন তাদের হৃৎস্পন্দন ধ্বনি শোনা যায়, 'If you prick them, they will bleed'—তারা এমনই সজীব। তারা তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করে, তীব্রভাবে প্রতিবাদ করে, প্রবলভাবে বাঁচে এবং প্রচণ্ডভাবে মরতে পারে—এই বলোদ্ধত, স্পর্ধিত এবং প্রচণ্ড জীবনবোধই, ('life immense in pulse, passion and power') সেক্সপীরীয় নাটকের চরিত্রসৃষ্টির মূলনীতি।

কিন্তু সাংকেতিক নাটকে এই নীতি যথাযথ অনুসৃত হয়নি। এখানে ব্যক্তি ভাবপ্রকাশের বাহন, ব্যক্তিসত্তা অনেকাংশে বিলুপ্ত। ভাবকে, তত্ত্বকে নাটকীয় চরিত্ররূপে প্রকাশ করবার জন্য ব্যক্তিকে গ্রহণ করা হ'য়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক, জড়বাদ বা সাম্রাজ্যবাদ একটি ভাব বা তত্ত্ব, এর কোন বিশেষ সত্তা নেই, এ নির্বিশেষ। পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বকালের এবং সর্বমানবের মধ্যে প্রকাশিত জড়বাদ নিয়ে এর একটি রূপ কল্পনা করা হ'য়েছে এবং এরূপ নির্বিশেষে, কোন বিশেষ মানুষে প্রকাশিত নয়। এর সমগ্রতাকে কোন একটি ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশ করা হ'ল ফলে জড়বাদের রূপ ফুটলো কিন্তু ব্যক্তিরূপের বিলুপ্তি ঘটলো; কারণ জড়বাদ ও জড়বাদী মানুষ এক নয়। জড়বাদীর মধ্যে তার সহস্র দোষগুণ নিয়ে মানুষ আছে, 'সুখ দুঃখ বেদনার আদি অন্ত নাহি যার' কিন্তু জড়বাদের সমগ্ররূপের মধ্যে মানুষ নেই। জড়বাদের ভাব বিগ্রহ তাই আমাদের চিন্তার জগতে আলোড়ন আনে, হৃতবুদ্ধি

ক'রে তোলে কিন্তু মুগ্ধ করতে পারেনা। উপমা যুক্তি নয় তবু উপমার সাহায্যে কথাটিকে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া যায়; জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য শুভ্র নিরঞ্জন তাকে আমরা সহ্য করতে পারিনে। তাকে আমাদের প্রয়োজন সত্য—কিন্তু তা আমাদের মুগ্ধ করেনা কিন্তু সেই জ্যোতিঃস্বরূপ যখন বর্ণগরিমায় প্রকাশ পায় তখন নয়ন মন মুগ্ধ হ'য়ে যায় এবং তা আমাদের অনুভূতির ক্ষেত্রে আলোড়ন আনে, আমরা তাকে ভালবাসি। পূর্বেকার নাটকের চরিত্রসৃষ্টিতে এই ভাঙাচোরা আলোর বর্ণচ্ছটা আছে—সহস্র বিরুদ্ধ-শক্তি দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত—ভাব, তত্ত্ব বা আদর্শের ভাঙাচোরা রূপ আছে তাই তাদের ভাল না বেসে পারা যায় না আর সাংকেতিক নাটকে নিছক ভাবরূপের সমগ্রতা দেখে আমরা হতবুদ্ধি হ'য়ে যাই। ভাব বা তত্ত্বমুলক সাংকেতিক নাটকের বিপদ এইখানে। এখানে চরিত্রসমূহ যথেষ্ট প্রাণবান নয়। অবশ্য সব চরিত্র সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য নাও হ'তে পারে তবে সাধারণভাবে একথা সত্য। এখানে তত্ত্বরূপকে বা ভাবসত্তাকে ব্যক্তিরূপে প্রকাশ করা হয়. এখানে ভাবই প্রধান, ব্যক্তি নয়। অতএব এই ধরণের নাটকের চরিত্রসৃষ্টি যে পূর্বেকার ধারার বিপরীত মুখে তা বোধ করি বুঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের চরিত্রগুলি যে বিশেষ ভাব বা নীতির প্রতীক তা যেন ধরা যায় ফলে তাদের ব্যক্তিসত্তা বিলুপ্ত না হ'লেও কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষুণ্ণ হয়। অবশ্য তাঁর মত মহাকবির সৃষ্টিতে এর যথেষ্ট ব্যতিক্রম আছে; কারণ "রক্তকবরী"র কিশোর, বিশু, গোকুল, "ডাকঘরে"র অমল, সুধা, "রাজা" নাটকের সুদর্শনা প্রভৃতি যে ভাববিগ্রহ তা যেন ভুলে যেতে হয়—এরা এমনই সজীব। এরা আমাদের শুধু মুগ্ধই করে না. অনুভূতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং ফলে নাটকের উদ্দেশ্য সার্থকতার দিকে এগিয়ে যায়।

আধুনিক যুগ ও ব্রাহ্মধর্ম

সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্মসাধনা, নানা জ্ঞান আলোচনা ও প্রতিদিনকার জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে যে বহুমুখী বিচিত্র ভাবধারা দেখতে পাওয়া যায় তার গতি ও প্রকৃতির উপরেই যুগবৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। নানা ক্ষেত্রে এ যুগের ভাবধারা গভীরভাবে আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে শাস্ত্র ও গুরুবাক্য প্রভৃতি অথরিটির উপর নির্ভরতা ক্রমেই কমে আসছে, সেই জায়গায় স্বাধীন চিন্তা, পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের উপর নির্ভরশীলতা বেড়ে চলেছে. সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই মনোভাবের প্রয়োগের ফলে অ্যারিষ্টটলীয় অথরিটি দিয়ে বাঁধা স্থাণু ও অচল বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় জ্ঞান অকস্মাৎ জীবন্ত ও সচল হ'য়ে উঠল। প্রাচীনের উপর অন্ধবিশ্বাস ও আত্মবিশ্বাসের অভাব বিজ্ঞানের উন্নতির পথ বন্ধ করে দিয়েছিল; মানুষের মন প্রাচীনের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে কিছু ভাবতে পারতনা, প্রাচীন মত রক্ষা করতে গিয়ে অনেক সময় অবিসম্বাদিত তথ্য ও ঘটনার বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হোত। Galileo Galilei সর্বপ্রথম অবৈজ্ঞানিক মতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন। তাঁর জীবনকাল ছিল ১৫৬৪ থেকে ১৬৩২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে রবার্ট বয়েল তাঁর Sceptical Chymist নামক পুস্তকে মৌলিক পদার্থের সংজ্ঞা বর্ণনাচ্ছলে আরিষ্টটলের মত খণ্ডন করেন। ১৭৭৪-৭৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসী বৈজ্ঞানিক লেভয়সিয়র একশবছরের পুরোণো এবং সর্বজনসম্মত জ্বলনক্রিয়া সম্পর্কীয় ফ্লজিষ্টন মতবাদ খণ্ডন করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত আধুনিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। অক্সিজেন গ্যাসের সঙ্গে দাহ্য

পদার্থের যোগের ফলে জ্বলনক্রিয়া হয় এই ছিল লেভয়সিয়রের মতবাদের ভিত্তি। শেষোক্ত মত অনুসারে জ্বলনের পর দাহ্য পদার্থের ওজন বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। বস্তুতঃ পরীক্ষার ফলে দেখা গেল যে সত্য সত্যই ওজন বৃদ্ধি পায়। পূর্বোক্ত ফ্লজিষ্টন-মতবাদীরা কিন্তু বিপরীত মত পোষণ করে বলতেন যে জ্বলনক্রিয়ার ফলে পদার্থের ওজন কমে যায়, বাড়ে না। লেভয়সিয়র যখন দেখিয়ে দিলেন যে তাঁদের মতের সঙ্গে পরীক্ষার ফল মেলে না, তখন তাঁরা এক অদ্ভুত এবং হাস্যকর যুক্তির আশ্রয় নিয়ে বললেন যে ফ্লজিষ্টন নামক পদার্থের ওজন ঋণাত্মক (negative)। দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীন মতবাদের বন্ধন এত কঠিন যে তাকে রক্ষা করতে সেই মতাবলম্বীরা অত্যন্ত অবৈজ্ঞানিক এবং অসম্ভব যুক্তির আশ্রয় নিতেও পশ্চাৎপদ হন না। মানুষ যতদিন প্রাচীনমতবাদকে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী হ'য়ে আঁকড়ে ধ'রে রেখেছিল, যতদিন সে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণকে বিজ্ঞানের মূলভিত্তি বলে গ্রহণ করে নি, ততদিন বিজ্ঞানের বিকাশের পথ রুদ্ধ হ'য়ে ছিল; কিন্তু যখনই সে বিচার ও যুক্তির পথ গ্রহণ করে অগ্রসর হতে চাইল অমনি সকল বাধা দূর হ'য়ে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আরম্ভ হোল।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে সকল জ্ঞানালোচনার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক মনোভাব দ্রুত প্রসার লাভ করতে আরম্ভ করে। ইতিহাস, অর্থশাস্ত্র, ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রাচীন কিংবদন্তী ও কল্পনাপ্রসূত অসার ভিত্তির পরিবর্তে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে বিজ্ঞান সম্মত দৃঢ়ভিত্তি সমূহ গ'ড়ে উঠতে লাগল। এই সময়ে ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) অভিব্যক্তিবাদ প্রচারিত হওয়াতে জগৎ ও জীবসৃষ্টি সম্বন্ধে অদ্ভুত প্রাচীন মতসমূহের ভিত্তি ভেঙ্গে পড়ল, এবং ক্রমশঃই ধর্মশাস্ত্রসম্ভূত অযৌক্তিক মত সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস শিথিল

হ'তে থাকল। ফলকথা এ যুগে সকল বিষয়ে যুক্তি ও বিচার ব্যতিরেকে কেবল প্রাচীনতার দোহাই দিয়ে কোন তত্ত্ব কিংবা ইতিহাস গ্রহণ করতে মানুষ আর রাজী হয় না। এযুগের লোকেরা বিচার, যুক্তি, অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ের সাক্ষ্যকে প্রধান স্থান দিচ্ছে, সেই কারণে প্রাচীনের সাক্ষ্য নির্বিচারে মেনে নেওয়ার রীতি ক্রমেই অন্তর্হিত হ'য়ে যাচ্ছে।

মূলানুসন্ধানের স্পৃহা এ-যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। বহুর মধ্যে একেকে দেখা, বিচিত্র জীবন-লীলার ও জড়রাজ্যের রহস্যের অন্তরালে এক একটি ঐক্যের ভিত্তিকে খুঁজে বের করা আধুনিক যুগমনের একটি প্রধান লক্ষণ। পুরাকালে বহুর মধ্যে একেকে জানার ইচ্ছা মানুষের ছিল না একথা বলা চলে না, কিন্তু নানাক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ছিল না, এবং এই ঐক্যসন্ধানের চেষ্টা হ'য়েছে প্রধানতঃ চিন্তা ও অনুমানকে আশ্রয় করে, দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্যনির্ণয়ের চেষ্টা এযুগেই সফল হ'য়েছে। সেই সাফল্য জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আজ যেমন সুস্পষ্ট হ'য়েছে আর কখনও তেমন হয় নি। আজ জড়-বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেছেন যে সমস্ত জড়বস্তু বিভিন্ন সংখ্যক ইলেক্ট্রন, প্রোটন, ও নিউট্রন নামক তিন রকম অতিপরমাণবিক কণিকার দ্বারা নির্মিত। ইলেক্ট্রন ঋণাত্মক তড়িৎকণিকা, প্রোটন ধনাত্মক তড়িৎকণিকা, এবং নিউট্রন এই উভয়ের সমন্বয়ে গঠিত একটি নিস্তড়িৎ কণিকা। শুধু এই পৃথিবীতে নয়, সমগ্র বিশ্বে-সূর্য্যে গ্রহে, নক্ষত্র সমূহে জড়বস্তুর একই তড়িৎভূমিকার প্রমাণ মিলেছে। তাই জড়বৈজ্ঞানিক নিঃসংশয় ভাবে বলতে পারছেন যে এই সমগ্র জড়বিশ্ব একটি মহাঐক্যে বিধৃত হ'য়ে রয়েছে, সেই মূলকে আমরা জেনেছি। শুধু তা নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চাপে পড়ে বৈজ্ঞানিকেরা অপরিসীম ধৈর্য্য ও মনীষার প্রয়োগে সুদূরপরাহত এক

সম্ভাবনাকে মূর্ত্ত করতে সক্ষম হ'য়েছেন। একথা জানা ছিল—আইনষ্টাইন আঙ্কিক প্রমাণ দিয়েছিলেন—যে জড়বস্তু কেবলমাত্র শক্তির মূর্তরূপ নয়, জড়বস্তুকে শক্তিতে রূপান্তরিত করাও সম্ভব, এবং সূর্য্যের ও নক্ষত্রের অভ্যন্তরে সেই ক্রিয়ার ফলেই এদের তেজ উদ্ভূত হচ্ছে। জড়বস্তু শক্তিতে রূপান্তরিত হ'লে অতি অল্প পরিমাণ বস্তু থেকে ভূরি পরিমাণ শক্তি পাওয়া সম্ভব হবে তাও আইনষ্টাইন দেখিয়েছিলেন। হিরোসিমার হতভাগ্য মানুষেরা একদিন প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করল যে এই রূপান্তর শুধু সম্ভব নয় মর্মান্তিকভাবে সত্য। এটম বোমা বিস্ফোরণে যে শক্তি নির্গত হোল সে শক্তি জড়বস্তুর রূপান্তরের দ্বারাই উদ্ভূত। ইউরেনিয়াম নামক ধাতুর একটি বিশেষ প্রকার—(২৩৫ আইসোটোপ) নিউট্রন রশ্মি দ্বারা আহত হ'লে ইউরেনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্র দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে যায়, এই দ্বিধা বিভক্ত (fission) হওয়ার কালে ইউরেনিয়ামের কিছুটা অংশ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়—এই শক্তিই এটম বোমার প্রচণ্ড শক্তির উৎস। এই পরীক্ষার ফলে অবিসম্বাদিত-রূপে প্রমাণ হয়েছে যে একটি মাত্র সত্তা থেকে বিচিত্র জড়সত্তা উদ্ভূত হ'য়েছে এবং এই বহুবিচিত্রকে একের মধ্যে বিলীন করে দেওয়াও অসম্ভব নয়। দেখা যাচ্ছে মূল ঐক্য সন্ধানের চেষ্টার ফলেই জড়-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অঘটন ঘটান সম্ভব হ'য়েছে, এবং গভীরভাবে পর্য্যালোচনা করলে বোঝা যাবে যে এ-যুগে জ্ঞানালোচনার সকল ক্ষেত্রেই এই চেষ্টা চলছে। দর্শন ও অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে, সমাজ-বিজ্ঞান ও নৃতত্ত্ব আলোচনার ক্ষেত্রে, অভিব্যক্তিবাদের ইতিহাস ও মানব ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই মূল অনুসন্ধানের চেষ্টার ফলে যুগান্তকারী পরিণাম ঘটে উঠছে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই ঐক্যের ভিত্তির অনুসন্ধানের ফলে আজ আর ভিন্ন ভিন্ন দেশে মানুষকে এবং তার

ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা চলে না। মানুষের সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্র সংগঠন, সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রা ও সভ্যতার বিকাশ সকল দেশে ও সকল কালে একটি মূল পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে ইতিহাস-বেত্তা সেই সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হ'য়েছেন। তাই আজ এক জগৎ 'one world'—গড়বার চেষ্টা চলেছে। সর্ব মানবের একটি মূলগত ঐক্যবোধ যখন মানুষের সামনে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে তখনই সমস্ত বিরুদ্ধ মতবাদকে সমন্বয় ক'রে শান্তি ও কৃষ্টির ভিত্তিতে এই 'একজগৎ' গড়ে উঠবে।

সাম্যের আদর্শে সমাজ গড়ার চেষ্টা এ যুগের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব, সমাজতন্ত্রবাদের প্রচার ও প্রসার, রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অবসান ও সোভিয়েট রাষ্ট্রগঠন, জনকল্যাণের নানা প্রচেষ্টা, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রসার, দাসপ্রথার উচ্ছেদ, বিশ্বব্যাপী শোষণের বিরুদ্ধে এশিয়াবাসীর বিদ্রোহ, সর্বত্র অ-শ্বেতজাতির স্বাধিকার বোধ, এ সকলের মধ্য দিয়ে এযুগে সাম্যের আদর্শটি ক্রমশঃই প্রসারিত হ'য়ে চলেছে। একদিকে সমাজতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের প্রভাবে ও অন্যদিকে ফিউডেল অর্থনীতি ও ধনতন্ত্রের চাপে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই সর্বাঙ্গীন বিকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। অগণিত মূক জন-সাধারণকে দাসপর্য্যায়ে ফেলে রাখাই সমাজের শক্তিশালী লোকেরা শ্রেয় বলে মনে করতেন, এই প্রচণ্ড অসাম্যই ছিল পুরোনো যুগের সমাজের প্রধান লক্ষণ। বর্তমান-কালে এই অসাম্য ও সাম্যের আদর্শে সংঘর্ষ উপস্থিত হ'য়েছে এবং আমরা একটি সংঘাত ও পরিবর্তনের যুগে বাস করছি। ফলকথা অসাম্যের মধ্যেই সাম্যের বীজ নিহিত ছিল, এই অসাম্য যখন প্রবল হ'য়ে অসহ্য হ'য়ে উঠল তখনই সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে লাগল। এই ভগ্নপ্রায় সমাজ-

ব্যবস্থার পরিবর্তে সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ গড়বার চেষ্টা সকল দেশেই চলছে, কোথাও তা সফল হ'য়েছে, কোথাও ভবিষ্যতে সফল হবে, আজ দেশে দেশে অসাম্যের জীর্ণ আবরণ ভেদ ক'রে সাম্যের নবীন ও বলীয়ান আদর্শ মূর্ত হ'য়ে উঠেছে, তার জয়যাত্রা অব্যাহত গতিতে চলেছে। বিশ্বব্যাপী যে ন্যায়বিধি সকল সত্তাকে মহাপরিণতির দিকে অগ্রসর করে নিচ্ছে, সেই ন্যায়বিধিই আজ জনজাগরণের মূলে থেকে সমস্ত মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে তুলছে। আজ তাই সাধারণ লোক জমিদার কিংবা ধনী বণিকের চোখ রাঙানিকে আর ভয় করছে না। আজ সে বুঝেছে প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সন্তান, প্রত্যেকেই অমরজীবনের অধিকারী, প্রত্যেকেই অনন্তজ্যোতির রাজ্যে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে মহাপ্রকাশের দিকে। তাই আজ শোষিত হ'তে কেউ রাজী নয়, সকলেই নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, এই স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতনতাই পদানত জাতিসমূহকে স্বাধীনতার মন্ত্রে অনুপ্রাণিত করে আত্মাহুতি দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে, এই স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতনতাই পদানত মানবগোষ্ঠীকে দেশে দেশে নবজাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। তাই এযুগে দেশে ও বিদেশে রাজতন্ত্র ভেঙ্গে পড়েছে, ক্যাপিট্যালিজম ভীত হ'য়ে পড়েছে, এবং ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ ইম্পিরিয়ালিজমের নাগপাশ থেকে মুক্ত হ'য়ে স্বাধীনতার প্রাণপ্রদ প্রভাব অনুভব করতে পারছে।

তিনটি প্রধান লক্ষণযুক্ত এই আধুনিক যুগ বিশেষ করে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশে আবির্ভূত হয়েছে, এই ধর্ম আন্দোলনের ফলেই আধুনিক যুগের জীবন্ত ও গতিশীল ভাবধারার বিপুল প্রবাহ এদেশের জনসমাজের উপর বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে। অল্পসংখ্যক লোকই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হ'য়েছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু সংখ্যা গণনায়

দ্বারা এই প্রভাবকে পরিমাপ করা যাবে না, অগণিত জনগণের উপর ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের প্রভাব সমসাময়িক ভারতবর্ষের জাগ্রত মনোভাব থেকেই, তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই সুস্পষ্ট হবে।

এদেশে ব্রাহ্মধর্মই প্রথম প্রচার করলেন যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ও ধর্মের ভিত্তি 'জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'। ব্রাহ্মধর্ম সাধক ধর্মকে সন্ন্যাসীর নির্জন সাধনার বিষয় বলে গ্রহণ করেন নাই। সংসারে থেকে বহুবিচিত্র কর্মপ্রবাহের মধ্যে নানা মানুষের সঙ্গে যোগের ভিতর দিয়ে বিশ্বব্যাপী মঙ্গল ইচ্ছাকে প্রত্যক্ষভাবে জানা, মানা ও পালন করাকেই ধর্মসাধন বলে স্বীকার করেছেন। তাই এদেশে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়েই গুরুপুরোহিত ও শাস্ত্রবাক্যশাসিত ধর্মবিশ্বাসের জায়গায় ক্রমে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও জীবন্ত উপলব্ধির ভিত্তিতে এক বিশ্বজনীন ধর্ম গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। ধর্মসাধন যে কতকগুলো ক্রিয়াকলাপের যান্ত্রিক ও অন্ধ অনুসরণ নয় পরন্তু বিচার ও জ্ঞানাহরণের সাহায্যে প্রত্যেক মানুষের অন্তর্জীবনের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয় ব্রাহ্ম সাধকেরা এই তত্ত্বকে উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন বলে মহাপুরুষদের জীবন ও বাণী এদেশে বহুজীবনে সার্থক হ'য়ে উঠতে পেরেছে। বস্তুতঃ শাস্ত্রবাক্য, মন্ত্র যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ, বাহ্যাড়ম্বর সমন্বিত পূজা এ সকলের কোনোটাই ধর্মের ভিত্তি নয়, ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে 'জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়', এই কথা ঘোষণার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ মানুষের মনকে বহুযুগের অথরিটির নাগপাশ থেকে মুক্ত ক'রে অসীমজীবনের মহৎসম্ভাবনার মধ্যে উত্তীর্ণ করে দিলেন। মহাপুরুষদের জীবন, শাস্ত্র, মন্ত্র কিংবা কোন বিশেষ প্রতীককে পূজা করলে ঈশ্বর-সাধনা হয় না, এরা শুধু পথ দেখাতে পারে, কিন্তু প্রত্যেককেই নিজে নিজে পথ চলতে হবে। স্বীয় অন্তর্জীবনের বিকাশের মধ্য দিয়ে

ঈশ্বর উপলব্ধিই ধর্মের লক্ষ্য—ব্রাহ্মধর্ম এই আদর্শকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন। তাই ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মানবমনের মুক্তির আদর্শ তথা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এদেশে প্রসার লাভ করেছে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না।

ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়কে এই কারণে আধুনিক যুগের প্রবর্তক বলা হয়। এই দেশে আধুনিক যুগের গতি ও প্রসার অনুধাবন করতে হ'লে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের ইতিহাস অনুসরণ করেই তা করতে হবে, এই কারণে সংক্ষেপে এই ইতিহাস বর্ণনা করা প্রয়োজন। এই ধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় ১৭৭৪ খৃঃ অব্দে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে ব্রাহ্মণপিতার গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অল্প বয়সেই প্রচলিত বহুদেববাদের অযৌক্তিকতা বুঝতে পারেন, এবং পৌত্তলিক ধর্মানুষ্ঠান ত্যাগ করে অদ্বিতীয় চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের পূজা অবলম্বন করেন। একেশ্বরবাদ সমর্থন করে তিনি ১৮০৩ খৃঃ অব্দে তুহফাতুল মওয়াহেদ্দিন নামে পারস্য ভাষায় এক পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনের ইতিহাস বর্ণনা না করে এইমাত্র বলা যায় যে ১৮১৪-১৫ খৃঃ অব্দের থেকে বিষয় কর্ম হ'তে অবসর গ্রহণ করে তিনি একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং অন্যভাবে জাতির ও দেশের সেবার জন্য সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি বাংলা ভাষায় বেদান্তের প্রচার করতে প্রবৃত্ত হন, এবং বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের স্বরূপের আলোচনা ও একেশ্বরবাদের প্রচার ও প্রসারের জন্য কয়েকজন বন্ধু মিলে আত্মীয় সভা নামে এক সভা স্থাপন করেন। রামমোহন কেবলমাত্র হিন্দুশাস্ত্র থেকে একেশ্বরবাদ গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হন নাই, মুসলমান, খৃষ্ট ও সকল প্রচলিত ধর্মের ভিত্তিই যে একেশ্বরবাদ একথা

তিনি প্রণিধান করেছিলেন, এবং বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য সকল ধর্মকেই উদার ও সংস্কারমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এইজন্য ১৮২৩ খৃঃ অব্দে 'The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness' নামে এক পুস্তক প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে খৃষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাগুলো বাদ দিয়ে খৃষ্টের জীবন ও বাণীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। এই পুস্তক প্রচারের ফলে মার্শম্যান, কেরীপ্রমুখ তদানীন্তন খৃষ্টীয় ধর্মযাজকেরা রামমোহনের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। তাঁদের মতে সমগ্র বাইবেলই অপৌরুষেয় ঈশ্বরের বাণী—সুতরাং খণ্ডিত বাইবেলের ব্যাখ্যা তাঁরা সহ্য করতে পারলেন না, রামমোহনের মতের প্রতিবাদ করে তীব্রভাষায় তাঁকে আক্রমণ করলেন। রামমোহনও তার উত্তর দিতে ছাড়লেন না। এই উত্তরপ্রত্যুত্তর ক্রমে ত্রিত্ববাদের সঙ্গে একেশ্বরবাদের বিবাদে পরিণত হোল। এই সময় উইলিয়াম এডাম নামে একজন খৃষ্টীয় ধর্মযাজক রামমোহনের সংস্পর্শে এসে ত্রিত্ববাদ ত্যাগ করে ইউনিটেরিয়ান খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় থেকে রামমোহন নিজেকে হিন্দু ইউনিটেরিয়ান বলতে আরম্ভ করেন এবং মিঃ এ্যডামের উপাসনালয়ে প্রতি রবিবার যোগ দিতে থাকেন। উপরি উক্ত উপাসনালয়ে যোগ দেওয়ার কালে সম্পূর্ণ ভারতীয়ভাবে এক অদ্বিতীয় নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনার জন্য একটি উপাসক-মণ্ডলী ও ধর্মসমাজ স্থাপনের ইচ্ছা তাঁহার ও তাঁহার বন্ধুদের মনে উদিত হয়। ইহার ফলে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে আগষ্ট, ১২৩৫ বঙ্গাব্দের ৬ই ভাদ্র বুধবার কোলকাতার চিৎপুর রোডের একটি গৃহে মহাত্মা রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করেন। পরে ১২৩৬ বঙ্গাব্দের ১১ই মাঘ শনিবার ব্রাহ্মসমাজের একটি নিজস্ব গৃহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই গৃহ ৫৫নং আপার চিৎপুর রোডে অবস্থিত এবং এখন আদিব্রাহ্ম

সমাজের মন্দির নামে প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মসমাজ মন্দির প্রতিষ্ঠার পর ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর রামমোহন বিলাত যাত্রা করেন এবং ইংলণ্ডের ব্রিষ্টল সহরে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন।

ব্রহ্মমন্দিরের "ট্রাষ্টডিডে্ ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য বিবৃত হয়েছে, এই ট্রাষ্টডিডে্" বলা হয়েছে:—"এই উপাসনালয়ে সর্বপ্রকার মূর্তিপূজা পরিহার করা হইবে, এইস্থানে কোন নৈবেদ্য নিবেদন করা হইবে না বা কোন পশুবলি হইবে না। এইস্থানে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষ যথোপযুক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা ও গাম্ভীর্য্য সহকারে এক অদ্বিতীয় নিরাকার অনন্ত অগম্য অপরিবর্তনীয় বিশ্বের স্রষ্টা ও পাতা ব্রহ্মের উপাসনা করিতে মিলিত হইবেন।" এই মন্দিরের স্থাপনের পর নিম্নলিখিতভাবে মন্দিরের উপাসনা কার্য্য সমাধা হোত—"আরম্ভে দুই জন দ্রাবিড়ী ব্রাহ্মণ একটি পাশের ঘরে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদপাঠ করতেন। তারপর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ পাঠ ক'রে বাংলায় ব্যাখ্যা করতেন, পাঠান্তে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ অধ্যাত্ম-ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। ব্রহ্মসঙ্গীতান্তে উপাসনা কার্য্য সমাধা হোত।"

রামমোহনের মৃত্যুর পর ১৮৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ একলাই ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচিয়ে রাখেন। এ সময় বিশেষ কোন উপাসক-মণ্ডলী ছিল না, এবং কেউই 'বিধিপূর্বক' ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেয় নাই। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর একুশ বছর বয়সে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসেন। তার আগেই তাঁর বিশ্বাস হয়েছিল যে ঈশ্বর নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ; এবং সেই বিশ্বাসের পরিপুষ্টির জন্য তিনি বিদেশীয় দর্শনশাস্ত্র ও সংস্কৃতশাস্ত্র আলোচনা করেছিলেন, কিন্তু সেই সকল সংস্কৃতশাস্ত্রে একেশ্বর প্রতিপাদ্য কোন

দৃঢ়মত না পাওয়ায় নিরাশ হ'য়ে পড়েছিলেন। এমন সময় একদিন দৈবক্রমে রামমোহনের সম্পাদিত ঈশোপনিষদের একটি ছেঁড়াপাতা তাঁর হাতে পড়ে। এই পাতায় "ঈশাবাস্তমিদং সর্বং" ইত্যাদি শ্লোকটি লেখা ছিল। তাঁর পরিচিত কোন সংস্কৃত পণ্ডিত ঐ শ্লোক ব্যাখ্যা করতে না পারায় এবং যখন তিনি শুনতে পেলেন যে ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য রামচন্দ্র বিগ্যাবাগীশ এই শ্লোক ব্যাখ্যা করতে পারবেন তখন তিনি রামচন্দ্র বিগ্যাবাগীশের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছ থেকে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়ে নেন। এই শ্লোক থেকে তিনি যা খুঁজছিলেন তার সন্ধান পেলেন এবং এই সূত্রে ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে এসে একেশ্বরবাদ সমর্থক হিন্দুশাস্ত্রের কথা জানতে পারলেন। এর পর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২১শে আশ্বিন প্রধানতঃ বেদান্ত-প্রতিপাগ্ব ব্রহ্মবিগ্যার ও ব্রাহ্মধর্মের প্রচারের জন্য তত্ত্ববোধিনী নামে এক সভা স্থাপন করলেন, সেকালে বাংলাদেশের জ্ঞানী, গুণী, শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে প্রায় সকলেই এই তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য এক, সুতরাং ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে তিনি এই উভয়ের যোগসাধন করলেন ও নিজে ব্রাহ্ম-সমাজে যোগ দিলেন এবং ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর, ১২৫০ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ তিনি কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে 'প্রতিজ্ঞাপূর্বক' ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

রামমোহন একেশ্বরবাদীদের জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, জোয়ার ভাটার মত লোকেরা সেই মন্দিরে আসত যেত কিন্তু কেউই 'প্রতিজ্ঞা পূর্বক' এক ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করবার সাধনা গ্রহণ করে নাই তাই একঈশ্বর সাধক কোন ধর্মমণ্ডলী গড়ে ওঠে নি। দেশের লোকের সামনে আদর্শের দীপটি জ্বালা ছিল কিন্তু

কেউ সেই দীপের আলোকে নিজের জীবন পথটি দেখে নিয়ে পথ চলতে আরম্ভ করেনি। এই কারণে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম অর্থাৎ যারা "বিধিপূর্বক' পৌত্তলিকতা ত্যাগ করে ব্রহ্মোপাসনা অবলম্বন করেছে এমন একদল লোকের ধর্মমণ্ডলী অথবা সম্প্রদায় গড়ে তোলবার দিকে মন দিলেন। এই উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ একটি উপাসনা পদ্ধতি প্রচলন করলেন ও জীবনে তা সাধন করতে আরম্ভ করলেন। রামমোহন ব্রহ্মোপাসনার একটি পদ্ধতি তাঁর 'ব্রহ্মোপাসনা' নামে একটি ছোট বইতে লিখে গিয়েছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে এই পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে কোন ধর্মমণ্ডলী গড়ে ওঠেনি, সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত জীবনে কেউ কেউ এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু সমাজে তার কোন চিহ্ন ছিল না। সেই কারণে দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম সাধনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন তখন ব্রাহ্ম সমাজের উপাসক-মণ্ডলী ছিল না বললেও চলে এবং এখনকার মত ব্রাহ্ম সম্প্রদায় ত গড়ে ওঠেই নাই। রামমোহনের পদ্ধতির মধ্যে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের অবলম্বনে ব্রহ্ম সাধনার উপদেশ থাকলেও এই পদ্ধতি অববম্বন ক'রে কোন বিশিষ্ট প্রণালী তখনও বহুজীবনের সাধনার মধ্য দিয়ে মূর্ত হ'য়ে ওঠে নাই। দেবেন্দ্রনাথ শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের সাহায্যে ব্রহ্মোপাসনার এক সুসংবদ্ধ প্রণালী প্রণয়ন করলেন, এবং স্বয়ং সেই পদ্ধতি অনুসারে প্রকাশ্যে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্তন করলেন। এই প্রথম একটি বিধিবদ্ধ প্রণালী অবলম্বন করে উপাসনা আরম্ভ হোল। পূর্বে যা ভাবের মধ্যে ছিল এখন তা জীবনে সাধনার দ্বারা রূপ পরিগ্রহ করল। ব্রাহ্মরা উপাসনার একটি সুস্পষ্ট পন্থা লাভ করলেন। দেবেন্দ্রনাথ উপনিষদের বিভিন্ন শ্লোক থেকে সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম; আনন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি; শান্তং শিবমদ্বৈতম্ (পরে 'শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্' এই অংশ যোগ হয়)

আরাধনার এই মন্ত্র সংকলন করেন, এবং নিজ জীবনের সাধনার সাহায্যে এই মন্ত্রকে এক জীবন্ত সাধন পন্থায় উন্নীত ক'রে দেন। ব্রহ্মের সত্য জ্ঞান ও অনন্ত স্বরূপ অন্তরে উপলব্ধি ক'রে তাঁকে বিশ্বে আনন্দময় ও অমৃতস্বরূপ রূপে প্রকাশিত দেখে ও তাঁর আপন মহিমায় শান্ত মঙ্গল ও অদ্বৈতপুরুষরূপে অনুভব করে উপাসক ব্রহ্মযোগে যুক্ত হবেন—এই সাধন পন্থা উপরোক্ত আরাধনা মন্ত্রের সাহায্যে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। উত্তরকালে এই সাধনা নিজ নিজ জীবনে সফল করে তুলে বহু ব্রাহ্ম সাধক যোগযুক্ত জীবন লাভ করে'ছিলেন; এবং আজ ও অনেক ব্রাহ্ম এই আরাধনা মন্ত্র অবলম্বন করে প্রতিদিন অসীম সত্তার সঙ্গে আত্মিক যোগে যুক্ত হ'য়ে হ'য়ে অনন্ত পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'য়ে যাচ্ছেন। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মদের জন্য একটি বীজ মন্ত্রও প্রণয়ন করলেন, এই বীজ মন্ত্রের প্রধান কথা হচ্ছে, "তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব" "ঈশ্বরে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করাই উপাসনা"।

রামমোহন সকল ধর্মশাস্ত্র থেকে একেশ্বরবাদের সমর্থন পেলেও বেদ ও উপনিষদকে ভিত্তি করেই তিনি ব্রাহ্ম সমাজে এক ঈশ্বরের পূজা প্রবর্তন করেছিলেন। এই জন্য দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ দীক্ষিত ব্রাহ্মেরা প্রথমতঃ বেদ ও উপনিষদকে অপৌরুষেয় বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং সমগ্র বেদ ও উপনিষদকে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু যখন দেখা গেল যে এই সকল গ্রন্থে অনেক কল্পনা ও যুক্তিহীন অসার কথা আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের সঙ্গে মিশে রয়েছে তখন তাঁরা বেদ ও উপনিষদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করতে পারলেন না এবং এই সব শাস্ত্রকে সমগ্রভাবে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি বলে গ্রহণ করতে অক্ষম হ'লেন। এই আলোচনার ফলে দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্রাহ্মদের প্রতীতি

জন্মাল যে কোন শাস্ত্র সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি নয়, ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি হচ্ছে 'জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়'। মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুর ঘোষণা করলেন যে ধর্মের পত্তনভূমি একযোগে তিনটি :— (১) আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞান বা নিঃসংশয় জ্ঞান বা নির্মল জ্ঞান (২) বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা বিশুদ্ধ হৃদয় (৩) মনের আলোচনা বা ধ্যান ধারণা। এই ভিত্তি গ্রহণ করে মহর্ষি এদেশে এক নতুন ভাব বিপ্লবের সূচনা করলেন। এতদিন লোকে জানত ধর্মের ভিত্তি হবে শাস্ত্র, মহাপুরুষের বাণী, আচার ও অনুষ্ঠান, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম এই সমস্ত প্রচলিত ভিত্তি এক পাশে সরিয়ে রেখে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের মুক্তির পথ ও নিজের ধর্মের ভিত্তি অন্বেষণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলেন। ধর্মকে যান্ত্রিকতা থেকে মুক্ত করে প্রতি মানুষের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির উপর স্থাপিত করে ব্রাহ্ম সমাজ এদেশে আধুনিক যুগের গোড়াপত্তন করলেন। মহর্ষি এর পর ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ সংকলন করলেন। এই গ্রন্থটির দুই খণ্ড, প্রথম খণ্ড উপনিষদ ও দ্বিতীয় খণ্ড অনুশাসন। দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞানোজ্জ্বলিত হৃদয়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ প্রতিভাত হ'য়েছিল তা উপনিষদের ভাষায় প্রথম খণ্ডে লিপিবদ্ধ হ'য়েছে। সেইজন্য প্রথম খণ্ড ঠিক সংকলন নয়, একটি নূতন ব্রাহ্মী উপনিষদ, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির উপলব্ধির জীবন্ত স্পর্শে প্রাণবান্। অনুশাসন খণ্ডে মহাভারত, গীতা, মনু স্মৃতি প্রভৃতি থেকে শ্লোক সংগ্রহ ক'রে নীতির পথটি নির্দেশ করা হ'য়েছে। ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ ব্রাহ্মেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করেন, অনুসরণ করেন এবং এর সাহায্যে জীবন গঠনের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁরা এই গ্রন্থকে অভ্রান্ত বিবেচনা করেন না কিংবা শেষ সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করেন না—কারণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজেই মানব আত্মার অনন্ত পরিণতির ও ক্রমিক উন্নতির আইডিয়াটি ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শের

অঙ্গীভূত ক'রে দিয়েছেন। তাই ৺ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র এক জায়গায় বলেছেন ব্রাহ্মধর্ম ever wakeful, ever progressive, এবং ever expanding.

ব্রাহ্ম সমাজের তৃতীয় নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান সুপ্রসিদ্ধ ৺রামকমল সেনের পৌত্র ও ৺প্যারীমোহন সেনের পুত্র। তিনি ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ১৯ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র সাত বছর বয়সে হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। এবং ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই কলেজে প'ড়ে কিছুদিনের জন্য মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ঐ স্কুল উঠে যাওয়াতে আবার হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং সেখানে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পড়ে কলেজ ছেড়ে দেন। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে তিনি ছাত্রাবস্থাতেই পৌত্তলিক পূজা-পদ্ধতির উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন, কিন্তু প্রচলিত ধর্মের পরিবর্তে তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী কোন ধর্মের সন্ধান প্রথমে পান নাই।

এই অবস্থায় তাঁর মন বিষয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ল, কিন্তু শীঘ্রই ঈশ্বরের দয়ায় বিষয়াতীত ধন লাভ করার জন্য তাঁর মনে প্রবল সঙ্কল্প জাগল এবং সঙ্গে সঙ্গে এক তীব্র পাপবোধ ও বৈরাগ্যের ভাব উদয় হোল। অন্তরের মধ্যে পাপের ব্যাপকতা ও গভীর কালিমা দেখে যখন তিনি ভীত হ'য়ে উঠলেন তখন ভিতর থেকে ঈশ্বর ডাক দিয়ে বললেন, 'প্রার্থনা কর'। এমনিভাবে প্রার্থনা তাঁর নিত্য সঙ্গী হ'য়ে উঠল এবং ঈশ্বরের বর্তমানতা নিরন্তর অনুভব করতে লাগলেন। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁর অন্তরে এই সত্য প্রকাশিত করলেন যে তিনি মানুষের চির-কালের আশ্রয়। কোন গুরু কিংবা শাস্ত্রের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার আগেই তিনি অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের বাণী শুনতে পেলেন এবং বুঝলেন যে ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষের অন্তরে থেকে নিশিদিন তাকে পাপ

থেকে পতন থেকে উদ্ধার করে অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর করে দিচ্ছেন। নিরন্তর প্রার্থনা ও ঈশ্বরানুভূতি তাঁর জীবন বদলে দিল, তিনি জ্ঞানে, প্রেমে ও শুদ্ধতায় উন্নত হ'তে লাগলেন। অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের স্পর্শ অনুভব ক'রে তাঁর ইচ্ছা হোল বন্ধুদের মধ্যে অনুরূপ অনুভূতি জাগুক এবং সমবিশ্বাসী বন্ধুদের নিয়ে একটি মণ্ডলী গড়বার ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে তাঁর মনে উদয় হোল। এই উদ্দেশ্যে 'good will fraternity' নাম দিয়ে একটি সমিতি স্থাপন ক'রে 'ঈশ্বর আমাদের পিতা এবং সব মানুষ আমাদের ভাই', এই ভাবটি সকলের মধ্যে প্রচার করতে সচেষ্ট হ'লেন। তাঁর প্রাণ মনোমত ধর্মমণ্ডলীর জন্য যখন ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছিল, এবং কোথাও তা খুঁজে না পেয়ে নিজেই যখন একটি অনুরূপ মণ্ডলী গঠনে প্রয়াসী হ'লেন ঠিক সেই সময়ে কোলকাতা ব্রাহ্মসমাজ থেকে প্রকাশিত একটি ছোট বইয়ে ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে পারলেন। এইভাবে ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে তিনি দেখলেন যে ব্রাহ্মধর্মের বাণীর সঙ্গে তাঁর আপন অন্তরের ঈশ্বরের বাণীর কোন প্রভেদ নেই, এই ঐক্য দেখতে পেয়ে ১৯ বছর বয়সে (১৮৫৭) তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। Good will Fraternity-র অনেক যুবকও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে আকৃষ্ট হন; কেশব এই তরুণ দলের নেতা হ'য়ে ব্রাহ্ম সমাজের ও দেশের মধ্যে এক নূতন ভাবধারা নিয়ে আসবার জন্য প্রস্তুত হ'লেন। কেশব চন্দ্রের মধ্যে ছিল গভীর ঈশ্বর বিশ্বাস, অন্যায়ের উপর তীব্র বিদ্বেষ, প্রার্থনাশীলতা ও সত্যে অবিচলিত নিষ্ঠা; এর উপর তাঁর ব্যক্তিত্বের এক প্রবল আকর্ষণী শক্তি ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের শক্তি অপরাজেয় প্রভাবে সমস্ত বাধা অতিক্রম ক'রে তার অন্তরের উজ্জ্বল বিশ্বাসকে সকলের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যাকুল হ'য়ে উঠত। এই মহাপুরুষ

যখন তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে প্রবেশ করলেন তখন নেতৃত্বের স্বাভাবিক অধিকার বলে ব্রাহ্ম সমাজ সংগঠনের প্রথম ভার তাঁর উপরই ন্যস্ত হোল।

ব্রাহ্ম ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য অনন্ত বিকাশ। নব নব সামাজিক পরিবেশের মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্মের পূর্ণ রূপটি ভাবীকালের মধ্যে চিরকালই গড়ে উঠবে। তাই রামমোহনের বিরাট অন্তরে যে ব্রাহ্মধর্ম আবির্ভূত হ'য়েছিল তার বিপুল সম্ভাবনীয়তাকে রামমোহন শুদ্ধ মাত্র বীজাকারে এক ক্ষুদ্র ব্রাহ্ম সমাজরূপে প্রকাশিত করতে পেরেছিলেন, কিন্তু বাইরে ক্ষুদ্র হ'লেও সেই আন্দোলনের যে বিপুল ভবিষ্যত অপ্রকাশিত ছিল তাই কালে কালে রূপ পরিগ্রহ ক'রে বর্তমানের ব্রাহ্মসমাজ হ'য়েছে এবং এই বর্তমান ব্রাহ্মসমাজও নিরন্তর বিকাশের মধ্য দিয়ে ধর্মের পূর্ণরূপটি মানবসমাজে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ব্রাহ্মসমাজের বীজনিহিত সম্ভাবনীয়তাকে অসীমকালে সফল ক'রে তুলবেন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের মধ্যে এই বিকাশশীল অগ্রগতিকেই স্তরে স্তরে লক্ষ্য করা যায়। রামমোহনের একেশ্বরবাদী সভার ধর্ম দেবেন্দ্রনাথের হাতে ব্রাহ্মধর্মে পরিণত হোল আবার দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম কেশবচন্দ্রের হাতে জীবনের ধর্মরূপে প্রকাশিত হ'য়ে ধর্মসাধন ও প্রতিদিনকার জীবনযাত্রাকে মিলিয়ে দিল। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মকে শাস্ত্র ও প্রেরিতপুরুষের ভিত্তি থেকে উঠিয়ে নিয়ে বিশুদ্ধ আত্মার সংশয়রহিত বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের বাইরের রূপ হোল উপনিষদের বাণী কিন্তু অন্তরের রূপ হোল "তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"। ব্রাহ্মধর্ম যখন বল্লেন অন্তরের বিশুদ্ধ আলোকই ঈশ্বরকে জানার উপায় তখনও বহুজীবনে এটি পরীক্ষিত হয় নাই। তাই অনেকে উপাসনাগৃহে

এক ঈশ্বরকে আরাধনা করতেন, কিন্তু নিজগৃহে পৌত্তলিক বিশ্বাস অনুযায়ী নানা অনুষ্ঠান করতেন। ফলকথা তখনও ব্রাহ্মধর্মের রূপটি অনেক মানুষের জীবনে উজ্জ্বল হ'য়ে প্রকাশিত হ'য়ে এক দৃঢ়বদ্ধ আদর্শনিষ্ঠ ধর্মমণ্ডলী গ'ড়ে ওঠে নাই। কেশবচন্দ্র প্রতিদিনের জীবন-যাত্রার প্রত্যেক কাজটি ব্রাহ্মধর্মানুযায়ী করবার আয়োজন করলেন, এবং ব্রাহ্মদের আদর্শানুরূপ জীবনযাপনের জন্য সংঘবদ্ধ করবার জন্য নানা চেষ্টা করতে লাগলেন। এরই ফলে উত্তরকালে সত্যসন্ধ উন্নত-জীবনসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ গোষ্ঠী গ'ড়ে উঠে ব্রাহ্মসমাজকে এক নূতনরূপে দেশের লোকের কাছে তুলে ধরলেন। অকস্মাৎ ব্রাহ্মধর্মের অগ্নিময় বাণী বহুজীবনের মধ্যে প্রতিভাত হ'য়ে তার স্থির প্রভায় দেশের লোককে মুগ্ধ, বিস্মিত ক'রে ব'লে দিল যে ব্রাহ্মধর্ম জীবনের ধর্ম।

ঈশ্বরকে পেতে হ'লে মানুষকে হ'য়ে উঠতে হবে সত্যসন্ধ। সত্য-স্বরূপের পূজা তখনই সার্থক হয় যখন প্রতিকর্মে, প্রতি ইচ্ছায়, প্রতি অনুষ্ঠানে মানুষ সত্যানুসরণ ক'রে সত্য হ'য়ে উঠে। দেবেন্দ্রনাথ নিজ জীবনে এটা সম্ভব ব'লে জানলেও, সাধারণ মানুষের জীবনে এই সত্যপ্রতিষ্ঠা হঠাৎ সম্ভবপর নয় বলে মনে করতেন, তাই ব্রাহ্মেরা যখন ব্রাহ্মধর্ম-সাধন ও প্রচলিত বিধি অনুযায়ী নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান এই দুই বিপরীতের মিলন ঘটাচ্ছিলেন তখন দেবেন্দ্রনাথ তাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা ক্ষমা করে সামাজিক ক্রমবিকাশের উপর নির্ভর ক'রে ব'সে থাকলেও কেশবচন্দ্রের দল তাঁদের বিপ্লবী মনোভাবের প্রয়োগের দ্বারা অধ্যাত্মসাধনাকে কেবল ধ্যানে পর্য্যবসিত ক'রে না রেখে জীবনে প্রসারিত ক'রে দিলেন। ফলে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে জীবনে ধর্ম আচরণ করার সম্ভাবনা প্রমাণিত হোল এবং ব্রাহ্মধর্মের যে জীবনধর্মীরূপ আজ

আমরা দেখতে পাচ্ছি তার গোড়াপত্তন হোল। যদি দেবেন্দ্রনাথের ক্রমবিকাশের মনোভাব অনুসরণ করে তাঁরা চলতেন তাহ'লে ব্রাহ্মসমাজ স্থাণু অচল ও স্বাতন্ত্র্যবর্জিত হ'য়ে লুপ্ত হ'য়ে যেত।

কেশবচন্দ্র ও তাঁর নবীনদল প্রথমে আচার্য্যনিয়োগে জাতিভেদ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ ভেদ দূর করলেন, এই কারণে দেবেন্দ্রনাথের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে কেশবচন্দ্র ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ১১ই নভেম্বর, ১২৭৩ বঙ্গাব্দের ২৬ কার্ত্তিক রবিবার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সমাজ প্রতিষ্ঠার ফলে বহুলোক ব্রাহ্মধর্মানুগ জীবন যাপনে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁরা একদিকে গভীর অধ্যাত্মসাধনে ব্রতী হ'লেন, অন্যদিকে সকলে নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্মের একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করলেন। ফলে একদিকে যেমন মানুষের জীবন সত্যের নির্মল আভায় সুন্দর ও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল অন্যদিকে অধ্যাত্মসাধনা এক নূতন উন্নতরূপে দেখা দিল। এখন অধ্যাত্মসাধনা শুধু ধ্যান ও যোগের বিষয় রইল না, এই সাধনা জীবনের প্রতি স্তরে ঈশ্বরের প্রকাশকে দেখা, প্রতিকর্মে ঈশ্বরের সান্নিধ্য অনুভব করা ও বিশ্বপরিণতির পথে প্রতি মানুষকে ঈশ্বরের সন্তান ও সাথী ব'লে জানাকে অধ্যাত্ম-বোধের প্রয়োজনীয় অঙ্গরূপে স্বীকার করে নিল। সামাজিক জীবনের সঙ্গে অধ্যাত্মসাধনার মিলন ঘটানোতে সমাজসংস্কারও দ্রুতবেগে অগ্রসর হোতে লাগল। সেকালে জাতিভেদলোপ, নরনারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতার প্রচলন, অসবর্ণবিবাহ-বিধি প্রণয়ন প্রভৃতি আন্দোলনের প্রভাব ও সাফল্য থেকে বোঝা যাবে যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের সত্যসাধনা কি অসাধ্যসাধন করতে পারে। এই সময় থেকে লোকে ব্রাহ্মদের চিনতে পারল শুধু একেশ্বরবাদী ব'লে নয়, শুধু বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম অনুসরণকারী বলে

নয়, পরন্তু ধর্মনিষ্ঠ, চরিত্রবান, উন্নতজীবনে অধিকারী ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ ব'লে।

আগেই বলেছি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ কোন বিশেষ শাস্ত্র কিংবা পূজাপদ্ধতির মধ্যে বদ্ধ নয়, আদর্শ চিরবিকাশশীল। তাই কেশবচন্দ্র যেখানে থামলেন কেশবের তরুণভক্তদল সেখান থেকে আরম্ভ ক'রে ব্রাহ্মসমাজকে বহন ক'রে নিয়ে চললেন। এই তরুণদলের মধ্যে প্রধান ছিলেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (উত্তর-কালে জটিয়াবাবা) আনন্দমোহন বসু, ও দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের জীবনধর্মরূপ ফুটিয়ে তোলার জন্য নানা সমাজ-সংস্কারে রত হ'য়েছিলেন, ফলে একটি নবীনসংস্কারদল ব্রাহ্মসমাজে আবির্ভূত হলেন। তারা একদিকে প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্মকে ত্যাগ করলেন অন্যদিকে দেশের মধ্যে নাস্তিকতার প্রবল বন্যার গতিরোধ করে শিক্ষিতসমাজের মধ্যে ধর্মের মূল্যবোধ জাগাবার জন্য বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁরা সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ও প্রতিদিনের জীবনাদর্শ, সবই ধর্মকেন্দ্রিক করে নিলেন, এবং ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও সমাজ গড়তে সচেষ্ট হ'লেন। তখন ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লব-উদ্ভূত সাম্যমৈত্রীস্বাধীনতা আদর্শে সকল দেশের যুবকসমাজ অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠেছিল; তা ছাড়া মধ্যযুগীয় অর্থনীতির মৃতদেহের উপর প্রতিষ্ঠিত দেশদেশপ্রসারিত বৃহদাকার শিল্পবাণিজ্যের সহায়ক ধনতন্ত্র সকল দেশে রাষ্ট্রনীতির মধ্যে এক বিপ্লব এনে উপস্থিত করেছিল; ফলে নানাদেশে রাজতন্ত্র অস্তমিতপ্রায় হ'য়ে গণতন্ত্রের উদয়ের সূচনা দেখা যাচ্ছিল। এই ডিমোক্রেসীর আদর্শ ইংরাজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে এদেশে এসে উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু এদেশে গুরুপুরোহিত ও শাস্ত্রশাসিত মানুষের মনে স্থান করে নিতে পারেনি। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে ছিল মুক্তির মন্ত্র, শাস্ত্র ও

গুরুর নাগপাশ থেকে ব্রাহ্মধর্ম মানুষের মনকে মুক্ত করে দিয়েছিল, তাই নবীন ব্রাহ্মদল ব্রাহ্মধর্মের প্রসাদে মুক্তমন দিয়ে গণতন্ত্রের আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন এবং এই গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন করার জন্য কৃতসংকল্প হ'য়েছিলেন। কেশবের চরিত্রে একদিকে ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও বৈপ্লবিক মনোভাব, আর একদিকে ছিল প্রবল ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বশক্তি। তিনি ছিলেন এক জন পুরোপুরি নেতা। তাই অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল, এমন কি তাঁর ভুল যদি কেউ দেখিয়ে দিত তাও তিনি সহ্য করতে পারতেন না—মোট কথা যে নেতৃত্বের শক্তি, বৈপ্লবিক মনোভাব ও সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তাঁর মধ্যে সমন্বয় লাভ করে তাঁকে এক মহাশক্তিশালী পুরুষ করেছিল সেই সবই অন্যদিকে তাঁর মধ্যে একটি 'Intolerant militant' ভাবও সৃষ্টি করেছিল। তদুপরি গণতন্ত্র থেকে একতন্ত্রের দিকেই ছিল তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক, এই ঝোঁক নানাকারণে তাঁর চরিত্রে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল—এই সকল কারণের মধ্যে প্রধান ছিল তাঁর অভিজাত বংশের রক্ত, তাঁর অসাধারণত্ব ও প্রেরিতপুরুষনীতির উপর দৃঢ়বিশ্বাস। ফলে তাঁর ভক্তদলেরা তাঁকে প্রায় দ্বিতীয় যীশুখৃষ্ট করে পরিত্রাণকর্তা ক'রে তুলেছিল এবং নবীন ব্রাহ্মদল যখন গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমাজ গ'ড়ে দেশকে অগ্রসর ক'রে নিতে চেয়েছিলেন তখন তিনি এক ফিউডেল রাজবংশের আশ্রয়ে এনে ব্রাহ্মসমাজকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত (?) করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ইতিহাসের স্রোতধারার গতি উপেক্ষা করে জীবন্ত গণতন্ত্রের আদর্শ ছেড়ে দিয়ে মৃতপ্রায় ফিউডেলতন্ত্রের শরণাপন্ন হলেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে অন্যতম দেশীয়রাজ্য কুচবিহারের রাজকুমারের সঙ্গে তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ের বিয়ে ঠিক ক'রে ফেললেন। তার আগে তাঁরই

উদ্যোগে মেয়েদের বিয়ের নিম্নতম বয়স ১৪ বছর বলে ধার্য্য করে তিন আইন নামে ব্রাহ্মবিবাহ আইন পাস হয়; এবং এজন্য মহর্ষির সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ দৃঢ়তর হয়। তিনিই জীবনে ধর্ম আচরণের ও সত্য অনুসরণের পথ দেখিয়েছিলেন, তিনিই আবার মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে সেই সত্যপথ ত্যাগ করলেন, হোক না কেন তা তাঁর আদর্শানুযায়ী ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গলের জন্য। এই বিবাহব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হোল, তাঁর অন্ধ ভক্তদল কেশবচন্দ্রকে 'Infallible' মনে করে সকল স্তুতিনিন্দার উর্দ্ধে তাঁকে স্থাপন করলেন, কিন্তু নবীনদল এই একতন্ত্রশাসন ও প্রেরিতপুরুষনীতি ব্রাহ্ম আদর্শের বিরোধী ও ব্রাহ্মধর্মের পরিপন্থী ব'লে কেশবচন্দ্রের নেতৃত্ব অস্বীকার ক'রে এক নূতন সমাজ গড়বার জন্য অগ্রসর হয়ে এলেন। ফলে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মে, ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের কোন অমিল ছিল না, কিন্তু ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে একতন্ত্রের অভ্যুত্থান দেখে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতারা চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন, তাঁরা মনে করলেন সমগ্র সমাজ নিয়মতন্ত্র প্রণালী অনুসারে না চললে ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সর্বসাধারণের শিক্ষার ও সেবার ক্ষেত্র হ'য়ে উঠতে পারবে না, এবং ব্রাহ্মধর্ম তার গতিশীলতা হারিয়ে ঐতিহাসিক ধর্মসমূহের মত একটি বাঁধাধরা রূপ ধারণ করে মিউজিয়মের দর্শনীয় হ'য়ে থাকবে। তাই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই আদর্শ যোগ করে দেওয়া হোল যে ব্রাহ্মসমাজের সকল সদস্যের মতানুসারে নিয়মতন্ত্র প্রণালী অবলম্বনে ব্রাহ্মসমাজের সব কাজ নির্বাহ করা হবে। এর ফলে ব্রাহ্মসমাজ একতন্ত্রের প্রভাবমুক্ত হ'য়ে বহুমানুষের সাধনার দ্বারা

পরিচালিত হওয়ার সুযোগ পেল। এতে ব্রাহ্মধর্মের পূর্ণতর রূপটি ফুটবার সহায়তা হোল এবং ব্রাহ্মসমাজের বিকাশের ধারাটি আরও অগ্রসর হ'য়ে গেল। কারণ যে ব্যক্তিগত সাধনা ও মধ্যবর্ত্তী ব্যতিরেকে ঈশ্বরযোগ ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তি তা একতন্ত্রের প্রভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে এবং ব্রাহ্মধর্মের সাধনধারার মধ্যে কিছুটা মহাপুরুষপূজা ও ritualism ঢুকে প'ড়ে ব্রাহ্মধর্মের অব্যাহত বিকাশকে পঙ্গু করে দেয়। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ একতন্ত্রকে বর্জন ক'রে ধর্মের ক্ষেত্রে এক মহাসাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে ব্রাহ্মধর্মের পূর্ণবিকাশের পথটি উন্মুক্ত ক'রে দিলেন। সকল প্রভাবমুক্ত ব্যক্তির জীবনসাধনদ্বারা যোগযুক্ত হওয়ার আদর্শটি গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানেই বেঁচে থাকতে পারে, এই কারণে ব্রাহ্মধর্মের শুদ্ধতম রূপটি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেই বেঁচে আছে।

শতাধিক বৎসরের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম যে রূপ পরিগ্রহ করে তা ব্রাহ্মদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, আধুনিক ভারতবর্ষের চিন্তাধারাকে এই ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত করেছে। "এক জাতি এক ভগবান, এক ধর্ম এক মন প্রাণ" এই স্বপ্ন এখনও সফল হয় নি' সত্য, এখনও নানা আদর্শ সংঘাতের দ্বারা ক্লিষ্ট, অশিক্ষা ও মূঢ়তার অন্ধকারে আচ্ছন্ন লক্ষ লক্ষ মূক ভারতবাসী এই মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়নি জানি, তবু এই বিশাল ভারতবর্ষ যে একটি লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে ভাবধারাটি অব্যাহতগতিতে সেই লক্ষ্যের দিকে ভারতবর্ষকে বহন করে নিয়ে চলেছে সেই যুগোপযোগী ভাবধারাই ব্রাহ্মধর্মের সাধনা ও আদর্শের দ্বারা চিহ্নিত হ'য়ে প্রাণবান ও বেগবান হ'য়েছে এই কথাটি ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসের মধ্যে স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছে। মানব মনের মুক্তি, সকল মানুষের মূলগত ঐক্য ও

নরনারী সাধারণের সমান অধিকার আধুনিক যুগের এই তিন প্রধান আদর্শকে মূর্ত করে তোলার জন্য ব্রাহ্মসমাজের বহু জ্ঞানী, গুণী, ভক্ত, সাধক প্রাণের প্রদীপটি দীপ্ত করে তুলেছেন। তাঁদের জীবন সাধনার মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের বিকাশশীল ও সচল ভাবধারাটি বহু মানুষের মনকে জড়তা, অন্ধ বিশ্বাস, ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতা থেকে উদ্ধার করে গতিশীল ও উদার জীবনের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে। তাই ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা দ্বারা ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব নির্ণয় করা সম্ভব নয়; ব্রাহ্মধর্মের আদর্শের মহনীয়তা, ব্রাহ্মধর্ম-সাধকের মুক্ত দৃষ্টি ও সাম্যবোধ এবং ব্রাহ্মসমাজের ক্রমবিকাশশীল রূপ এই বিশিষ্ট সাধনার প্রভাব ও সম্ভাবনীয়তাকে কিছু পরিমাণে সুস্পষ্ট করতে সক্ষম হবে। এই সম্ভাবনীয়তাই একদিন বহু জীবনে মূর্ত হ'য়ে উঠে আধুনিক যুগকে এদেশে সফল করে তুলবে।

আধুনিক যুগের ভাবধারাটি সকল দেশেই মানুষের মনকে জড়তা থেকে, অন্ধতা থেকে, সংকীর্ণতা থেকে, মূঢ়তা থেকে উদ্ধার করেছে; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই নিরীশ্বরতা থেকে রক্ষা করতে পারে নাই। বরং অনেক মানুষের মনে ধর্ম সম্বন্ধীয় মূল্যবোধ লুপ্ত ক'রে দিয়ে মানুষকে স্বপ্রধান ও ইহসর্বস্ব করে তুলেছে। কারণ নানা দেশে ধর্ম সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে আছে। ঈশ্বরোপলব্ধির প্রয়োজনীয়তা সমাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় নাই। যেখানে মানুষ পতিত, অবনত, পাপের ও দারিদ্র্যের পঙ্কে মগ্ন, যেখানে ঈশ্বরোপলব্ধির প্রাণপ্রদ সাধনা এনে মানুষকে সংসারের মধ্যেই উন্নত ও উজ্জ্বল জীবনের অধিকারী করার চেষ্টা হয় নাই। সকল কর্মে ও সকল সম্বন্ধের মধ্যে, সকল সমস্যায় ও সকল দুঃখের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জানা ও পালন করার আদর্শ এই সংকীর্ণ ধর্ম মানুষকে দেয় নাই। বলা হয়েছে—হয় এই

দুঃখময় সংসার ত্যাগ ক'রে চ'লে যাও কিংবা সংসারে থেকে পাপ ও পুণ্যের সঙ্গে একটা রফা করে চালাও; ফলে সংসার-জীবন মানুষের কাছে অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় আধুনিক যুগে কোন কোন জায়গায় Humanismকে এনে ধর্মের স্থানে বসিয়ে মানুষের মনের এক বিশেষ আকাঙ্ক্ষাকে মিটাবার চেষ্টা হয়েছে। ব্রাহ্মধর্ম আধুনিক যুগের গতিশীল ভাবধারার সঙ্গে ঈশ্বরোপলব্ধির আদর্শকে যুক্ত করে দিয়ে মানুষের মনকে লক্ষ্যহীন উদ্দামগতির চরম ব্যর্থতা থেকে এবং Humanismএর সসীম আদর্শের নিরর্থকতা থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হ'য়েছে। ব্রাহ্মধর্ম মানুষকে সেই জীবনাদর্শ দিয়েছে যার মধ্য দিয়ে মানুষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ঈশ্বর-ভক্তির সামঞ্জস্য সাধন করতে পারবে।

এই জীবনাদর্শ বৈজ্ঞানিক সাধনজাত জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে নূতন ও গভীরতর মূল্যবোধকে ঈশ্বরোপলব্ধির মধ্য দিয়ে সহজ করে দেবে। এই জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত মানুষ আধুনিক সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের মধ্যে আপন অন্তরের দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রাখতে পারবে এবং এই যুগান্তকারী চিন্তা বিপ্লবের ধূলিজালের মধ্যে এই দেশ-দেশ প্রসারিত প্রবল বিপর্যয়ের মধ্যে মানুষ তার অনন্তপ্রয়াসী মননধারাটি অব্যাহতগতিতে বিশ্বব্যাপী একের দিকে প্রসারিত করে দিতে পারবে। ব্রাহ্মধর্মের আদর্শ অনুসরণ করে মানব আত্মা বহির্জগতের ও মানব সমাজের দ্রুত পরিণতির সঙ্গে তাল রেখে আপন চিরন্তন যাত্রাপথে অবিচলিতভাবে অগ্রসর হয়ে যেতে পারবে। অসীমের দিকে নিরন্তর অভিব্যক্তি দ্বারা চিহ্নিত ব্রাহ্মধর্ম যুগযুগধাবিত মানব যাত্রীর মননধারাটি বহন করে নিয়ে চলেছে অনন্তের দিকে। এই ধর্মই বর্তমানের ধর্ম, এই ধর্মই ভবিষ্যতের ধর্ম।

চিঠি

স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা,
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা,
কী অর্থ ইহার মনে ভাবি।

—আকাশ-প্রদীপ

ভারত-সরকারের মহাফেজখানায় যে ১৭৫ খানি প্রাচীন বাংলা চিঠি সংরক্ষিত ছিল, স্বনামধন্য ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন তাঁর 'প্রাচীন বাঙ্গালা পত্র সঙ্কলনে' সেগুলির প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন। প্রায় পৌনে দুশো বছর পূর্বে আমাদের দেশে বৈষয়িক চিঠিপত্রের চেহারা কি রকম ছিল, এই বইখানি তার নির্দেশক। এইসব চিঠিতে 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণ,' 'শ্রীশ্রীশিবঃ,' 'শ্রীশ্রীদুর্গা' ইত্যাদি দেবদেবীর নামোল্লেখের নীচে '৺মহামহিম মহিমা শ্রীযুত বড় সাহেবজিউ' কিংবা '৺ইয়াদদাস্ত ও দরখাস্ত শ্রীরুদ্ররাম বড়ুয়া' কিংবা 'মহামহিম শ্রীযুক্ত ড্রোক্তর সাহেব বরাবরেষু,' কিংবা অন্যতর বিশেষণ-সমৃদ্ধ দীর্ঘতর শব্দমালায় পত্রোদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে সম্বোধন করা হয়েছে। চিঠির ভাষায় বিশুদ্ধ তৎসম শব্দের সঙ্গে গা ঘেঁষে বসেছে বিচিত্র আরবী-পারসী শব্দ। স্বাক্ষরের জায়গায় ব্যবহার করা হ'য়েছে পারসী সাল। তারিখের উল্লেখে শকাব্দ, সন, খ্রীষ্টাব্দ, সকাবত, মোতাবেক ইত্যাদির যথেচ্ছ প্রয়োগ এই চিঠিগুলির বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বাংলা চিঠিগুলি যখন লেখা হ'য়েছে,

বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণের ব্যবহারযোগ্য মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থ তখনো অপ্রকাশিত,—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলা গদ্যের ব্যাপক অনুশীলন এবং মুদ্রিত বাংলা রচনার ব্যাপক প্রচলন আরম্ভ হলো। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা চিঠির চেহারাও বদলেছে। ছাপা গদ্যের যুগে চিঠির গদ্যও দ্রুত তালে আধুনিক হ'য়ে উঠেছে। কেবল একটি শতাব্দীর মধ্যে বাংলা পত্রধারা তার বন্ধুর উৎসক্ষেত্র থেকে একেবারে সাহিত্য-সঙ্গমে প্রবাহিত হ'য়ে এসেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বোক্ত চিঠিগুলির সঙ্গে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের 'য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র' এক নিশ্বাসে পড়ে ফেলা কি সহজসাধ্য অনুষ্ঠান ?

ইতিহাসে অনুরক্ত পাঠক আরও অতীতে দৃষ্টি ফেরাতে বিমুখ হবেন না। প্রায় চারশো বছর পূর্বের একখানি চিঠির নকল পাওয়া গেছে বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত আলোচকদের প্রসাদে। এই চিঠিখানি লিখেছিলেন কুচবিহারের মহারাজ নর-নারায়ণ এবং এ পত্রের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটিও সামান্য ছিলেন না। আহোমরাজ চুকাম্‌ফা স্বর্গদেবকে সম্বোধনের যে ভাষা এই চিঠিতে ব্যবহৃত হয়েছিল, সেই অংশটুকু নীচে তুলে দেওয়া হলো :—

"স্বস্তি সকল-দিগ্‌দন্তি-কর্ণতালাস্ফাল সমীরণ-প্রচলিত হিমকর-হার-হাম-কাশ-কৈলাস-প্রান্তর-যশোরাশি-বিরাজিত-ত্রিপিষ্টপ ত্রিদশ তরঙ্গিণী-শলিল-নির্ম্মল-পবিত্র-কলেবর ভীষণ প্রচণ্ড ধীর-ধৈর্য্য-মর্য্যাদা-পারাবারসকল দিক্-কামিনী-গীয়মান-গুণসন্তান শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ মহারাজ প্রতাপেষু।"...

বিশেষণ-বিলাসীরা এর পর বাণভট্টের কাদম্বরীর কথা ভাববেন। কিন্তু, কাদম্বরী কাব্যের বিশেষণপ্রাচুর্য্যের মূলে যে মনোভাবটি কাজ করেছে, আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক তাকে বলতে পারেন বিলাসনেচ্ছা

বা exhibitionism, আর সে ইচ্ছার অধিকারী ছিলেন একজন কবি। পক্ষান্তরে আহোমরাজ স্বর্গদেবের উদ্দেশে এই যে বিশেষণের ঘটা, এ শুধু এক রাজার প্রতি অন্য রাজার একটি রাজকীয় অনুষ্ঠান। বলা বাহুল্য, এ বাচালতা আর যাই হোক, সাহিত্যিক বাচালতা নয়। কুচবিহারের মহারাজ নর-নারায়ণের এই চিঠিখানি লেখা হয়েছিল ষোড়শ শতাব্দির মাঝামাঝি সময়ে। এ চিঠিও বৈষয়িক চিঠি,— অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষয়িক বাংলা চিঠির সঙ্গে এর কোনো রীতিগত পার্থক্য নেই। শব্দতত্ত্বানুরাগীরা ভিন্নকালবর্তী এই পত্র-মালায় শব্দ প্রয়োগের বৈচিত্র্য দেখে খুশি হতে পারেন। কিন্তু এসব চিঠি যে সর্বথা সাহিত্য-সম্পর্ক-বিমুক্ত, এ অভিমত সর্ববাদিসম্মত।

বৈষয়িকতা-সম্পর্কহীন বাংলা চিঠির উৎসকাল হলো খ্রীষ্টীয় উনিশ শতক। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ এই মন্দাকিনীর ভগীরথ। কিন্তু তাঁদের শ্রমে, প্রজ্ঞায়, বিদ্যাবত্তায় বাংলা ভাষায় লেখা চিঠি বৈষয়িকতার দৃঢ় শাসন স্থানে স্থানে লঙ্ঘন করেছিল মাত্র। তাঁদের উপচীয়মান ব্যাপ্তিবোধ চিঠির পাত্রে মাঝে মাঝে অল্প বিস্তর আত্মপ্রকাশ করেছে। তথাচ চিঠিকে তাঁরা সাহিত্যের অন্যতম বাহনের মর্যাদা দেন নি। মধুসূদনের ইংরেজী চিঠিখানি যদি বাংলা ভাষায় লেখা হতো তা'হলে বরং মধুসূদনকেই বাংলা পত্র সাহিত্যের জনক আখ্যা দেওয়া যেতো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি উনিশ শতকের মধ্য পর্বের অন্যান্য মনীষীরাও মূলতঃ চিঠির আটপৌরে স্বভাবের দৈন্যবোধ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সাহিত্যচর্চার সময়ে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত অন্যান্য গদ্যময় বাহনগুলিকেই মেনে নিয়েছিলেন। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্য পত্রধর্মী পোষাকী রচনা, তার বিষয়-বস্তু ভারতীয় কাব্যপুরাণমূল, প্রেরণা পাশ্চাত্য।

'পথে ও পথের প্রান্তে' নামক পত্র সংকলনের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

"ভরতি মনের অবস্থায় জরুরি কথা ছাপিয়েও উদ্বৃত্ত থাকে মুখরতা। যাঁরা মজলিসি স্বভাবের লোক তাঁদের সেই উদ্বৃত্ত প্রকাশ পায় বৈঠকে, যাঁরা অন্তর্নিবিষ্ট তাঁরা স্বগত উক্তি লেখেন ডায়ারিতে, আমার মতো যাঁদের রচনায় মৌতাত তাঁরা বকুনি চালান করেন এমন কারোর কাছে যাঁদের দিকে চিঠির রাস্তা সহজ হয়ে গেছে।"

এই মন্তব্য দেখে মনে হওয়া স্বভাবিক যে, চিঠি যখন সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে ওঠে, তখন ত' ব্যক্তিগত মননধর্মী প্রবন্ধ অথবা গীতিকবিতারই সামিল হয়। শেষোক্ত সাহিত্যশাখাটি অবশ্য রূপগত বৈশিষ্ট্যে পৃথক,—যদিও, অন্তর-বিচারে সদৃশ। আর, প্রথমোক্ত শাখার অন্তর-বিচারে আবার দুই উপশাখার বিভাগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে: এক, গম্ভীর ধরণের রচনা, দ্বিতীয়তঃ, লঘু বিষয়ের আলাপ। সাহিত্যপদবাচ্য চিঠিরও এই দুই মূর্তি চোখে পড়ে। Lucas, কিংবা Robert Lynd, কিংবা Keats-এর চিঠি গম্ভীর মননের দৃষ্টান্তবহ,—পক্ষান্তরে, Ellen Terry-র উদ্দেশে লেখা Bernard Shaw-র পত্রমালা লঘু আলাপের দর্পণ।

সাহিত্যপদবাচ্য চিঠির বিশ্লেষণে ভাবাবেগেরও দুই প্রকৃতি ধরা পড়ে—কোনো চিঠিতে দেখা যায় কেন্দ্রনিষ্ঠ মনন অর্থাৎ intensive emotion, আবার কোথাও ফুটে ওঠে লেখকের ভাববৃত্তির নানাচারিত্ব—ইংরেজিতে যাকে বলে, discursive emotion।

রবীন্দ্রনাথের পত্রধারায় চিঠির এই বিচিত্র প্রকৃতির সর্বধারার প্রতিফলন ঘটেছে। শুধু তাই নয়, কয়েকটি চিঠিতে তিনি পত্রতত্ত্ব নিয়েও আলোচনা চালিয়েছেন! এমনি একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন:

"পৃথিবীতে চিঠি লেখায় যারা যশস্বী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অল্প। যে দু'চারজনের কথা মনে পড়ে তারা মেয়ে!" ৪। শ্রাবণ। ১৩৩৬। অনুরূপ আর একখানি চিঠিতে কবি লিখেছিলেন:

"আমি প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই আমার এই চেয়ে দেখার বিবরণটা লিখি। পৃথিবী কিছুতেই আমার কাছে পুরাণো হোলো না—ওর সঙ্গে আমার মোকাবিলা চলছে, এইটেই আমার সব খবরের চেয়ে বড়ো খবর।" ১৮। কার্তিক। ১৩৩৫।

সংস্কৃত কাব্যে চিঠি লেখার প্রসঙ্গ কোনো কোনো জায়গায় যে না উঠেছে, এমন নয়। কাব্যের কথা ছেড়ে দিলেও বররুচির 'পত্র-কৌমুদী'র কথা ধরা যায়। কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট নিমিত্তের কথায় মনকে না বেঁধে অনিমিত্ত মননের দাক্ষিণ্যে চিঠিকে সাহিত্য করে তোলা বাংলা সাহিত্যের আধুনিক সৃষ্টি। অবশ্য, বাংলায় মেয়েদের লেখা চিঠি এখনো সাহিত্যের সর্বজনীন কোনো গ্রন্থাগারে জায়গা পায় নি। তার কারণ বোধ হয়, এই যে, মেয়েদের পর্দা এ দেশে বেশীদিন ঘোচে নি—কিংবা পর্দাবিমুক্তারা নিজেদের অভিভূত অবস্থাটা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। কিন্তু, সে যাই হোক, পর্দা বা বোরখা বা আঙিনার বেড়া ডিঙ্গিয়ে মুক্তি অর্জন করেই তাঁরা যে দলে দলে শুধু রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'-এর অনেকগুলি নকল রচনা করবেন, সে রকম আশঙ্কা পোষণের কোনো হেতু নেই। মুক্ত মননের বৈচিত্র্যে আর মেয়েলি মমতার সৌরভে তাদের অনেক চিঠিই হয়তো সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠবে। চিঠিতে সাহিত্য সঞ্চার করবার প্রক্রিয়ায় এই দুটি গুণই অত্যাবশ্যক,—মননও দরকার, মমতাও অনিবার্য;—আর সে মমতা অধিকার স্পৃহামাত্র নয়, সে হলো দ্রষ্টার মমতা, ভোক্তার নয়! রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাবধান করে দিতে

গিয়েছিলেন : "ঐ দুটোকে এক করে ফেললে দৃষ্টির আনন্দ নষ্ট হয়, ভোগের আনন্দ ক্ষুণ্ণ হয়।" ৮ কার্ত্তিক। ১৩৩৬

মমতা ও মননের শাসনই সাহিত্যপদবাচ্য চিঠির গতি নিয়ন্ত্রণ করে। তাই চিঠির সাহিত্যিক মূল্য যেখানে স্বীকৃত হয়, সেখানে তার রূপকল্পের বাঁধাবাঁধি কোনো আদর্শনিষ্ঠার যাচাই চলে না। রবীন্দ্রনাথ ঐ যে বলেছিলেন 'ভরতি মনের বকুনি', সেই কথাটি এই প্রসঙ্গে পুনর্বার স্মরণীয়। লেখকের ভাবের ক্ষিপ্রতা ও চলচ্ছক্তি অনুযায়ী চিঠির অন্তর্ভুক্ত প্রসঙ্গাবলীর অবতারণা ও বিন্যাস ঘটে থাকে। বৈষয়িক চিঠি অবশ্য এই আইনের ব্যতিক্রম। সে ধরণের চিঠি লেখবার আদর্শের জন্য হুঁশিয়ার ও বিচক্ষণ লোকেরা পরিমিত বিনয় ও বার্তাবহ সুনিপুণ পত্রমালার প্রতি সন্ধানী দৃষ্টিক্ষেপ করে থাকেন। পক্ষান্তরে সাহিত্যপদবাচ্য চিঠি সাহিত্যের অন্যান্য রূপের মতোই আত্মনিয়ন্ত্রণশীল। কবি Cowper তাঁর একখানি চিঠিতে বলেছিলেন : "In fact, critics did not originally beget authors; but authors made critics. Common-sense dictated to writers the necessity of method, connexion, and thoughts congruous to the nature of their subject; genius prompted them with embellishments; and then came the critics."

[letter to the Rev. S. Newton.
Apr. 26, 1784]

মন্তব্যটি মোটেই অভিনব নয়। তবু, সাহিত্যপদবাচ্য চিঠিকে যাঁরা বৈয়াকরণ-আলঙ্কারিকের নির্দেশ-মানা কেতা-দুরস্ত মূর্তিতে চরমান

দেখতে চান, তাঁদের পক্ষে এ মন্তব্য আশু-আরোগ্য সাধক প্রতিপন্ন হবে। রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে লিখেছিলেন :

জেগে উঠে মহানন্দ,
খুলে যায় ছন্দোবন্ধ
ছুটে যায় পেন্সিল উদ্দাম—
পরিপূর্ণ ভাবভরে
লেফাফা ফাটিয়া পড়ে,
বেড়ে যায় ইষ্টাম্পের দাম!

ভারতীয় সংগীত

পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি যেদিন থেকে হয়েছে সেদিন থেকে সংগীতের অস্তিত্বকে মেনে নিতে আমাদের আপত্তি নেই। মানুষ সংসারে ভাল-মন্দ ও সুখ-দুঃখকে নিয়েই চিরচলমান সৃষ্টির বুকে তার বাসা বেঁধেছে, প্রাণের আবেগ ও মনের ভাবকে প্রকাশ করার জন্যে ভাষা ও সুরের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছে সমাজে সংগীত যা তখন অপরিণত হোলেও শিল্প-সৌন্দর্যের মর্যাদা পেতে সে বঞ্চিত হবে না। গোড়াকার দিকে মানুষ ছিল জড়বাদী, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিপূরণের জন্যেই স্তোত্র গান করেছে বরুণ, মিত্র, পৃথিবী, অগ্নি, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতাদের কাছে। ক্রমে সমাজ-বিবর্তনের সাথে সাথে হোতে থাকল যত বুদ্ধির বিকাশ ততই পার্থিব সম্পদের উর্ধে সংগীত নিল অপার্থিব আনন্দের

প্রেরণা, মানুষের হোল সে দৈনন্দিন জীবনের শান্তি ও সান্ত্বনার নিত্য সহচর। ক্রমে বেদ, ব্রাহ্মণ, সংহিতা, উপনিষৎ, শিক্ষা, প্রাতিশাখ্য ইত্যাদি কোরে বর্তমান কাল পর্যন্ত সংগীত করল তার রাজ্য বিস্তার, সমাজের মানুষই দিল তাকে ভাব, ভাষা ও সুর; ভারতীয় সংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান রূপে গণ্য হোল সে বিশ্বের ইতিহাসে।

সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালকে ভাগ করা যায় প্রধান তিনটি স্তরে, যেমন আদিম যুগ, প্রাগৈতিহাসিক যুগ ও ঐতিহাসিক যুগ। ঐতিহাসিক যুগও বিভক্ত আবার তিনটি প্রধান স্তরে: বৈদিক, মধ্য ও বর্তমান। বর্তমান যুগের বিস্তৃতিকে মুঘল-পূর্ব যুগ থেকে আরম্ভ কোরে ইংরেজ রাজত্বের অবসান-কাল ও তারপর থেকে অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত ধরা যায়। এই সকল যুগেই সংগীতের বিকাশ ও অনুশীলন ছিল অব্যাহত।

আদিম যুগে সংগীতের রূপ কি রকম ছিল তার সঠিক প্রমাণপঞ্জী বিশেষভাবে না পাওয়া গেলেও মোটামুটি ভাবে জানা যায় যে, তখনকার কালে মনের সহজ সাবলীল ভাব ও প্রেরণাই ছিল সংগীতের একমাত্র প্রাণ। ভাষার অস্তিত্ব চিরকালই ছিল, ভাষাবিহীন গান এমন কি পশুপক্ষীদের ভিতরও ছিল না, এখনো নাই। ভারতীয় সংগীতের সত্যিকারের ইতিহাস এখনো পর্যন্ত একখানিও রচিত হয় নি বোলে সংগীতের অনেক তত্ত্বই রয়েছে আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তবে পাশ্চাত্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলির সংগীতের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সভ্য ও অসভ্য, আর্য ও অনার্য এই উভয় জাতির মধ্যেই সংগীত ছিল অত্যন্ত সাদাসিদা ধরণের, অথচ শ্রুতি, স্বর, অলংকার, মূর্ছনা ও রাগের লীলায়িত গতি যে তখন ছিল প্রচ্ছন্নভাবে লুকানো একথাও একেবারে অস্বীকার করা যায় না। প্রাগ্বৈদিক যুগের প্রমাণ পেয়েছি আমরা

মোহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পার খননের পর। মোহেঞ্জোদড়োর ধ্বংস-স্তূপে পাওয়া গেছে সাতটি ছিদ্রযুক্ত বাঁশী ও নৃত্যশীলা নারীর মূর্তি, আর তা থেকে একথাই নিঃসংশয়ে প্রমাণ হয় যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে সংগীতে ছিল সাত স্বরের পূর্ণবিকাশ ও নৃত্যশিল্প ছিল অব্যাহত তখনকার সমাজে। আসলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমুন্নত রূপের সন্ধান পাই আমরা প্রাগৈতিহাসিক তথা প্রাগ্বৈদিক যুগেই; শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম সকল জিনিসেরই ছিল প্রাচুর্য, সুতরাং সংগীতের সুসংস্কৃত অনুশীলনও ছিল তখন অক্ষুণ্ণ একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

বৈদিক যুগ আরম্ভ হয়েছে ঋগ্বেদ-সংকলনের সময় থেকে। ঋগ্বেদের সংকলন একদিনে বা এক বৎসরে হয় নি; দশম মণ্ডলের কথা বাদ দিলেও অপরাপর মণ্ডলের সূক্তগুলির পরিপূর্ণ রূপ নিতে লেগেছিল কয়েক শত বৎসর। অনেকের মতে ঋগ্বেদ-সংকলনের সময় থেকেই আরম্ভ হয় ঐতিহাসিক যুগও। আবার অনেক পণ্ডিতের মতে ঐতিহাসিক যুগ ঠিক ঠিক ভাবে আরম্ভ হয় বুদ্ধদেবের জন্মের পর থেকে। যুগ বা কালের নির্ধারণ ব্যাপারে বিচিত্র মতের অবকাশ থাকলেও একথা অতীব সত্যি যে, বৈদিক যুগেও সংগীতের অনুশীলন ছিল অব্যাহত সকল জাতির সমাজে। তবে একটি বিষয় আজো পর্যন্ত অমীমাংসিত রয়েছে যে প্রাগৈতিহাসিক যুগে সংগীত যদি চরম উৎকর্ষ লাভ করে তবে বৈদিক যুগে আবার তার নূতন সৃষ্টির প্রশ্ন ওঠে কেমন কোরে? নিশ্চয়ই দুটি যুগের সন্ধিক্ষণে তাহোলে সংগীতের রূপ হয়েছিল মন্থর বা গতিহীন। মন্থর বা গতিহীন বলার উদ্দেশ্য এই যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের বাঁশীতে সাতটি ছিদ্র থাকার অর্থই সাত স্বরের বিকাশ তখন হয়েছিল সম্পূর্ণ অথচ বৈদিক যুগের

গোড়াকার দিকে ক্রমবিকাশের পথে সংগীতকে দেখি লীলায়িত আর্চিক রূপে যাতে একটি মাত্র স্বরের ছিল ব্যবহার আর সে স্বর মধ্যম, পঞ্চম অথবা নিষাদ যাই হোক না কেন। তারপর পাই গাথিক, সামিক, স্বরান্তর শ্রেণীর গানের কথা। গাথিক গানে ছিল দুটিমাত্র স্বরের প্রচলন, সামিকে তিনটি ও স্বরান্তরে ছিল চার স্বরের বিকাশ। তাদের পরেকার গান বিকশিত হয় ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ অর্থাৎ পাঁচ, ছয় ও সাত স্বরের সমষ্টিতে; সুতরাং আর্চিক থেকে সম্পূর্ণ পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে একটি ক্রমবিকাশের স্তর, সময়ও লেগেছিল সেই বিকাশের পিছনে সুদীর্ঘ। তাই প্রশ্ন ওঠে যে, সেই ক্রমবিকাশের ধারা কি সচঞ্চল ছিল একবার তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিকের বুকে এবং পরে তা নিঃশেষিত হোয়ে পুনরুজ্জীবিত হয় বৈদিক যুগের প্রারম্ভে অথবা একথাই অনুমান করা সমীচীন হবে যে, উভয় যুগের সন্ধিক্ষণে ক্রমবিকাশের ধারা হয়েছিল ক্ষীণ ও মন্থর এবং তারই কঙ্কালাস্থির ওপর গড়ে উঠেছিল পূর্বেকার রূপ?

সার জন মার্শাল, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, আর্নেষ্ট ম্যাকে, রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহানি, রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ প্রভৃতির মতে প্রাগৈতিহাসিক তথা সিন্ধুসভ্যতার যুগ বৈদিক যুগের পূর্বে। কিন্তু ডাঃ লক্ষ্মণ স্বরূপের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন: তিনি তাঁর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ *The Rigveda and Mohenjo-daro* প্রবন্ধে (Vide *Indian Culture*, Vol. IV, No. 2, Octr. 1937, pp. 149-169) বৈদিক সাহিত্য থেকে ও অন্যান্য নজির দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তথাকথিত প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুসভ্যতার বয়স বৈদিক যুগের পরবর্তী—"This also shows that the RV. should be assigned to a period earlier than Mohenjo-daro". ডাঃ স্বরূপের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বামী শংকরা-

নন্দও তাঁর *Rigvedic Culture of the Pre-historic Indus* (Vol. 1), বইয়ে উল্লেখ করেছেন : (১) "Thus we see * * it may be easily inferred that the Indus culture was originated by the Vedic Aryas" (p. 47). (২) "* * the Indus civilization was post-Vedic in origin. The civilization being Vedic in origin, the presence of the Vedic people in the Indus Valley is definitely established". (p. 149). মোটকথা ডাঃ লক্ষ্মণস্বরূপ ও স্বামী শংকরানন্দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একথাই প্রমাণিত হয় যে, সিন্ধুসভ্যতায় যে উন্নত ধরণের সংগীতের অস্তিত্ব পাওয়া যায় তা বৈদিক যুগেরই অবদান, তা নূতন কিছু একটা নয় ; আর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে একথাও আবার প্রমাণিত হয় যে, তথাকথিত সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের সংগীতের শীর্ণ কঙ্কালের ওপর বৈদিক যুগের সংগীত গড়ে ওঠেনি, পরন্তু বৈদিক যুগে যে ভারতবর্ষীয় সংগীত ক্রম-বিকাশের পথে পূর্ণ-পরিণতি লাভ করেছিল তারই অভিব্যক্তিময় ধারার গতি অব্যাহত ছিল সিন্ধুসভ্যতার ভিতরে। সুতরাং সিন্ধুসভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতার আগে স্থান দেবারও কোন সার্থকতা থাকে না, বরং একথাই মেনে নেওয়া সমীচীন হবে যে, ঋগ্বৈদিক যুগ থেকে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতবর্ষীয় সমাজকে গৌরবান্বিত করেছিল তারই মহিমালোক সিন্ধু সভ্যতার ইতিহাসোজ্জ্বল যুগ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষৎ, শিক্ষা, প্রাতিশাখ্যগুলিকে ভালভাবে অনুশীলন করলে এই সিদ্ধান্তকেই যুক্তিযুক্ত বোলে মেনে নিতে হয়।[১]

ভারতীয় সংগীতের স্বর, রাগ ও মাধুর্য গড়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের

১। এ সম্বন্ধে লেখক তাঁর 'রাগ ও রূপ' এবং *A Study in Indian Music* বই দুটিতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।

মাটিতেই, ভারতীয় সমাজ ও জলবায়ুই তাদের দিয়েছিল প্রাণ, বিবৃতি ও প্রেরণা। অনেকের অভিমত যে, ভারতের যা-কিছু সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল উপাদান সবই আমদানী হয়েছিল ভারতের বাইরে থেকে। মেসোপটেমিয়া, ইজিপ্ট, বাবিলোন, রোম, গ্রীস, চাল্‌ডিয়া মধ্যএসিয়া এসবই যুগিয়েছে সামগ্রী ভারতের সভ্যতা-সৌন্দর্যকে গড়ে তোলার জন্যে। অবশ্য বেশীর ভাগ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের অভিমত তাই। প্রাচ্য পণ্ডিতদের মধ্যেও যাঁরা এই মত পোষণ করেন তাঁরাও সকল-কিছুকে দেখেন পাশ্চাত্য মতের পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাধীন মনোবৃত্তি তাঁদেরও নাই। স্বামী বিবেকানন্দ তাই দুঃখ কোরে বলেছিলেম: আহাম্মক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের দল ভারতের সব-কিছুকেই দেখতে ও দেখাতে চান ভারতের বাইরে থেকে আমদানী বোলে। তাছাড়া ভুলে যাই আমরা বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের গৌরবময় কেন্দ্র আলেকজান্দ্রিয়ার কথা ও তার সাথে সাথে ভারতীয় দার্শনিক ও ও বৌদ্ধ শ্রমণদের ধর্মপ্রচার ব্যপদেশে পৃথিবীর সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণের কাহিনী। স্থল ও জলপথে ভারতের সাথে অপরাপর দেশের যোগাযোগের কথা পাশ্চাত্য মনীষীরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে ভোলেন নি। স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন: 'সভ্যতার অরুণোদয় ভারতের দিকচক্রবালেই হয়েছিল সর্বপ্রথম আর অপরাপর দেশ সকল সম্পদের জন্যে ঋণী ভারতেরই কাছে'। তাই ভারতীয় সংগীতের সত্যিকারের ইতিহাস রচিত হোলে একথাই প্রমাণিত হবে যে, ভারতীয় সংগীতের সাত স্বর ও রাগরূপ আরব, রোম, পারস্য বা বাবিলোন—এদের কোম দেশ থেকেই আমদানি হয়নি, বৈদিক সামগানের উপাদানই বরং জুগিয়েছিল সকল দেশের সংগীতকে উপকরণ।

ভারতে স্বরের সৃষ্টি হয়েছিল ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুসরণ কোরে তা সে বৈদিক অথবা লৌকিক স্বর যাই হোক। বৈদিক ও লৌকিক স্বরের সংখ্যা সমানই ছিল, যদিও নামে ও রূপে তারা ছিল আলাদা। যেমন বৈদিক স্বর প্রথম ও লৌকিক স্বর ষড়্জ সমান প্রকৃতির নয়, তেমনি বৈদিক দ্বিতীয় ও লৌকিক ঋষভের মধ্যেও ছিল অমিল। বৈদিক সাতটি স্বরের নাম প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্ট। শিক্ষাকার নারদ ও বেদভাষ্যকার সায়ন এদের প্রথম থেকে সপ্তম স্বর বলেছেন। লৌকিক সাতটি স্বর যেমন—ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। এদুটি শ্রেণীর স্বরসপ্তক পাশাপাশি ভাবেই সমাজে বরাবর প্রচলিত ছিল, অর্থাৎ বৈদিক যুগেও লৌকিক স্বর সাতটির অপ্রচলন ছিল না। তবে উভয়েই তারা প্রচলিত ছিল স্বাধীন ভাবে, কারো সাথে কারো যোগাযোগ একেবারে ছিল না। যোগসূত্র রচিত হোলো—যতটুকু প্রমাণপঞ্জী-থেকে পেয়েছি—২য়-৩য় শতাব্দীতে যখন নারদ রচনা করলেন তাঁর শিক্ষা বৈদিক ও লৌকিক সংগীতের মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে। শিক্ষাকার নারদ পাতালেন মিতালী দুটি শ্রেণীর মধ্যে এই মন্ত্র উচ্চারণ কোরে: 'যঃ সামগানাং প্রথম স বেণোর্মধ্যম স্বরঃ। যো দ্বিতীয় সঃ গান্ধরঃ' ইত্যাদি। অবশ্য সায়নও দেখিয়েছিলেন এদুটির মৈত্রীভাব অনেক পরে যদিও নারদের মতের সাথে তাঁর ছিল অমিল। যেমন,

	সামস্বর	নারদ	সায়ন
৭	ক্রুষ্ট	পঞ্চম	নিষাদ
১	প্রথম	মধ্যম	ধৈবত
২	দ্বিতীয়	গান্ধার	পঞ্চম
৩	তৃতীয়	ঋষভ	মধ্যম
৪	চতুর্থ	ষড়্জ	গান্ধার
৫	মন্দ্র	ধৈবত	ঋষভ
৬	অতিস্বা	নিষাদ	ষড়্জ

সামস্বর ও লৌকিক স্বরগুলির মধ্যে যোগসূত্র রচিত হোলেও একটি দিয়ে অপরটির উদ্দেশ্য কোনদিনই সাধিত হোত না। বৈদিক গান সামসংগীতে যে সাতটি স্বরের ব্যবহার হোত তাদের নাম ছিল বৈদিক আর দেশীগানের স্বরগুলিকে বলা হোত লৌকিক।

বৈদিক ও লৌকিক এদুটি শ্রেণীর সাত স্বর বাইশটি সূক্ষ্মস্বরের সমবায়ে সৃষ্টি। এই সূক্ষ্মস্বরগুলিকে শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'শ্রুতি'। বাইশটি শ্রুতির নামকরণে কাব্যসৌন্দর্যেরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রুতিদের জাতিরও নামকরণ করা হয়েছে। ইংরেজীতে শ্রুতির নাম 'সেমিটোন'। রাগ-রাগিণীরা আসলে সাতস্বরের মধ্যে লীলায়িত থাক্‌লেও শ্রুতির সমবায়েই গঠিত।

রাগ ও রাগিণীই ভারতীয় সংগীতের সর্বাকারের রূপ, যদিও অলংকার, তান, গমক, মীড় প্রভৃতিরও উল্লেখ আমরা পাই। রাগ-রাগিণীদের ইংরেজীতে বলে 'মেলোডি টাইপ'। রাগ ও রাগিণী প্রকৃতপক্ষে 'রাগ' শব্দেরই বোধক। স্ত্রী ও পুরুষ প্রকৃতি দুটির মাধ্যমে আমরা একটিকে বলি রাগ ও অপরটিকে বলি রাগিণী। এই বিভাগের উল্লেখ

সর্বপ্রথম দেখি পার্শ্বদেবের সংগীতসময়সারে আলাপ ও আলপ্তির উল্লেখে। শার্ঙ্গদেবও তাঁর রত্নাকরে এ'দুটির উল্লেখ করেছেন, যদিও বিশদ পরিচয় তাদের দেন নি। টীকাকার কালিনাথই। (১৪৪৬—১৪৫৬ খৃঃ) এদের বিষয় আলোচনা করেছেন বিভাগের উপযোগীতা দেখিয়ে। তবে একথা অতি সত্যি যে, রাগ ও রাগিণী—পুরুষ ও স্ত্রী বিভাগের পিছনে পাই সামাজিক পরিবেশেরই প্রভাব পরিপূর্ণরূপে। মানুষ সমাজে বাস করে একা নয়, আত্মীয়স্বজন নিয়েই সে থাকে, আর এরজন্যে সংগীতেও দেখা দিয়েছে স্বরগোষ্ঠী ও গ্রামের প্রয়োজনীয়তা। স্বরের একত্র সন্নিবেশেই হয় গ্রামের সৃষ্টি। সংগীতে গ্রাম তিনটি : ষড়্জ ; গান্ধার ও মধ্যম। নারদীশিক্ষাকার নারদই দিয়েছেন গান্ধার গ্রামের পরিচয় ও বলেছেন যে, এই গ্রামের প্রচলন হয় শেষে স্বর্গলোকে। মোটকথা নারদের সময়েই গান্ধারগ্রামের ব্যবহার লোকসমাজ থেকে লোপ পেয়েছিল। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে ষড়্জ ও মধ্যমগ্রামেরই উল্লেখ করেছেন আর বর্তমানে সংগীতসমাজে আছে একমাত্র ষড়্জ গ্রামেরই প্রচলন। আমার মনে হয় সাতটি স্বরের নামানুসারে সাতটি গ্রামেরই ছিল প্রচলন এককালে। গান্ধারগ্রামটি গন্ধর্বদের বিশেষ প্রিয় ছিল। যাইহোক গ্রামের উপযোগিতার মতন সংগীত সমাজেও দেখা দিয়েছিল স্ত্রী-পুরুষ-বিভাগ রাগের বেলায়।

'রাগ'-রূপের অভিব্যক্তি ভারতীয় সংগীতে সৃষ্টি করেছে এক অপূর্ব শিল্প-সৌন্দর্য। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন সংগীত-সাধকেরা তাঁদের অনুভূতি দিয়ে ধ্যান রচনা করেছেন রাগের স্বররূপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। অবশ্য ধ্যানরূপ রচিত হয়েছিল স্বররূপেরও অনেক পরে যখন সংগীতের আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার

মহিমময় আসনে। মানুষ সাধারণতই ভাববিলাসী, ভাবচক্ষে রাগের চাক্ষুষ মূর্তি দেখার বাসনা তাকে দিয়েছিল প্রেরণা, কল্পনা দিয়েছিল রাগের অভিব্যক্তি, ধ্যানমূর্তি তাই সাধকের আন্তর ভাবেরই প্রতিচ্ছবি। স্বরমালা রাগের শরীরে করেছিল রক্ত-মাংসের সঞ্চার, সাধকের প্রেরণা এনেছিল জীবন। এই রাগের সাধনায় সাধক পায় সংসারে মুক্তি।

বৈদিকযুগে রাগ-রূপের অস্তিত্ব ছিল কিনা সে সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিতই করেন সন্দেহ প্রকাশ, কেননা নির্দিষ্ট ঠাট বা মেলের সন্ধান প্রাগ্বৈদিক বা বৈদিক সংগীতের কিছুই পাওয়া যায় না। বৈদিক সংগীত সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত হোল: সামগান গাওয়া হোত মাত্র আবৃত্তির সুরেই আর সেজন্যেই সামগানকে বলা হয় chanting; chanting-এ থাকৃত সুর ও কথার বারবার আবৃত্তিমাত্র, সুতরাং তা সংগীত-পর্যায়ভুক্ত নয়। কিন্তু এ সিদ্ধান্তের সার্থকতা কিছুই আমরা দেখি না, কেননা সামিক যুগ থেকে সম্পূর্ণ যুগ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে গাওয়া হোত যে ভিন্ন ভিন্ন রকমের সামগান, তাদের মধ্যে থাকৃত সাতস্বরের লীলায়িত ছন্দ, নৃত্য গীত ও বাদ্য। বাদ্য যেমন বেনু, নানান তন্ত্রীযুক্ত বীণা, মৃদঙ্গ, প্রভৃতি, আর নৃত্য করতেন সামগ শিল্পীদের পুরনারীরা বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হোয়ে করতালির সাথে সাথে মণ্ডল রচনা কোরে যজ্ঞবেদীর চারদিকে। ভিন্ন ভিন্ন যজ্ঞে নৃত্যের ছন্দ ও ভঙ্গিমাও ছিল বিভিন্ন রকমের। নৃত্য, গীত ও বাদ্যের একত্র সম্মিলন থাকলে তাকে আমরা বলি সংগীত, আর শাস্ত্রকারেরাও (যদিও পরবর্তীকারের) ঠিক এই অভিধানই দিয়েছেন। নারদ ও ভরতপূর্ব গান্ধর্বশাস্ত্রে অবশ্য 'সংগীত' শব্দটির কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু তা হোলেও ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে 'এবং গানং চ নাট্যং চ বাদ্যং চ' বিবিধাশ্রয়ম্' (২৮।৭), 'গীতবাদিত্রভূয়িষ্ঠং' (২৭।৯১)

'গানং বাদ্যং সনৈপথ্যম্' (২৭।৮০) প্রভৃতি শ্লোকে নৃত্য, গীত, বাদ্যেরই স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। এছাড়া গান্ধর্বগানের পরিচয় দিতে গিয়ে ভরত যখন বলেছেন: 'গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্' (২৮।১২) বা 'গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতাল পদাশ্রয়ম্' (২৮।৮) তখনি তিনি 'সংগীত' এই শব্দ বা অভিধানের সার্থকতাকেই বুঝিয়েছেন যার স্পষ্ট উল্লেখ দেখি মকরন্দকার নারদ ও শার্ঙ্গদেবের রত্নাকর প্রভৃতি বইয়ে। নৃত্য, গীত ও বাদ্যের একত্র সমাবেশে যদি সংগীতের রূপ পরিস্ফুট হয় তবে সামগান chanting বা আবৃত্তিমূলক গান হোলেও তার সাথে থাকত বিভিন্ন তার ও তাঁতের বাদ্য ও সামগ-পুরনারীদের নৃত্য, সুতরাং সামগানও সে সংগীতের মর্যাদা ও কৌলিন্য পাবার ষোল আনা দাবী রাখে তাতে আর সন্দেহ কি?

'রাগ' শব্দ নিয়েও পণ্ডিতদের ভেতর মতদ্বৈত বড় কম নেই। বেশীর ভাগ গুণীর অভিমত যে, প্রাগ্বৈদিক ও বৈদিকের কথাতো বটেই, শিক্ষা, প্রাতিশাখ্য ও নাট্যশাস্ত্রের যুগেও এমন কি 'রাগ'-এর অস্তিত্ব মোটেই ছিল না। অবশ্য নারদীশিক্ষায় ও নাট্যশাস্ত্রে 'রাগ' শব্দের ব্যবহার আমরা পাই যদিও অনেক মনীষীই রাগের যথার্থ রূপ বোলে তাকে স্বীকার করতে রাজী নন। ভরত নাট্যশাস্ত্রে দু'বার মাত্র 'রাগ' শব্দ ব্যবহার কোরে তাদের বিশ্লেষণ কিছুই করেন নি, কিন্তু জাতিগান তথা জাতিরাগের পরিচয় তিনি সুস্পষ্টভাবেই দিয়েছেন। এই জাতিগানকেও অনেকে আজকাল রাগ পর্যায়ভুক্ত করতে সম্মত নন। তাঁদের যুক্তি হোল এর সপক্ষে যে, জাতিগান একমাত্র 'জাতি' হিসাবেই গণ্য, জাতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে গ্রামরাগ ও গ্রামরাগ থেকে ভাষা, বিভাষা, অন্তরভাষা, ক্রিয়াদি প্রভৃতি রাগ। ভরত বলেছেন: জাতি মাত্র আঠারটি। শুদ্ধ ও মিশ্রিত ভেদে তারা আবার দুভাগে

বিভক্ত। এই জাতি তথা জাতিগানের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন : জাতিদের লক্ষণ দশটি—গ্রহ, অংশ, তার, মন্দ্র, ন্যাস, অপন্যাস, অল্পত্ব, বহুত্ব, ঔড়ব ও ষাড়ব (—নাট্যশাস্ত্র ২৮।৭০)। এছাড়া চারবর্ণ, অলংকার প্রভৃতিরও উল্লেখ করেছেন জাতিদের (—নাট্যশাস্ত্র ২৯।১৯-২১)। জাতিরা যে ভাব ও রসের উদ্বোধক তা 'জ্ঞেয়া সর্বরসা-সংশ্রয়া জাতি : (—নাট্যশাস্ত্র ২৯।১১) বা 'জাতয়ো রস-সংশ্রয়াঃ' (২৯।১৬) শ্লোকগুলিতে তা স্বীকার করেছেন। অথচ কি প্রাচীন কি বর্তমান সকল রাগেরই এগুলি লক্ষণ। ভরত ইঙ্গিতে 'যস্মিন বসতি রাগস্তু' (—নাট্যশাস্ত্র ২৮।৭২) শ্লোকেও সে কথা স্বীকার করেছেন এবং ২৮।৩৫ শ্লোকে একবার মাত্র 'জাতিরাগম্' শব্দও ব্যবহার করেছেন; সুতরাং জাতি বা জাতিগান যে রাগশ্রেণীভুক্ত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া একথাও অতীব সত্যি যে, জাতি তথা জাতিগান [—'জাতিগানে প্রযত্নতঃ' (২৯।৪), 'জাতিগানে প্রযোক্তৃভিঃ' (২৯।৭)] যদি জাতিরাগ না হয় তবে তা থেকে গ্রামরাগ ও দেশীরাগের সৃষ্টি কেমন কোরে হোতে পারে। অসৎ থেকে যেমন সতের উৎপত্তি হয় না, পাখী থেকে যেমন মানুষের সৃষ্টি হয় না, তেমনি জাতিগান যদি 'রাগ'-শ্রেণীভুক্ত না হয় তবে তা থেকে কোন রকম রাগেরই উৎপত্তি হোতে পারে না। সুতরাং একথা ঠিক যে, জাতি বা জাতিগান 'রাগ'-শ্রেণীভুক্ত জাতিরাগই। বৃহদ্দেশীকার মতঙ্গও তাঁর বইয়ের গোড়াকার দিকে 'জাতিরাগহা ন ভবেৎ' প্রভৃতি স্বীকৃতির উল্লেখ করেছেন। যাই হোক, এই জাতিরাগ থেকে গ্রামরাগ ও গ্রামরাগ থেকে বর্তমানের সকল রাগেরই সৃষ্টি হয়েছে।

ভিন্ন ভিন্ন দেশ থেকেও রাগের সৃষ্টি হয়েছে। তারা সকলেই দেশীরাগের অন্তর্গত। দেশ থেকে উৎপন্ন হওয়ার জন্যে রাগ-গুলির নামও দেশানুযায়ী হয়েছে। যেমন গান্ধার বা কান্দাহার থেকে

সৃষ্ট রাগের নাম হয়েছে গান্ধারী, কর্ণাট থেকে কর্ণাটী, কলিঙ্গ দেশ থেকে কলিঙ্গড়া, গুজরাট থেকে গুর্জরী, মালব দেশ থেকে মালবী, কারো কারো মতে মারবা, সিন্ধু দেশ থেকে সৈন্ধবী, মুলতান থেকে মুলতানী, কাম্বোদিয়া থেকে কামোদী, সৌরাষ্ট্র থেকে সৌরাষ্ট্রী বা সুরট, ভূপাল থেকে ভূপালী, বাংলাদেশ থেকে বাঙ্গালী, প্রভৃতি। ভিন্ন ভিন্ন রাগের সংমিশ্রণেও অনেক রাগের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া এক এক দেশের রাগে ও গানে এক এক রকমের বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়—যে বৈশিষ্ট্য পার্থক্য এনে দেয় এক দেশের রাগের ও গানের সাথে অন্য দেশের রাগের ও গানের। যেমন বাংলাদেশেই ধ্রুপদ ও কীর্তন গান সৃষ্টি করেছে এক যুগান্তর। এছাড়া ভাটিয়ালী, বাউল, রামপ্রসাদী এসব তো আছেই। পদ্মা, ধলেশ্বরী, ভৈরব, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা প্রভৃতি নদনদীর মাঝি ও যাত্রীদের অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও ভাব-ধারা সৃষ্টি করেছে ঐ সব সরল স্বচ্ছন্দ পল্লীগীতি। এছাড়া বৌদ্ধযুগে চর্যাপদও এক সময়ে ভারতীয় সমাজের সাধনক্ষেত্রে উচ্চাসন অধিকার কোরে ছিল। বিশেষ কোরে কীর্তন-পদাবলী বাংলার নিজস্বতার একটি উৎস বিশেষ। বৈষ্ণব-সাধকদের রচিত পূর্বরাগ, রূপাভিসার বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, মান প্রভৃতি কীর্তনের পালাগান বাংলার হৃদয়ের প্রেম ও নিরাবরণ সহজ ভাবকে প্রকাশ করে। রাঢ় দেশের একটি বিশিষ্ট অবদানই এই কীর্তন। বাংলার প্রাণের গোপন কথাই এই কীর্তন গানে প্রকাশ পায়, মানুষের প্রাণে আনে প্রত্যক্ষ অনুভূতির সাড়া, ভাবের প্রকাশ এতে ঢল ঢল। এছাড়া রবীন্দ্র-সংগীতের অবদানও বাংলাদেশের বুকে অপরিসীম। বাংলাদেশের কথা বাদ দিলে অপরাপর দেশীয় ভজন-সংগীতের বৈশিষ্ট্যও ভারতে অতুলনীয়।

বাংলার রাগ-রূপেরও একটি স্বাতন্ত্র্য আমাদের চোখে পড়ে। যেমন বাংলার ভৈরব রাগ, পুরবী, বসন্ত, সাহানা, বেহাগ, পঞ্চম প্রভৃতি। এ থেকে মনে হয় যে, রাগ সম্বন্ধে বাংলাদেশের নিজস্ব একটি মতবাদ ছিল যা শিব, ব্রহ্মা, হনুমন, বা কালিনাথের (কল্লিনাথ) মতের চেয়ে কিছুটা নিশ্চয়ই আলাদা, কিন্তু অনুশীলনের অভাবে সে মতের আংশিক মাত্রই এখনো বাংলার সমাজে প্রচলিত আছে ও বাকী সমস্ত নষ্ট হোয়ে গেছে। বাংলার গুণীদের তাই উচিত তাঁদের নিজেদের গৌরবকে বাঁচান ও বিশ্বের দরবারে তার বৈশিষ্ট্যকে প্রমাণ করা। অপরাপর দেশে সংগীতগুণীরা অবশ্য তাঁদের নিজস্ব সম্পদ সম্বন্ধে সচেতনই আছেন।

মানুষ ও পশু-পক্ষীদের মনোরঞ্জন করে বোলেই রাগের সার্থকতা। মূল রাগ কারো মতে ছত্রিশটি, কারো মতে ত্রিশটি। কালিনাথ বলেছেন গ্রামরাগ, উপরাগ, রাগ, ভাষারাগ প্রভৃতি কোরে মোট ২৬৪-টি রাগ আছে। স্ত্রী ও পুরুষ-বিভাগের প্রভাবে রাগের মধ্যে যখন দেখা দিল রাগ ও রাগিণী তখন রাগ-সংখ্যা কারো মতে ছ'টি ও রাগিণী-সংখ্যা ত্রিশটি অথবা ছত্রিশটি। এছাড়া উপরাগও অনেক আছে। উপরাগগুলি পরে পরিচারিকা, পুত্র, পুত্রবধু, ভৃত্য ইত্যাদি নাম নিয়ে সংগীত-জগতে রাগগোষ্ঠি সৃষ্টি করেছে। রাগলোকে স্ত্রী-পুরুষ প্রভাবের নজির দেখাতে গিয়ে শাস্ত্রকারেরা পৌরাণিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যারও আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন শিব ও শক্তির মিলনে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হয়েছে তেমনি শিব থেকে বিকাশ লাভ করেছে ছ'টি রাগ ও শক্তি থেকে রাগিণীরা। কোন মতে শিবের বামদেবাদি পঞ্চমুখ থেকে ভৈরবাদি পাঁচটি রাগ ও শক্তি বা পার্বতীর মুখ-কমল থেকে একটি যথা নটনারায়ণ রাগের উৎপত্তি হয়েছে। সংগীত-জগতেও বেদ ও তন্ত্র

এই উভয়ের প্রভাব পড়েছে পরিপূর্ণভাবে এবং পড়াও অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে আলোচনা করার বিষয়বস্তু যথেষ্ট আছে। কিন্তু বেশীর ভাগই তারা পৌরাণিক ছদ্মবেশে একাধিপত্য বিস্তার কোরে রয়েছে, বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক অনুশীলন তাদের আদৌ হয় না বল্লেই চলে। বর্তমানে প্রচলিত উচ্চাংগ তথা ক্ল্যাসিকাল সংগীতকে অনেকে ভুল কোরে বলেন মার্গসংগীত। আসলে বৈদিকোত্তর মার্গ ও বর্তমানের ক্ল্যাসিকাল সংগীত সমশ্রেণীভুক্ত নয়, যদিও আভি-জাত্য ও কৌলিন্য পাবার দাবী উভয়েই রাখে। মার্গসংগীত সৃষ্টি হয়েছে বৈদিক সামগানের উপাদানকে ভিত্তি কোরে, এজন্যে এর সৃষ্টি-সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা পৌরাণিক আখ্যানের অবতারণা কোরে বলেছেন ব্রহ্মা চারবেদ থেকে অন্বেষণ কোরে ('মার্গ অন্বেষণে') যে সব উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তাই দিয়ে তিনি মার্গসংগীতের প্রচলন করলেন মনুষ্যসমাজে। মার্গ বা বৈদিকোত্তর অভিজাত সংগীতের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠ ছিল সামগানের ওপর। মার্গ ও গান্ধর্ব-সংগীত অভিন্ন। ভরত গান্ধর্ব-সংগীতের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, যেহেতু এই গানকে দেবতারা ও গন্ধর্বেরা ভালবাস্‌ত তাই গান্ধর্ব নামে পরিচিত— 'অত্যর্থমিষ্টং দেবানাং তথা প্রীতিকরং পুনঃ, গন্ধর্বাণামিদং যস্মাৎ তস্মাদ্ গান্ধর্বমুচ্যতে' (—নাট্যশাস্ত্র ২৮।৯)। মার্গসংগীত দেশী জাতিরাগ গ্রামরাগ, প্রভৃতিদের নিয়ে সার্থক। কিন্তু বর্তমান অভিজাত শ্রেণীর ক্ল্যাসিকাল গানের প্রচলন হয়েছিল মনে হয় মোগল রাজত্বের আমলে যখন ভারতীয় রাগে ঘটেছিল মিশ্রন পারসিক শোভা ও গুস্মা প্রভৃতির। পারস্য দেশের সংগীতে ঠাট বা মেলের নাম মোকাম। শোভা ও গুস্মা রাগ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য উত্তর ভারতেই

পারস্যের এই প্রভাব পড়েছিল মুসলমানদের বারবার অভিযানের জন্যে, দক্ষিণ ভারত পেয়েছিল পরিত্রাণ, আর সেজন্যেই উত্তর ভারতের রাগে মিশ্রনের ভাগ বেশী, দক্ষিণ ভারত রেখেছে তার রাগে শুদ্ধতাকে বজায়। মার্গ ও ক্ল্যাসিকাল উভয় সংগীতই ছিল (এখনো ক্ল্যাসিকাল আছে) মার্জিতরুচি শ্রোতাদের জন্যে, সাধারণের এতে প্রবেশাধিকার বিশেষ ছিল না। তারপর মার্গসংগীতের পাশাপাশি যেমন দেশী সংগীতের ছিল প্রচলন, ক্ল্যাসিকালের পাশেও তেমনি আছে দেশী ও আধুনিক সংগীতের অনুশীলন। এই দুটি শ্রেণীর প্রচলন থাকার জন্যে আমরা দুটিকে ভাবি সম্পূর্ণ আলাদা, একটির সাথে নেই অপরটির মিতালি ও যোগাযোগ। কিন্তু এধরণের ভাবা বা সিদ্ধান্ত একেবারেই অমূলক নয়, কারণ অভিজাত ও সাধারণ সংগীতের শ্রেণী সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু জাতি হিসাবে তারা অভিন্ন। মার্গ ও দেশী এ দুটি শ্রেণী দেশীসংগীতের কোঠায় পড়ে, এর নজিরও দেখিয়েছেন দত্তিল, ভরত, মতঙ্গ ও শার্ঙ্গদেব প্রভৃতি। ভরত, মতঙ্গ, শার্ঙ্গদেব এঁরা দেশী-সংগীতেরই প্রচার করেছেন, বৈদিক সামগানের প্রচলন তাঁদের সময়ে একরকম লোপ পেয়েছিল বোল্লেই চলে, কেবল সীমাবদ্ধ ছিল ও এখনো আছে মুষ্টিমেয় সাগ্নিক সামগ ব্রাহ্মণদের মধ্যেই। তখনকার সংগীতগুণীরাও বৈদিক সংগীত নিয়ে মোটেই আলোচনা করেন নি, দেশী-সংগীতেরই ছিলেন তাঁরা প্রচারক, দেশী-সংগীতের আলোচনায়ই তাঁরা জাতিরাগ গ্রামরাগদের দিয়েছেন পরিচয়। তা-ছাড়া দেশী-সংগীতের পরিধি অত্যন্ত বিশাল; অতীতে এথেকে নানান শ্রেণীর গানের উদ্ভব হয়েছে, ভবিষ্যতেও বিচিত্র গানের সৃষ্টি থাকবে অব্যাহত।

এ ধরণের নানান বিষয়ের আলোচনা করা যায় সংগীত সম্বন্ধে, সকলগুলির বিষয়ে কিছু কিছু বলতে গেলে নিতে হয়

বড় একটি গ্রন্থ-প্রণয়নের দায়িত্ব যা বর্তমান ক্ষেত্রে সত্যিই অসম্ভব। তাই কয়েকটি বিষয়ের মাত্র আলোচনা কোরেই ভারত-সংস্কৃতির অন্যতম অমূল্য উপাদান এই সংগীতের সৌন্দর্য ও মহিমাকেই আমরা প্রকাশ করলাম। ভারতীয় সংগীতের ভাণ্ডার রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ, জ্ঞানলিপ্সু মাত্রেরই কর্তব্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ও বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে সকল বিষয়ের আলোচনা করা। সংগীতের গ্রন্থগুলির বেশীর ভাগই রয়েছে এখনো অপ্রকাশিত, ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থাগারে পুঁথির আকারে রয়েছে রক্ষিত। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেও সংগীতের অনেক তত্ত্ব রয়েছে নিহিত। অনুশীলনী মনোবৃত্তি নিয়ে সংগীত-গুণীমাত্রেরই ভারতীয় সংগীতের সকল মর্মকথা উদ্ঘাটন করা উচিত। ধারাবাহিক ইতিহাস-রচনার দায়িত্বকেও তাঁদের গ্রহণ করতে হবে, কেননা একমাত্র ইতিহাসই বলে' দেবে সংগীতের সাংস্কৃতিক অবদানের কথা—যাতে শুধু ভারতবর্ষই নয়, সমগ্র বিশ্বই মনে করবে নিজেকে গৌরবান্বিত শিল্প-সম্পদের প্রতি শ্রদ্ধাবনতি জানিয়ে।